জীবন-বিজ্ঞান



কুণ্ডু • দাশ • কুণ্ডু

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জীবন-বিজ্ঞান(Life Science)-এর
নূতন পাঠ্যনির্ঘণ্ট অনুসারে দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

জীবন-বিজ্ঞান

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু, এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি.
গবেষিকা, ইম্পিরিয়াল ক্যান্সার রিসার্চ ফাণ্ড ;
প্রাক্তন গবেষণা-সহায়িকা, ইন্‌স্টিটিউট অফ অপ্‌থ্যাল্‌মোলজি (লণ্ডন) ;
প্রাক্তন গবেষিকা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুল এবং
মুরলীধর গার্লস হাই স্কুল।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ, এম. এস-সি.
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক, অক্ষয় শিক্ষায়তন (হাওড়া)।

শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু, এম. এস-সি. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত), ডি. ফিল.
গবেষক, বেডফোর্ড কলেজ (লণ্ডন) ;
প্রাক্তন গবেষক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।

ভা র তী বু ক স্ট ল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
6, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-9

প্রথম সংস্করণ : 11 জানুয়ারি, 1975
তৃতীয় সংস্করণ : 1 জানুয়ারি, 1976

চিত্রসজ্জা :

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিমলকান্ত চক্রবর্তী
শ্রীচিত্রকুমার রায়

[ভারত সরকারের স্বল্পমূল্য কাগজে মুদ্রিত।]

মূল্য 4 টাকা মাত্র

6. রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-9 হইতে শ্রীতপনকুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং
16, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-6, শান্তিনাথ প্রেস হইতে শ্রীজগন্নাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই পুস্তকে পাঠ্যনির্ঘণ্টের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের আন্তরিক এবং যথোচিত রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের স্বীকৃত আধুনিক তথ্যগুলি যথাসম্ভব সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বানানের জন্য 'চলন্তিকা', এবং পরিভাষার জন্য মূলতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' অনুসরণ করেছি ; কয়েকটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে যথাযথ পরিভাষা প্রস্তুত করে নিতে হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকে অনেকভাবে সাহায্য করেছেন এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কিছু কিছু ত্রুটি এবং অসঙ্গতি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী তথা সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সৎ-পরামর্শের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

কলিকাতা,
11 জানুয়ারি, 1975

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু,
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ,
শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু।

সূচীপত্র

SYLLABUS IN LIFE SCIENCE

CLASS—X

1) Introduction to Nervous system and sense Organs (Detailed description not required). [15 pages]
2) General idea about Hormones. [10 pages]
3) Cell division and its significance—mitosis and meiosis (outline stages only), detail not required. [10 pages]
4) Growth and reproduction. [15 pages]
5) Heredity (outline idea only illustrating simple inheritance). [10 pages]
6) Evolution (outline idea). [10 pages]
7) Adaptations as exemplified by specimens mentioned in the course content. [20 pages]
8) Carbon Cycle, Nitrogen cycle and Oxygen cycle. [10 pages]
9) General idea about Eco-system and conservation. [15 pages]
10) Students should acquire individual experience by experimentation on the following items :—

    Experiments to show growth, Phototropic movement and Geotropic movement.

    Toad—excretory system and male reproductive system. Heart and arterial arches. [10 pages]

N. B. :—A class Note-book should be maintained which should be illustrated with accurate Diagrams. The main idea of holding demonstration and experimental classes is to initiate a training in observation and inference.

[10% deviation allowed]

1

নার্ভ-তন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয়
(Nervous System and Sense Organs)

উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া অর্থাৎ উত্তেজিতা (Irritability) প্রোটোপ্লাজ্‌মের সহজাত ধর্ম। তাই সকল জীব উত্তেজনায় সাড়া দেয়। জীবদেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এমন অবস্থাগত (ভৌত অথবা রাসায়নিক) পরিবর্তনকে **উদ্দীপক (Stimulus)** বলা হয়। উদ্দীপক বহিরাগত হইতে পারে (যেমন—উষ্ণতা, আলোক, চাপ ইত্যাদি পরিবেশের অবস্থাগত পরিবর্তন), আবার আভ্যন্তরীণও হইতে পারে (যেমন—দেহস্থ খাদ্য, জল, বর্জ পদার্থ ইত্যাদির আপেক্ষিক পরিমাণ, এবং ক্লান্তি, ব্যথা ইত্যাদি)। উদ্দীপকের প্রভাব অর্থাৎ উত্তেজনা অনুভব করা, দেহের বিভিন্ন অংশে সেই উত্তেজনা প্রেরণ করা এবং উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার জন্য অধিকাংশ প্রাণীর দেহে **স্নায়ুতন্ত্র** বা **নার্ভ-তন্ত্র (Nervous system)** থাকে। নার্ভ-তন্ত্রের সঙ্গে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক খুব গভীর। এইগুলির মাধ্যমেই বহিরাগত উদ্দীপকের প্রভাব অনুভূত হয়। নার্ভ-তন্ত্রের সাহায্যে (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে) প্রাণী যে কেবল পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে তাই নয়, এই তন্ত্র [অনেকক্ষেত্রে অনাল গ্রন্থি-নিঃসৃত হর্‌মোন(Hormones)-এর সহযোগিতায়] দেহের বিভিন্ন কোষ, কলা ও অঙ্গের কার্যকারিতার সমন্বয় সাধন করে।

উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার জন্য উদ্ভিদের দেহে কোনও নার্ভ-তন্ত্র নাই। উদ্দীপকের প্রভাবে ইহাদের ক্ষেত্রে যে নানারকম চলন ও গমন দেখা যায়, তাহাদের বিষয় নবম শ্রেণীতে আলোচনা করা হইয়াছে। উদ্ভিদের চলন ও গমনের সঙ্গে হর্‌মোনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। হর্‌মোনের বিষয়ে পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে। এই পরিচ্ছেদে নার্ভ-তন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

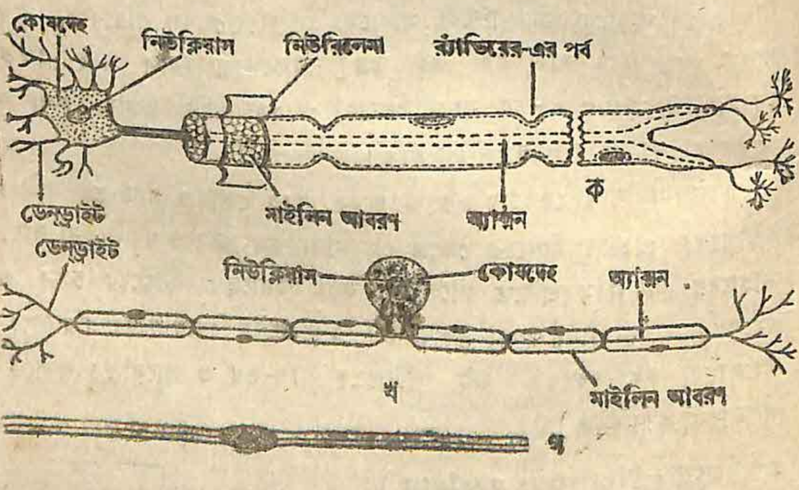
নার্ভ-তন্ত্র (Nervous system)

যে তন্ত্রের সাহায্যে (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে) প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে এবং (অনাল গ্রন্থিগুলির সহযোগিতায়) দেহের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতার সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাকে নার্ভ-তন্ত্র বলে।

নিউরোন ও নার্ভ (Neurons and nerves)

নার্ভ তন্ত্র মূলতঃ **নার্ভসেল** (Nerve cell বা **নিউরোন** (Neuron) নামের বিশিষ্ট ধরনের কোষ দিয়া গঠিত। নিউরোনের তিনটি অংশ (1 নং চিত্র-ক) : (ক) **কোষদেহ** (Cell body)—অনিয়মিত পরিধি-বিশিষ্ট এবং নিউক্লিয়াস-যুক্ত। ইহা সমগ্র কোষের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। (খ) **ডেন্ড্রাইট** (Dendrites)—কোষদেহের চারিদিক হইতে উৎপন্ন শাখান্বিত (Branched) ছোট ছোট প্রলম্বিত অংশ ; ইহারা নার্ভ-স্পন্দন (পরে দ্রষ্টব্য) কোষদেহের দিকে বহন করে। (গ) **অ্যাক্সন** (Axon)—কোষদেহ হইতে উৎপন্ন খুব লম্বা একটি তন্তু ; ইহা কোষদেহ হইতে অন্য নিউরোনের দিকে অথবা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দিকে নার্ভ-স্পন্দন বহন করিয়া লইয়া যায়।

অ্যাক্সনের চারিদিকে **নিউরিলেমা** (Neurilemma) নামের একটি পাতলা আবরণ থাকে। নিউরিলেমা-পরিবেষ্টিত অ্যাক্সনকে **নার্ভ-তন্তু** (Nerve fibre) বলে। অনেক নার্ভ-তন্তুতে নিউরোলেমা এবং অ্যাক্সনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আরও একটি পুরু আবরণ থাকে (1 নং চিত্র-ক)। ইহাকে



1 নং চিত্র—নিউরোনের প্রকারভেদ :
ক. চেষ্টা-নিউরোন (মাইলিনেটেড) ; খ. সংবেদ-নিউরোন (মাইলিনেটেড) ; গ. নন্-মাইলিনেটেড নার্ভ-তন্তু।

মাইলিন আবরণ (Myelin sheath) বা **মেডুলারী আবরণ** (Medullary-sheath) বলে। এইরকম নার্ভ-তন্তু দেখিতে সাদা এবং **মাইলিনেটেড** (Myelinate) বা **মেডুলেটেড** (Medulated) নার্ভতন্তু নামে পরিচিত।

মাইলিন বা মেডুলারী আবরণ ছাড়া নার্ভ-তন্তুকে **নন্‌-মাইলিনেটেড (Nonmyelinated)** বা **নন্‌মেডুলারি (Nonmedullary)** নার্ভ-তন্তু বলে। ইহারা ধূসর রঙের।

অনেক নিউরোনের আবার মাত্র একটি (অ্যাক্সনের মতো) লম্বা ডেন্‌ড্রাইট থাকে (1 নং চিত্র-খ)। যদিও নার্ভ-তন্তু বলিতে সচরাচর আবরণ বেষ্টিত অ্যাক্সনকে বোঝায়, তবু এইরকম লম্বা এবং আবরণ-বেষ্টিত ডেন্‌ড্রাইটকেও নার্ভ-তন্তু বলা হয়। **রক্তবাহ-সমন্বিত যোগ-কলা দিয়া বেষ্টিত একটি অথবা অনেকগুলি নার্ভ-তন্তুকে নার্ভ (Nerve) বলা হয়।** বড় নার্ভে অনেকগুলি করিয়া নার্ভ-তন্তু-গুচ্ছ থাকে।

কোনও নিউরোনের অ্যাক্সন দ্বিতীয় একটি নিউরোনের ডেনড্রাইটের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই সংযোগস্থলকে **প্রান্তসন্নিকর্ষ** বা **সাইন্যাপ্‌স (Synapse)** বলে। অ্যাক্সন এবং ডেন্‌ড্রাইট, অবশ্য, সরাসরি যুক্ত থাকে না, ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে। সাইন্যাপ্‌স কতকটা শারীরবৃত্তীয় কপাটকের কাজ করে। কারণ, নার্ভ-স্পন্দন কেবল কোনও নিউরোনের অ্যাক্সন হইতে দ্বিতীয় নিউরোনের ডেন্‌ড্রাইটের দিকে যায়, বিপরীতদিকে যাইতে পারে না।

উদ্দীপকের প্রভাবে নিউরোন তথা নার্ভ উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনাকে **নার্ভ-স্পন্দন বা নার্ভ-ইম্‌পাল্‌স (Nerve impulse)** বলে। বৈদ্যুতিক তার দিয়া যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, কতকটা সেই ভাবে নার্ভ-তন্তু দিয়া নার্ভ স্পন্দন প্রবাহিত হয়। নার্ভ-স্পন্দন অ্যাক্সনের শেষপ্রান্তে পৌছিলে, অ্যাক্সনের সাইন্যাপ্‌স-সংলগ্ন প্রান্ত হইতে **নিউরোহিউমার (Neurohumor)** নামের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহা পরবর্তী নিউরোনকে উত্তেজিত করে। এইভাবে একটি নিউরোন হইতে আর একটি নিউরোনে নার্ভ-স্পন্দন প্রবাহিত হয়।

নার্ভ-তন্তুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত নার্ভ-স্পন্দনের গতিপথ অনুযায়ী, নিউরোনদের দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়: (ক) **অন্তর্মুখ নিউরোন** বা **অন্তর্বাহী নিউরোন (Afferent neurons)**—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রে অথবা কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রের দিকে নার্ভ-স্পন্দন বহন করে। সংজ্ঞা (Sensory impulse) বহন করে বলিয়া ইহারা **সংবেদ-নিউরোন** বা **সংজ্ঞাবহ নিউরোন (Sensory neurons)** নামেও পরিচিত। (খ) **বহির্মুখ নিউরোন (Efferent neurons)**—ইহারা কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্র হইতে পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদিতে নার্ভ-স্পন্দন বহন করে। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী, ইহাদের

চেষ্টীয় নিউরোন বা **চেষ্টা-নিউরোন** (Motor neurons)-ও বলা হয় ইহা ছাড়া, **নিয়ন্ত্রক নিউরোন** বা **অ্যাড্‌জাস্‌টার নিউরোন** (Adjustor neurons) নামের তৃতীয় একধরনের নিউরোন মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে। ইহারা সংবেদ-নিউরোন এবং চেষ্টা-নিউরোনের মধ্যে সংযোগ সাধন করে (5নং চিত্র)।

যে সকল নার্ভ কেবল সংবেদ-নিউরোনের নার্ভ-তন্তু দিয়া গঠিত, তাহাদের **সংবেদ-নার্ভ** বা **সংজ্ঞাবহ নার্ভ** (Sensory nerves) বলা হয়। ইহাদের **অন্তর্মুখ নার্ভ** বা **অন্তর্বাহী নার্ভ** (Afferent nerves)-ও বলে। তেমনি, যে সকল নার্ভ কেবল চেষ্টা-নিউরোনের নার্ভ-তন্তু দিয়া গঠিত, তাহাদের নাম **চেষ্টা-নার্ভ** বা **চেষ্টীয় নার্ভ** (Motor nerves)। ইহারা আবার **বহির্মুখ নার্ভ** বা **বহির্বাহী নার্ভ** (Efferent nerves) নামেও পরিচিত। অনেক নার্ভে আবার চেষ্টীয় এবং সংজ্ঞাবহ এই দুই ধরনের নার্ভ-তন্তু থাকে। এই ধরনের নার্ভকে **মিশ্র নার্ভ** (Mixed nerves) বলা হয়।

অনেকগুলি নিউরোনের নার্ভ-তন্তু দিয়া যেমন নার্ভ তৈয়ারি হয়, তেমনি অল্প কয়েকটি অথবা অনেকগুলি নিউরোনের কেবল কোষদেহ মিলিত হইয়া **নার্ভ-গ্রন্থি, নার্ভ-গ্যাংলিয়ন** (Nerve ganglion) বা **গ্যাংলিয়ন** (Ganglion) সৃষ্টি করে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভ-তন্ত্র (Invertebrate nervous system)

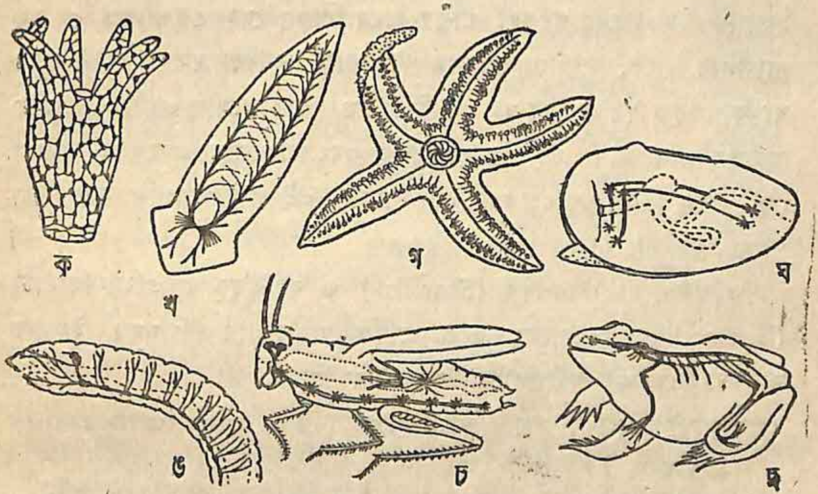
এককোষী প্রাণী প্রোটোজোয়ার দেহে নার্ভ-তন্ত্র নাই—থাকা সম্ভবও নয়। তবে প্যারামিসিয়ামের দেহে অনেকগুলি সূক্ষ্ম তন্তু থাকে। এইগুলি সিলিয়া (Cilia)-র চলনের সমন্বয়-সাধন করে বলিয়া ধারণা। স্পঞ্জদের (Sponges) দেহেও নার্ভ-তন্ত্র নাই—এমনকি নার্ভ-কোষও নাই। তবে ইহাদের দেহের ছিদ্রের চারিপাশের কোষগুলিকে স্পর্শ করিলে, ঐ কোষগুলি সঙ্কুচিত হয়।

হাইড্রা (*Hydra*) এবং অন্যান্য একনালীদেহী প্রাণী বা সিলেন্‌টেরেটদের (Coelenterates) দেহ ব্যাপিয়া একটি **নার্ভ-জালিকা** (Nerve-net) থাকে (2 নং চিত্র-ক) এই জালিকা একধরনের নার্ভ-সেল দিয়া তৈয়ারী। তবে ইহারা নিউরোনের মতো নয়। কারণ, এই নার্ভ-সেলগুলি পরস্পর সরাসরি যুক্ত থাকে (অর্থাৎ সাইন্যাপ্‌স নাই)।

অধিকাংশ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভ-তন্ত্র দেহের লম্বা অক্ষ-বরাবর বিস্তৃত

থাকে। ইহাদের দেহের অগ্রভাগের দিকে একজোড়া অথবা কয়েক জোড়া গ্যাংলিয়া (Ganglia)* থাকে। এইগুলিকে "মস্তিষ্ক"("Brain")-ও বলা হয়। মস্তিষ্কের পিছনের দিক হইতে একটি অথবা একটির বেশী **নার্ভসূত্র** (Nerve cords) উৎপন্ন হইয়া দেহের পিছন দিকে চলিয়া যায়। গ্যাংলিয়া এবং নার্ভসূত্র হইতে নার্ভ উৎপন্ন হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে চলিয়া যায়।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভসূত্র নিম্নেট এবং পৌষ্টিক নালীর অঙ্কদেশ-বরাবর অবস্থিত।



2 নং চিত্র— প্রাণীদের নার্ভ-তন্ত্র :
ক. হাইড্রা ; খ. চ্যাপ্টা কৃমি ; গ. তারামাছ ; ঘ. ঝিনুক ; ঙ. কেঁচো ;
চ. পতঙ্গ ; ছ. ব্যাঙ।

চ্যাপ্টা কৃমিদের দেহের অগ্রভাগে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি গ্যাংলিয়া থাকে (2নং চিত্র-খ)। এই গ্যাংলিয়া দুইটি হইতে উৎপন্ন নার্ভ মস্তক-অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে চলিয়া যায়। আবার গ্যাংলিয়া দুইটির পিছন দিক হইতে দুইটি নার্ভসূত্র উৎপন্ন হইয়া পৃথকভাবে পিছন দিকে চলিয়া যায়। নার্ভসূত্র দুইটি পরস্পরের সঙ্গে কয়েকটি সূক্ষ্ম অনুপ্রস্থ নার্ভ দিয়া যুক্ত।

কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি অঙ্গুরীমাল বা আনেলিডা (Annelida) পর্বের প্রাণী, চিংড়ি, পতঙ্গ ও অন্যান্য পর্বপদী (Arthropoda) পর্বের প্রাণী এবং কয়েকটি অনুন্নত ধরনের কম্বোজ (Mollusc) প্রাণীর দেহের সামনের দিকে দুই জোড়া গ্যাংলিয়া থাকে (2 নং চিত্র-ঙ ও চ)। ইহাদের মধ্যে একজোড়া

* গ্যাংলিয়ন (Ganglion)-এর বহুবচন।

গ্যাংলিয়া থাকে (কেঁচোর ক্ষেত্রে) গলবিলের অথবা (পতঙ্গের ক্ষেত্রে) অন্ন-নালীর উপরে। দ্বিতীয় জোড়া থাকে গলবিল অথবা অন্ননালীর নিচে। এই দুই জোড়া গ্যাংলিয়া অনুপ্রস্থ নার্ভ দিয়া পরস্পর যুক্ত থাকে। প্রথম জোড়া গ্যাংলিয়াকে **মস্তিষ্ক**-ও বলা হয়। দ্বিতীয় জোড়া গ্যাংলিয়ার পিছন দিক হইতে একজোড়া নার্ভসূত্র উৎপন্ন হয়। ইহারা পাশাপাশি থাকিয়া দেহের পিছন দিকে যাওয়ার পথে প্রতিটি দেহ-খণ্ডকে একজোড়া গ্যাংলিয়া এবং একজোড়া অথবা কয়েক জোড়া নার্ভ সৃষ্টি করে (2 নং চিত্র-ঙ)। চিংড়ি, পতঙ্গ, মাকড়সা ইত্যাদি উন্নতধরনের পর্বপদী প্রাণীর প্রথম দিকের দেহখণ্ডকগুলিতে যে সব গ্যাংলিয়া থাকে, তাহারা পরস্পর কাছাকাছি আসিয়া দলবদ্ধ হইয়া যায়। শামুক, ঝিনুক (2 নং চিত্র-ঘ) প্রভৃতি উন্নতধরনের কম্বোজ প্রাণীদের অঙ্কীয় নার্ভসূত্র থাকে না। ইহাদের মস্তক, পদ এবং আন্তরযন্ত্রে একজোড়া করিয়া মোট তিন জোড়া বড় বড় গ্যাংলিয়া আছে। এই গ্যাংলিয়নগুলি নার্ভ দিয়া পরস্পর যুক্ত থাকে।

তারামাছ বা স্টার-ফিশ (Star-fish) ও কণ্টকত্বক্ বা একিনোডার্মাটা (Echinodermata) পর্বের অন্যান্য প্রাণীরা অরীয়ভাবে প্রতিসম। ইহাদের নার্ভ-তন্ত্রও সেজন্যই অরীয়ভাবে বিন্যস্ত (2 নং চিত্র-গ)।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভ-তন্ত্র (Vertebrate nervous system)

পৌষ্টিক নালীর পৃষ্ঠভাগে দেহের লম্বা অক্ষ-বরাবর অবস্থিত একটিমাত্র ফাঁপা নলের মতো গঠনই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান অংশ (2 নং চিত্র-ছ)। ইহার অগ্রভাগের কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত মোটা এবং **মস্তিষ্ক (Brain)** নামে পরিচিত। বাকী অংশ অপেক্ষাকৃত সরু। ইহার নাম **নার্ভসূত্র (Nerve cord)** বা **সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)**।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভ-তন্ত্রের দুইটি প্রধান ভাগ : (ক) কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্র (Central nervous system) এবং (খ) প্রান্তস্থ নার্ভ-তন্ত্র (Peripheral nervous system) ও স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্র (Autonomic nervous system)।

সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভ-তন্ত্রের মৌলিক গঠন একইরকম এবং মোটামুটি-ভাবে কুনো ব্যাঙের মতো*। নিচের আলোচনায় কোনও বিশেষ মেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভ-তন্ত্রের বর্ণনা না দিয়া, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভ-তন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন অংশের কাজ ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হইল।

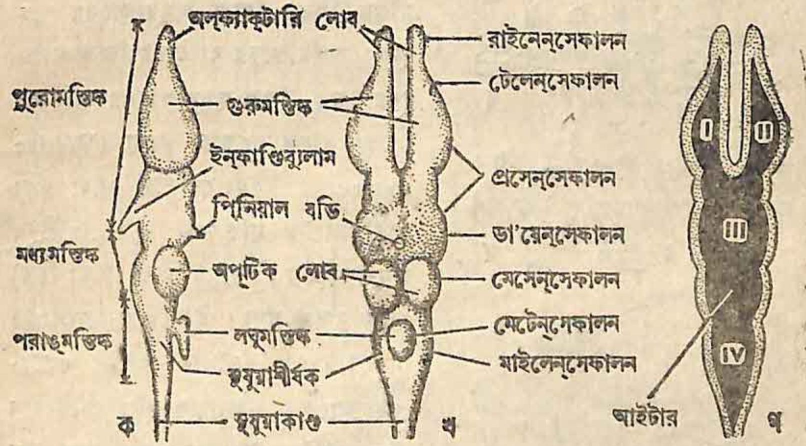
---

* কুনো ব্যাঙের নার্ভ-তন্ত্রের বিবরণ অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য-নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত।

কেন্দ্রীয় নার্ভ তন্ত্র (Central nervous system)

মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড নিয়া নার্ভ-তন্ত্র গঠিত।

মস্তিষ্ক (Brain)—3 নং চিত্রে মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখানো হইল। অনুন্নতধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর (যেমন—হাঙর ও অন্যান্য মাছ,

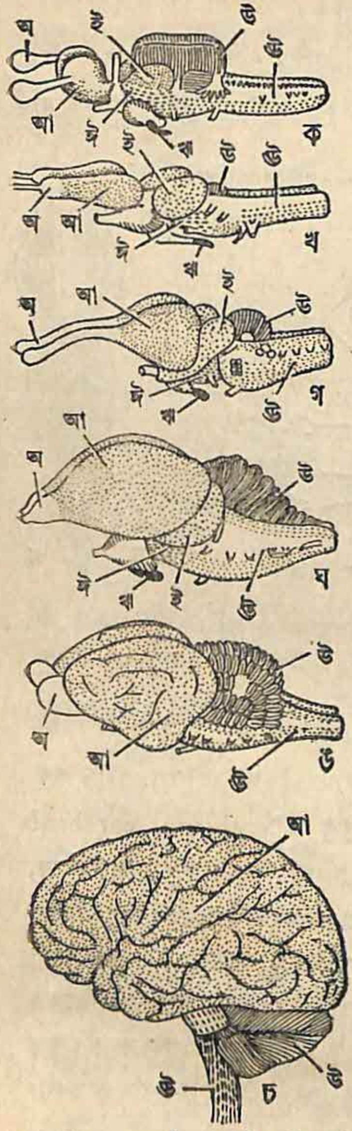


3 নং চিত্র—মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :
ক. পার্শ্ব-দৃশ্য ; খ. পৃষ্ঠ-দৃশ্য ; গ. দৈর্ঘ্যচ্ছেদ।

ব্যাঙ প্রভৃতি উভচর ইত্যাদির) ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ মোটামুটি একই সরলরেখায় বিন্যস্ত থাকে (4 নং চিত্র-ক ও খ)। কিন্তু সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ক্রমেই **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum, cerebral hemispheres) ও **লঘুমস্তিষ্ক** (Cerebellum), বিশেষ করিয়া গুরুমস্তিষ্ক, বড় হইতে থাকে এবং গুরুমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের সামনের ও পিছনের অংশগুলিকে উপর হইতে আংশিকভাবে ঢাকিয়া রাখে (4 নং চিত্র-গ হইতে চ)। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের, বিশেষতঃ মানুষের, গুরুমস্তিষ্ক খুব বড় হয়। ইহার বাহিরের দিকের স্তর অর্থাৎ **কর্টেক্স** (Cortex) খুব পুরু। ইহাতে অনেক খাঁজ দেখা যায়। কর্টেক্স লক্ষ লক্ষ নিউরোন এবং সাইন্যাপ্স দিয়া গঠিত, দেখিতে কতকটা ধূসর রঙের এবং **ধূসর বস্তু** (Grey matter) নামেও পরিচিত। গুরুমস্তিষ্ক যাবতীয় সচেতন অনুভূতি ও আচরণ, স্মরণশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ করে।

লঘুমস্তিষ্ক পেশীর চলন এবং স্পর্শন, শ্রবণ ও দর্শন অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মাছ এবং পাখিদের লঘুমস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত বড়। সেইজন্য ইহাদের চলন খুব দ্রুত এবং ইহাদের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলও খুবই উন্নতধরনের।



4নং চিত্র—কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক: ক. মাছ; খ. উভচর; গ. সরীসৃপ; ঘ. পাখি; ঙ. স্তন্যপায়ী; চ. স্তন্যপায়ী (মানুষ)। [অ. অলফ্যাকটারি লোব; আ. গুরুমস্তিষ্ক; ই. অপটিক লোব; ঈ. মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কভাগ; উ. লঘুমস্তিষ্ক; ঊ. সুষুম্না শীর্ষক; ঋ. পিটুইটারী]।

সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)—মস্তিষ্ক পিছন দিকে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। গুরুমস্তিষ্কের বাহিরের দিকে থাকে ধূসর বস্তু। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের বাহিরের দিকে থাকে **শ্বেত বস্তু** (White matter)। ইহা দেখিতে সাদা এবং মাইলিনেটেড নার্ভ-তন্তু দিয়া গঠিত। সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরের দিকে (5 নং চিত্র) থাকে **ধূসর বস্তু**। ইহাতে অ্যাডজাস্টর নিউরোন এবং চেষ্টা-নিউরোনের কোষ-দেহ থাকে। অ্যাডজাস্টর নিউরোন এবং মাইলিনেটেড নার্ভ-তন্তুগুলির মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

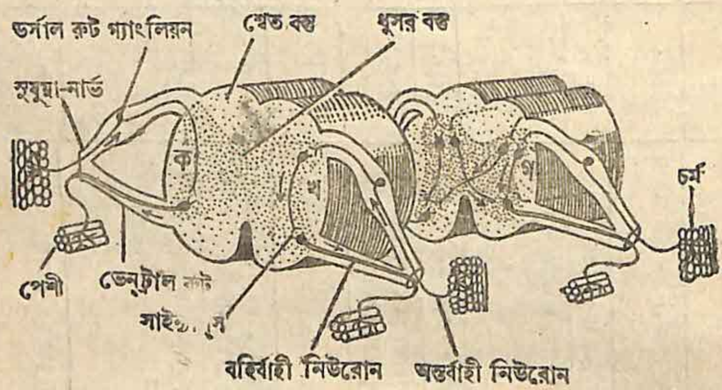
প্রান্তস্থ নার্ভ-তন্ত্র (Peripheral nervous system)

মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন দশ জোড়া (মাছ এবং উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে) অথবা বারো জোড়া (সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে) **করোটিক নার্ভ** (Cranial nerves) এবং সুষুম্নাকাণ্ড হইতে উৎপন্ন কয়েক জোড়া **সুষুম্না-নার্ভ** (Spinal nerves) নিয়া প্রান্তস্থ নার্ভ-তন্ত্র গঠিত।

করোটিক নার্ভ (Cranial nerves)—বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে করোটিক নার্ভের উৎপত্তি, গন্তব্যস্থল,

কার্যকারিতা ইত্যাদি মোটামুটি একই ধরনের। পূর্বপৃষ্ঠার তালিকায় মানুষের বিভিন্ন করোটিক নার্ভের ক্রমিক সংখ্যা, নাম, উৎপত্তিস্থল, গন্তব্যস্থল, প্রকৃতি ও কাজ দেওয়া হইল।

সুষুম্না-নার্ভ (Spinal nerves)—বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর সুষুম্না-নার্ভের সংখ্যা বিভিন্ন। ব্যাঙের সুষুম্না-নার্ভের সংখ্যা দশ জোড়া। মানুষে ইহাদের সংখ্যা ত্রিশ জোড়া। সুষুম্না-নার্ভের দুইটি করিয়া **মূল** বা **রুট (Root)** থাকে ঃ সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠ-পার্শ্বীয় অঞ্চল হইতে উৎপন্ন **পৃষ্ঠ-মূল** বা **ডর্সাল রুট (Dorsal root)** এবং অঙ্ক-পার্শ্বীয় অঞ্চল হইতে উৎপন্ন **অঙ্ক-মূল** বা



5 নং চিত্র—মেরুদণ্ডী প্রাণীর সুষুম্নাকাণ্ড ও সুষুম্না-নার্ভের গঠন (প্রস্থচ্ছেদ)।

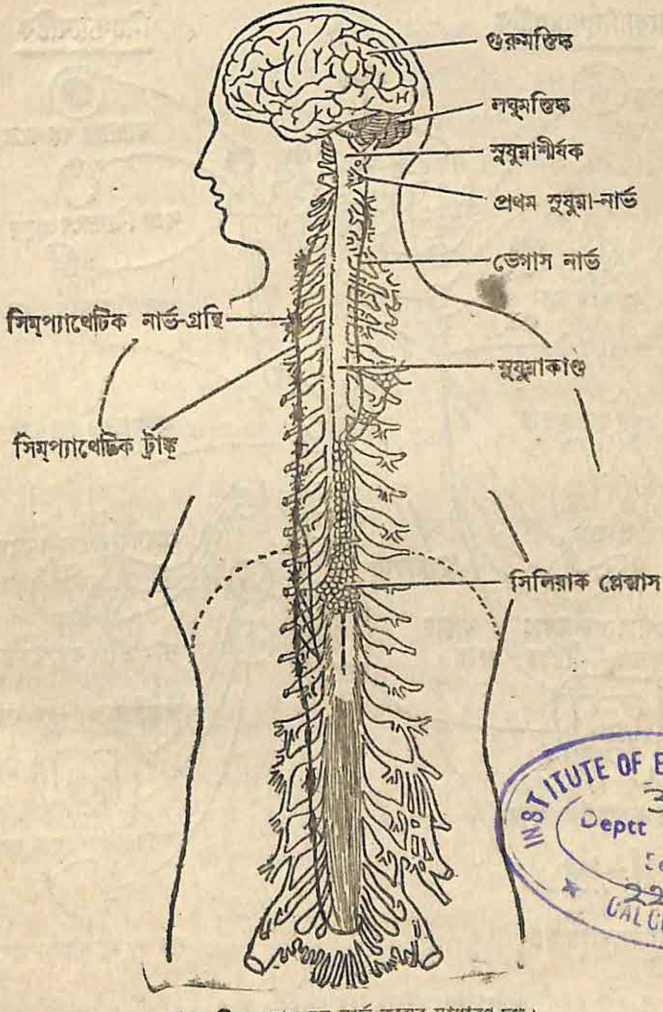
ভেন্ট্রাল রুট (Ventral root)। পৃষ্ঠ-মূল হইতে কেবল অন্তর্বাহী বা সংবেদ-নার্ভ-তন্তু এবং অঙ্ক-মূল হইতে কেবল বহির্বাহী বা চেষ্টা-নার্ভ-তন্তু উৎপন্ন হয়। পরে এই দুই ধরনের নার্ভ-তন্তু মিলিয়া এক-একটি সুষুম্না-নার্ভ তৈয়ারি করে (5নং চিত্র)। কাজেই, সুষুম্না-নার্ভমাত্রেই মিশ্র নার্ভ। পৃষ্ঠ-মূলের কাছে একটি গ্যাংলিয়ন থাকে। ইহাতে সংবেদ-নার্ভ-তন্তুগুলির কোষদেহ থাকে।

এই গ্যাংলিয়নকে **পৃষ্ঠ-মূল গ্যাংলিয়ন** বা **ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়ন (Dorsal root ganglion)** বলা হয়।

স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্র (Autonomic nervous system)

দেহ-গহ্বরের মধ্যে, মেরুদণ্ডের দুই পাশে নার্ভ-গ্যাংলিয়া-যুক্ত, দুইটি নার্ভ-সূত্র থাকে। ইহাদের **সিম্প্যাথেটিক নার্ভ-সূত্র (Sympathetic nerve cords)** বা **সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক (Sympathetic trunks)** বলা হয় (6 নং চিত্র)। ইহারাই স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান অংশ। প্রতিটি সুষুম্না

নার্ভ হইতে উৎপন্ন একটি শাখানার্ভ সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নে প্রবেশ করে। এই শাখা-নার্ভের নাম **র‍্যামাস কম্যুনিক্যান্স (Ramus communicans)**। সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন হইতে আবার নার্ভ উৎপন্ন হয়। কাছাকাছি অবস্থিত গ্যাংলিয়া হইতে উৎপন্ন নার্ভগুলি মিলিত হইয়া এক-একটি

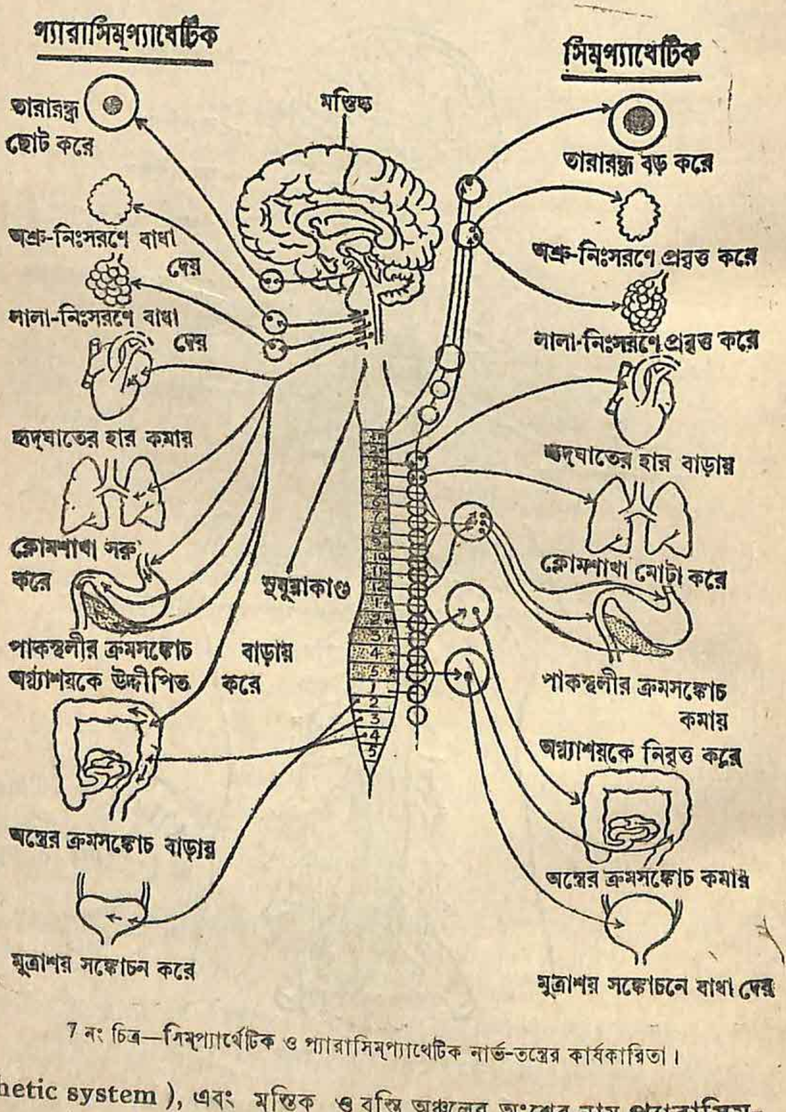


6 নং চিত্র—মানুষের নার্ভ-তন্ত্রের সাধারণ দৃশ্য।

নার্ভ-জালিকা বা **নার্ভ-প্লেক্সাস (Nerve plexus)** গঠন করে। নার্ভ-প্লেক্সাস হইতে বাহির হইয়া নার্ভগুলি আন্তরযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গে চলিয়া যায়। ঐ যন্ত্রগুলি হইতে উৎপন্ন অন্তর্বাহী নার্ভ সরাসরি সুষুম্না-নার্ভের পৃষ্ঠ-মূলে প্রবেশ

করে। অতএব, স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্রের সঙ্গে প্রান্তস্থ এবং কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

প্রধানতঃ কাজের প্রকৃতি অনুসারে, স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্রের দুইটি ভাগ: বক্ষ ও উদর অঞ্চলে অবস্থিত অংশের নাম সিম্প্যাথেটিক তন্ত্র (Sympa-



7 নং চিত্র—সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ-তন্ত্রের কার্যকারিতা।

thetic system), এবং মস্তিক ও বস্তি অঞ্চলের অংশের নাম প্যারাসিম্প্যাথেটিক তন্ত্র (Parasympathetic system) কয়েকটি করোটিক নার্ভের কিছু কিছু নার্ভ-তন্তু কনীনিকায় (তৃতীয় করোটিক নার্ভের), মুখ-বিবরের

গ্রন্থি ও শ্লেষ্মঝিল্লীতে (পঞ্চম ও সপ্তম করোটিক নার্ভের), এবং হৃৎপিণ্ড ফুসফুস, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশে (দশম করোটিক নার্ভের) চলিয়া যায়। এইগুলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক তন্ত্রের মস্তক-অঞ্চলের অংশ। এই তন্ত্রের বস্তি-অঞ্চলের অংশ হইতে উৎপন্ন নার্ভ উদরের নিম্ন অংশে অবস্থিত যন্ত্রগুলিতে নার্ভ-তন্তু সরবরাহ করে।

আন্তরযন্ত্রের অধিকাংশ যন্ত্র (হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, অন্ত্র, মূত্রাশয় ইত্যাদি) এবং কনীনিকা, অশ্রু-গ্রন্থি, লালা-গ্রন্থি ইত্যাদি প্রতিটি যন্ত্র সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক তন্ত্র হইতে উৎপন্ন নার্ভ পাইয়া থাকে। এই দুইটি তন্ত্রের কাজের ধরন পরস্পর বিপরীত-মুখী। যেমন—প্যারাসিম্প্যাথেটিক তন্ত্র হৃদ্‌ঘাতের হার কমাইয়া দেয়, কিন্তু সিম্প্যাথেটিক তন্ত্র হৃদ্‌ঘাতের হার বাড়াইয়া দেয়। 7নং চিত্রে এই দুইটি তন্ত্রের কার্যকারিতা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

করোটিক ও সুষুম্না-নার্ভগুলি প্রধানতঃ অস্থি-সংলগ্ন পেশীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। ইহারা প্রাণীকে পরিবেশের অবস্থাগত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে সাহায্য করে। স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্রের নার্ভগুলি রেখাবিহীন পেশী, গ্রন্থি এবং আন্তরযন্ত্রের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ইহারা প্রাণীর আভ্যন্তরীণ পরিবেশের সমতা রক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex actions)

পা ঝুলাইয়া বসা-অবস্থায় জানু-সংলগ্ন কণ্ডরায় মৃদু আঘাত করিলে, পা হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়া সামনের দিকে চলিয়া যায়। উত্তেজনায় এই-জাতীয় সাড়া দেওয়া সম্পূর্ণ সহজাত এবং প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। এই ধরনের ক্রিয়াকে **প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action)** বলে। আলোচ্য ক্রিয়ার আঘাতের দ্বারা কণ্ডরা উত্তেজিত করিলে ঐ অঞ্চলের সংবেদ- নিউরোনের ডেন্‌ড্রাইটে নার্ভ-স্পন্দন সৃষ্টি হয়। ঐ নার্ভ-স্পন্দন তখন সুষুম্না-নার্ভের পৃষ্ঠ-মূলে অবস্থিত কোষ-দেহে এবং সেখান হইতে অ্যাক্সনের মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর বস্তুতে প্রবেশ করে (5 নং চিত্র-ক)। সেখানে ঐ নার্ভ-স্পন্দন সাইন্যাপ্‌স অতিক্রম করিয়া চেষ্টা-নিউরোনে প্রবেশ করে। ঐ চেষ্টা-নিউরোন সুষুম্না-নার্ভের অঙ্ক-মূল-পথে বাহির হইয়া অবশেষে পায়ের পেশীতে পৌঁছায় এবং ঐ পেশী সঙ্কুচিত হয়। ফলে, পা সামনের দিকে চলিয়া যায়। এই ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংবেদ-নিউরোন সরাসরি চেষ্টা-নিউরোনের সঙ্গে (অর্থাৎ অ্যাড জাস্টর নিউরোন ছাড়া)

সংযোগ রক্ষা করে বলিয়া, ইহাকে **সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Simple reflex action)** বলে। চোখে কোনও কিছু প্রবেশ করার উপক্রম হইলে, চোখের পাতা আপনা হইতে বুজিয়া যাওয়া এবং চোখে ধূলা-বালি পড়িলে অশ্রু-গ্রন্থি হইতে অশ্রু নিঃসৃত হওয়া, সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার আরও দুইটি উদাহরণ।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অধিকাংশ প্রতিবর্ত ক্রিয়া, অবশ্য, **জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Compound reflex action)**। এই ক্ষেত্রে নার্ভ-স্পন্দন সংবেদ-নিউরোনে প্রবেশ করিয়া একটি অথবা কয়েকটি নিয়ন্ত্রক-নিউরোনের মাধ্যমে অনেকগুলি চেষ্টা-নিউরোনকে উদ্বুদ্ধ করে অথবা কয়েকটি সংবেদ-নিউরোন-বাহিত নার্ভ-স্পন্দন নিয়ন্ত্রক-নিউরোনের মাধ্যমে একটি চেষ্টা-নিউরোনে পরিবাহিত হয় (5 নং চিত্র-খ ও গ)। এই ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের সহযোগিতার প্রয়োজন হইতে পারে। কেঁচো ও শুঁয়োপোকার চলন, মানুষের হাঁটা, ব্যাঙের শিকার ধরা ইত্যাদি জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিখ্যাত রাশিয়ান বিজ্ঞানী **আইভান পাভ্লভ (Ivan Pavlov)** কুকুর নিয়া পরীক্ষা করার সময় দেখেন যে, প্রতিবার খাদ্য দেওয়ার সময় ঘণ্টা বাজাইলে; কিছুদিন পরে, খাদ্য না দিয়া ঘণ্টা বাজাইলেও কুকুরের লালা নিঃসৃত হয়। খাদ্য দেখিয়া লালা নিঃসৃত হওয়া অন্যতম স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া। কিন্তু ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে লালা নিঃসরণের কোনও স্বাভাবিক সম্পর্ক নাই। তবে দীর্ঘ দিনের শিক্ষার ফলে, ঘণ্টার শব্দ শোনা এবং খাদ্য পাওয়ার মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কুকুরের মস্তিষ্কে গ্রথিত হইয়া যায়। ফলে, খাদ্যরূপ আদি উদ্দীপকের অভাবে, ঘণ্টার শব্দরূপ প্রতিস্থাপিত উদ্দীপকই লালা নিঃসরণ করাইতে পারে। এই ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে পাভ্লভ **শর্তাধীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Conditioned reflex action)** বলেন। মানুষের ক্ষেত্রেও অনেক শর্তাধীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া দেখা যায়।

জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense organs)

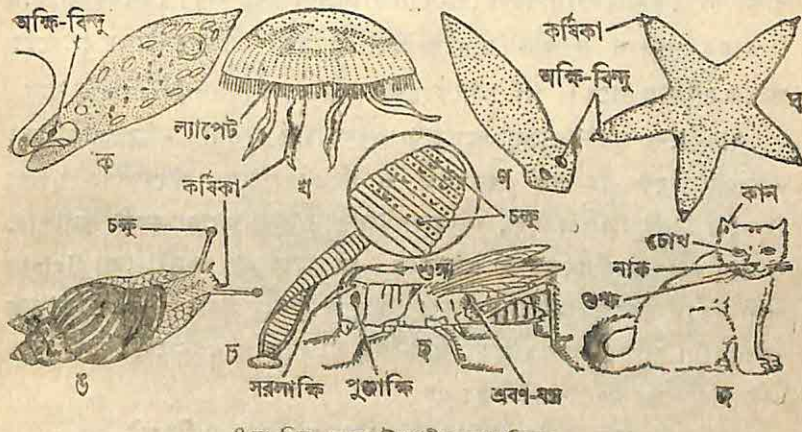
প্রাণী-দেহের যে অংশ (নার্ভ-তন্ত্রের সহযোগিতায়) উদ্দীপনায় প্রভাব গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ দেহের ভিতরে ও বাহিরে কি ঘটিতেছে তাহা নির্ধারণ করিতে পারে, তাহাকে **ইন্দ্রিয়স্থান** বা **জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense organ)** বলে।

মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রধানতঃ পাঁচ রকম—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। এইগুলির সাহায্যে যথাক্রমে আলোক, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ অনুভূতি গৃহীত হয়। অনুন্নতধরনের প্রাণীদের ক্ষেত্রে, অবশ্য, এই পাঁচ রকম জ্ঞানেন্দ্রিয়ের

সবগুলি পাওয়া যায় না। নিচের কয়েকটি অনুচ্ছেদে মানুষের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর ঐরকম অঙ্গগুলির বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইল।

চক্ষু (Eye)

চক্ষু অর্থাৎ চোখ আলোক-অনুভূতি গ্রহণ করিতে পারে। উন্নতধরনের প্রাণীরা চোখ দিয়া দেখিতে পাইলেও অনুন্নতধরণের প্রাণীরা চোখের সাহায্যে কেবল আলো আঁধারের পার্থক্য বুঝিতে পারে। এককোষী প্রাণী ইউগ্লিনা (*Euglena*)-র দেহে একটি **অক্ষি বিন্দু** (Eye spot) থাকে (৪ নং চিত্র-ক)। জেলি-ফিশ (Jelly-fish) এবং অন্যান্য একনালীদেহী প্রাণীদের দেহেও এই-রকম আলোক অনুভূতি গ্রহণে সক্ষম ইন্দ্রিয়স্থান আছে। ইহাদের **ল্যাপেট** (**Lappets**) বলে (৪ নং চিত্র-খ)। স্বাধীনজীবী চ্যাপ্টা কৃমিদের দেহের সামনের দিকে একজোড়া (৪ নং চিত্র-গ), এবং তারামাছ, (star-fish) ও



৪ নং চিত্র—কয়েকটি প্রাণীর জ্ঞানেন্দ্রিয় :
ক. ইউগ্লিনা ; খ. জেলি-ফিশ ; গ. চ্যাপ্টা কৃমি ; ঘ. তারামাছ ; ঙ. গেঁড়ি ;
চ. জোঁক ছ. পতঙ্গ ; জ. বিড়াল।

অন্যান্য কণ্টকত্বক প্রাণীর পাঁচটি বাহুর শেষপ্রান্তে এইরকম অক্ষি-বিন্দু থাকে (৪ নং চিত্র-ঘ)। গেঁড়ি (৪ নং চিত্র-ঙ) ও অন্যান্য শম্বুক-জাতীয় (Gastropods) প্রাণীর মাথায় একজোড়া সবৃন্তক চক্ষু থাকে। অক্টোপাস (*Octopus*), ললিগো (*Loligo*) ইত্যাদি কম্বোজ প্রাণীর মাথায় একজোড়া বড় চক্ষু থাকে। জোঁক (৪নং চিত্র-চ), কেঁচো প্রভৃতি অঙ্গুরীমাল প্রাণীর দেহের প্রথম অংশে কয়েক জোড়া ছোট ছোট চক্ষু থাকে। চিংড়ি, পতঙ্গ ইত্যাদি পর্বপদী

প্রাণীদের মাথায় একজোড়া করিয়া **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eyes) থাকে। পতঙ্গের মাথায় একজোড়া এবং মাকড়সার মাথায় কয়েক জোড়া **সরলাক্ষি** (Simple eyes) থাকে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মাথায় একজোড়া করিয়া সরলাক্ষি থাকে। মানুষসহ সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের গঠন মোটামুটিভাবে ব্যাঙেরই মতো*।

মানুষের **অক্ষিগোলক** (Eye ball) কয়েকটি চক্ষু-পেশীর সাহায্যে **অক্ষি কোটর**(Orbit)-এর মধ্যে আটকানো থাকে। উপরের এবং নিচের **চোখের পাতা** (Eyelids) দিয়া চোখ বন্ধ হইতে পারে। মানুষের উপপল্লব (Nictitating membrane) ক্ষয়প্রাপ্ত এবং কাজবিহীন।

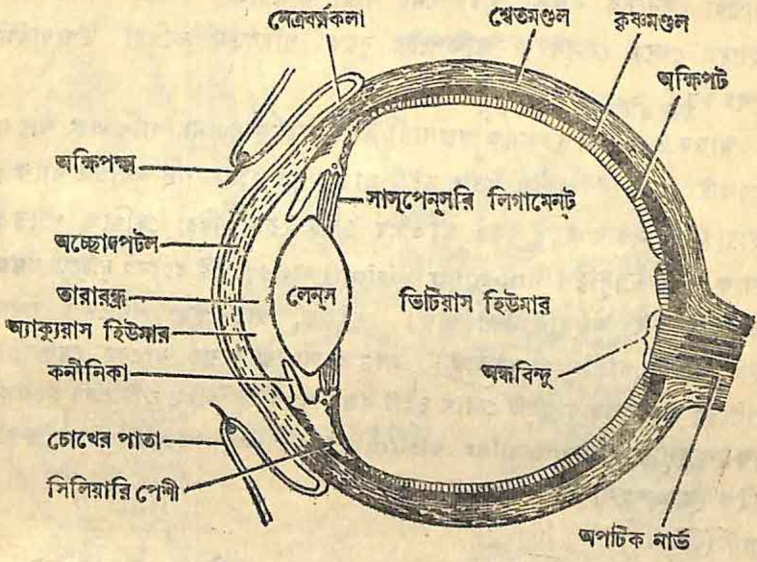
অক্ষিগোলকের প্রাচীরে তিনটি স্তর থাকে। বাহিরের স্তরটি পুরু ও শক্ত। ইহার আবার দুইটি অংশ: অক্ষিগোলকের পিছনের দিকের বেশির ভাগ অংশই দেখিতে সাদা; ইহার নাম **শ্বেতমণ্ডল** (Sclera)। সামনের দিকের বাকী অংশকে **অচ্ছোদপটল** (Cornea) বলে। ইহা স্বচ্ছ। চোখের পাতার ভিতরের পাতলা ও স্বচ্ছ আবরণ প্রসারিত হইয়া অচ্ছোদপটলের বাহিরের তলকে ঢাকিয়া রাখে। এই পর্দাকে **নেত্রবর্ত্মকলা** (Conjunctiva) বলে।

মাঝখানের স্তরটি কালো এবং **কৃষ্ণমণ্ডল** (Choroid) নামে পরিচিত। সামনের দিকে এই স্তর শ্বেতমণ্ডল ও অচ্ছোদপটলের সংযোগস্থল হইতে ভিতরের দিকে বাঁকিয়া গিয়া, অচ্ছোদপটলের পিছন দিকে একটি বৃত্তাকার, পাতলা ও রঞ্জক-কণাযুক্ত পর্দা সৃষ্টি করে। এই পর্দার নাম **কনীনিকা** (Iris)। কনীনিকার কেন্দ্রে একটি বৃত্তাকার ছিদ্র থাকে। ইহার নাম **তারারন্ধ্র** (Pupil)। অক্ষিগোলকের মধ্যে যাহা কিছু আলোক প্রবেশ করে, তাহা কেবল এই তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়াই সম্ভব হয়।

অক্ষিগোলকের তৃতীয় অর্থাৎ ভিতরের স্তরটিকে **অক্ষিপট** (Retina) বলে। অক্ষিপটে প্রায় সাড়ে এগারো কোটি লম্বাটে ও বেলনাকার **রড কোষ** (Rod cells) এবং প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ ছোট ও কতকটা শাঙ্কব **কোন্ কোষ** (Cone cells) থাকে। রড কোষগুলি মৃদু আলোক-অনুভূতি গ্রহণ করিতে পারে। কোন্ কোষগুলি তেমনিভাবে তীব্র আলোক-অনুভূতি গ্রহণ করে। ইহারা রঙিন বস্তু দেখায় সাহায্য করে। অক্ষিপট ও অপ্‌টিক নার্ভের সংযোগস্থলে রড ও কোন্ কোষ না থাকায়, এই অঞ্চল আলোক-সুবেদী নয়। ইহাকে **অন্ধবিন্দু** (Blind spot) বলে।

* আরশোলার পুঞ্জাক্ষি এবং ব্যাঙের সরলাক্ষির বিবরণ অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য-নির্ঘণ্টের অন্তর্গত।

কনীনিকার পিছনে একটি স্বচ্ছ দ্বি-উত্তল **লেন্স (Lens)** থাকে। কৃষ্ণ-মণ্ডলের মুক্ত-প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত **সিলিয়ারি পেশী (Ciliary muscles)** হইতে উৎপন্ন সূতার মতো কতকগুলি **সাস্‌পেন্‌সরি লিগামেন্ট (Suspensory ligaments)**-এর সাহায্যে লেন্সটি অক্ষিগোলকের গহ্বরে ঝুলিয়া থাকে। লেন্স ও অচ্ছোদপটলের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ **অ্যাকুয়াস হিউমার (Aqueous humor)** নামের জলীয় পদার্থ দিয়া, এবং লেন্স ও অক্ষিপটের মাঝখানে অবস্থিত বড় প্রকোষ্ঠ **ভিট্রিয়াস হিউমার (Vitreous humor)** নামের জেলির মতো পদার্থ দিয়া পূর্ণ থাকে।



9 নং চিত্র—মানুষের চক্ষুর গঠন (দীর্ঘচ্ছেদ)।

দৃষ্টি (Vision)—বস্তু হইতে আগত আলোকরশ্মি ক্রমান্বয়ে অচ্ছোদপটল, অ্যাকুয়াস হিউমার, তারারন্ধ্র ও লেন্সের মধ্য দিয়া শেষে অক্ষিপটে পড়ে। আপতিত আলোকরশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়া যাওয়ার সময় প্রতিসৃত হইয়া অক্ষিপটের উপর একগুচ্ছ অভিসারী রশ্মিরূপে পড়ে। ফলে, অক্ষিপটের উপর বস্তুটির সংক্ষিপ্ত ও উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। অক্ষিপটের আলোক-সুবেদী রড ও কোন কোষগুলি অপ্‌টিক নার্ভের মাধ্যমে এই আলোক-অনুভূতি মস্তিষ্কের দৃষ্টি-কেন্দ্রে পৌছাইয়া দেয়। মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় এক অজ্ঞাত উপায়ে উল্টা প্রতিবিম্ব সোজা হইয়া যায়। ফলে, আমরা বস্তুটিকে সোজা দেখি।

দূরের বস্তু দেখবার সময় সিলিয়ারি পেশী সঙ্কুচিত হওয়ায় লেন্স অপেক্ষাকৃত পাতলা হইয়া যায়। নিকটের বস্তু দেখার সময় সিলিয়ারি পেশী শ্লথ হইয়া যায়। ফলে, লেন্স পুরু হয়। এইভাবে লেন্সের বক্রতা পরিবর্তন, এবং তাহার ফলে লেন্সের ফোকাস-দৈর্ঘ্য(Focal length)-এর পরিবর্তনের দ্বারা মানুষ একই জায়গায় থাকিয়া দূরের ও নিকটের বস্তু সমান ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। যে প্রক্রিয়ায় প্রাণী স্থান ত্যাগ না করিয়া বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে সমান স্পষ্ট দেখিতে পায়, তাহাকে **উপযোজন** (Accommodation) বলা হয়। ব্যাঙ এবং আরও অনেক অনুন্নত ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীরা লেন্সের বক্রতা পরিবর্তনের দ্বারা উপযোজন করিতে পারে না। ইহাদের ক্ষেত্রে লেন্স ও অক্ষিপটের দূরত্ব পরিবর্তন করিয়া উপযোজন সম্পন্ন হয়।

মানুষ এবং আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী, কয়েক ধরনের পাখি এবং আরও কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখ দুইটি মাথায় খুব কাছাকাছি অবস্থিত থাকে। ইহারা একই সময়ে একই বস্তুর প্রতিবিম্ব দুইটি চোখ দিয়া দেখিতে পারে। ইহাকে **দ্বিনেত্রদৃষ্টি (Binocular vision)** বলে। এই ধরনের দৃষ্টিতে বস্তুর দূরত্ব সঠিকভাবে অনুমান করা যায়। সেইজন্য, সূচে সুতা পরানোর সময় দুইটি চোখই খোলা রাখা দরকার। ব্যাঙ ও অন্যান্য কয়েক ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের একই সময়ে দুইটি চোখে দুইটি বস্তুর পৃথক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। ইহাকে **একনেত্রদৃষ্টি** (Monocular vision) বলে। এই ধরনের দৃষ্টিতে বস্তুর সঠিক দূরত্ব অনুমান করা যায় না।

কর্ণ (Ear)

কর্ণ অর্থাৎ কান শব্দ (অর্থাৎ বায়ু, জল অথবা কঠিন বস্তুর মধ্যে উদ্ভুত কম্পন) অনুভূতি গ্রহণ করে। শ্রবণই কানের প্রধান কাজ।

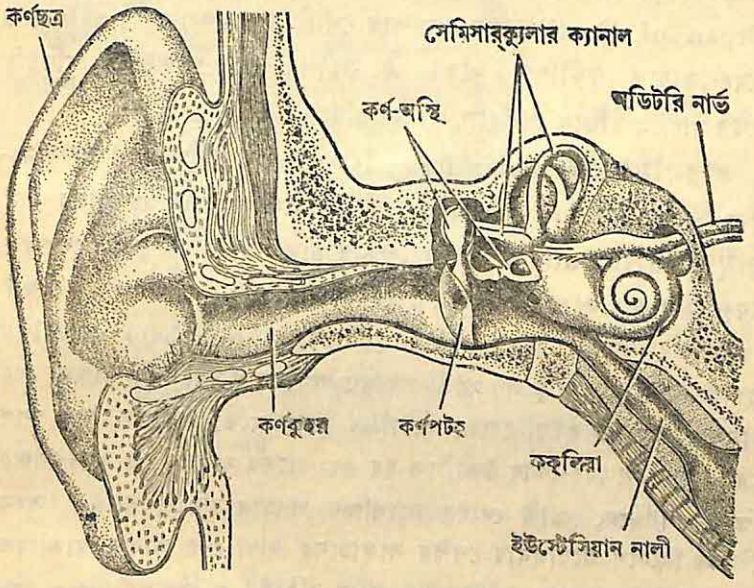
কয়েক ধরনের পতঙ্গ ছাড়া অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা শব্দ-অনুভূতি গ্রহণে অক্ষম। ফড়িং ইত্যাদি পতঙ্গের বক্ষে উহাদের **শ্রবণ-যন্ত্র (Hearing organs)** থাকে (8 নং চিত্র-ছ)।

বিভিন্ন দলের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কানের গঠনে কম-বেশি পার্থক্য থাকিলেও উহাদের গঠনের মূলগত ভিত্তি মোটামুটি একই রকম*। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মাথার দুই পাশে দুইটি কান থাকে। কানের তিনটি প্রধান অংশ—(ক) বহিঃকর্ণ, (খ) মধ্যকর্ণ এবং (গ) অন্তঃকর্ণ।

* ব্যাঙের কানের গঠন অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য-নির্ঘণ্টের অন্তর্গত।

বহিঃকর্ণ (External ear)—অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাথার দুই পাশে দুইটি **কর্ণছত্র** (Pinna) দেখা যায়। কর্ণছত্রের কেন্দ্র হইতে মাথার ভিতরের দিকে একটি লম্বাটে গহ্বর থাকে। ইহাকে **কর্ণকুহর** (External auditory meatus) বলে। কর্ণকুহরের শেষে **কর্ণপটহ** (Ear drum, Tympanum, Tympanic membrane) নামের একটি পর্দা থাকে।

মধ্যকর্ণ(Middle ear)—কর্ণপটহের বিপরীত দিকে একটি ছোট প্রকোষ্ঠে তিনটি বিশিষ্ট আকৃতির ছোট ছোট অস্থি নির্দিষ্ট রীতিতে সাজানো থাকে। ইহাদের নাম যথাক্রমে **ম্যালিয়াস** (Malleus), **ইন্‌কাস** (Incus) ও



10 নং চিত্র—মানুষের কানের গঠন।

স্টেপিস (Stapes)। ইহাদের **কর্ণ-অস্থি** (Ear ossicles) বলা হয়। স্টেপিস **ডিম্বাকার পর্দা** (Oval membrane) নামক অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মধ্যকর্ণ **ইউস্টেসিয়ান নালী** (Eustachian tube) নামের একটি নালীর সাহায্যে গলবিলের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

অন্তঃকর্ণ (Internal ear)—করোটির মধ্যে অস্থি-নির্মিত প্রকোষ্ঠে অন্তঃকর্ণ থাকে। এই প্রকোষ্ঠের প্রাকার এবং অন্তঃকর্ণের মধ্যবর্তী অঞ্চলে **পেরিলিমফ** (Perilymph) নামের তরল থাকে। অন্তঃকর্ণ প্রধানতঃ উপর-নিচে অবস্থিত তিনটি থলির মতো অংশ দিয়া গঠিত। ইহার ভিতরে

এণ্ডোলিম্‌ফ (**Endolymph**) নামের আর একরকম তরল থাকে। উপরের অংশটির নাম **ইউট্রিক্যুলাস** (**Utriculus**)। ইহার উপরের দিকে তিনটি **অর্ধবৃত্তাকার নালী** বা **সেমিসার্‌ক্যুলার ক্যানাল** (**Semicircular canals**) থাকে। এই নালীগুলির এক প্রান্ত ফোলা। অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলি পরস্পর সমকোণে অবস্থিত। মাঝের থলিটির নাম **স্যাক্যুলাস** (**Sacculus**)। ইহার নিচের দিকে **কক্‌লিয়া** (**Cochlea**) নামের প্যাঁচানো অংশ থাকে।

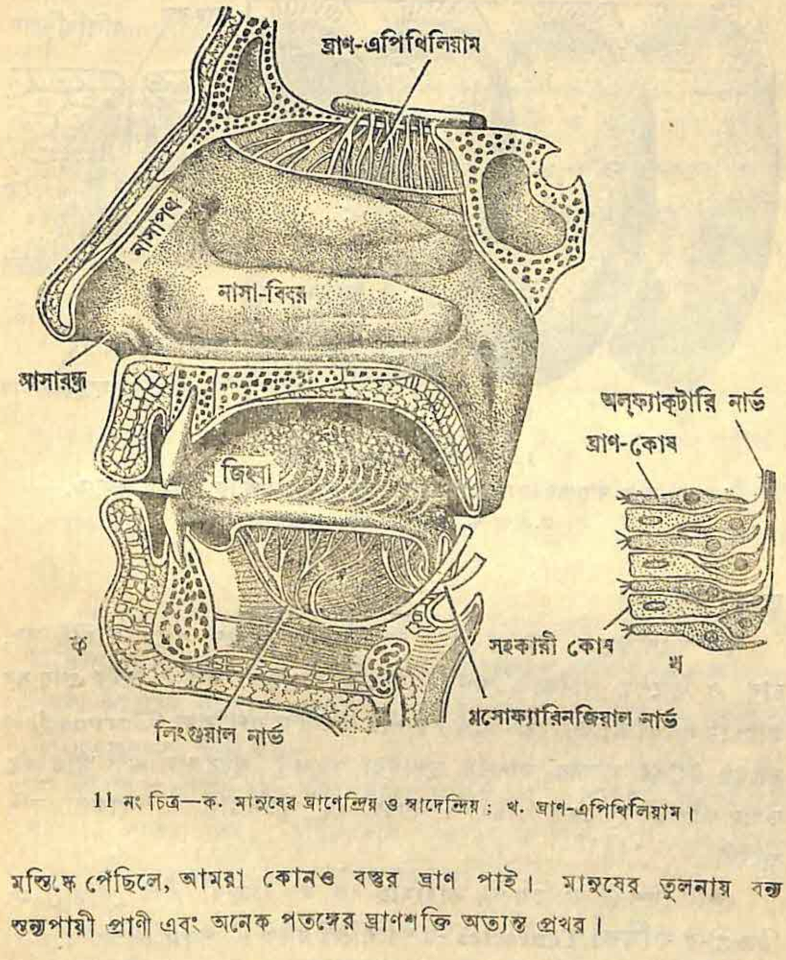
শ্রবণ (**Hearing**)—কর্ণছত্র দ্বারা সংগৃহীত শব্দ-তরঙ্গ কর্ণকুহরের পথে গিয়া কর্ণপটহে কম্পন সৃষ্টি করে। ঐ কম্পন ক্রমান্বয়ে কর্ণ-অস্থি, পেরিলিম্‌ফ ও এণ্ডোলিম্‌ফে পরিবাহিত হয় এবং কক্‌লিয়ায় অবস্থিত **অর্‌গ্যান অফ কর্টি** (**Organ of Corti**) নামক শ্রবণ-যন্ত্রে পৌঁছিয়া কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের সংবেদ-কোষকে উদ্দীপিত করে। ঐ উদ্দীপনা নার্ভ-স্পন্দনরূপে অডিটরি নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছিলে, আমরা শুনিতে পাই।

ভারসাম্য-রক্ষা (**Balancing**)—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্তঃকর্ণ ভারসাম্য-রক্ষার কাজও করে। সেমিসার্‌ক্যুলার ক্যানালের ফোলা অংশগুলির নাম **অ্যাম্‌পুলা** (**Ampulla**)। ইহার ভিতরে চুলের মতো প্রলম্বিত অংশযুক্ত সংবেদ-কোষ এবং এণ্ডোলিম্‌ফের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় একটি বা অল্প কয়েকটি চূর্ণকময় কণা থাকে। ইহাদের নাম **ওটোলিথ** (**Otoliths**)। স্বাভাবিক অবস্থায় ওটোলিথগুলি চুলের মতো প্রলম্বিত অংশ স্পর্শ করে না। কিন্তু দেহ কোনওদিকে কাত হইয়া গেলে, ওটোলিথ চুলের মতো প্রলম্বিত অংশ স্পর্শ করে। ফলে, সংবেদ-কোষ উদ্দীপিত হয় এবং নার্ভের মাধ্যমে ঐ নার্ভ-স্পন্দন মস্তিষ্কে পৌঁছিলে, প্রাণী দেহের আপেক্ষিক অবস্থান বুঝিতে পারে। তখন মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় পেশীর সঙ্কোচনের দ্বারা দেহ আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরিয়া আসে। মাছেদের কানে বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ থাকে না, কক্‌লিয়াও থাকে না। ইহাদের কানের প্রধান কাজ ভারসাম্য-রক্ষা। স্তন্যপায়ী ছাড়া অন্য কোনও মেরুদণ্ডী প্রাণীর কর্ণছত্র নাই। ব্যাঙের কর্ণকুহরও নাই। চিংড়ি, শামুক ইত্যাদি প্রাণীর ভারসাম্য-রক্ষার যন্ত্রের নাম **স্ট্যাটোসিস্‌ট** (**Statocyst**)। ইহার মধ্যে চুলের মতো প্রলম্বিত অংশযুক্ত সংবেদ-কোষ ও **স্ট্যাটোলিথ** (**Statolith**) নামের বালুকণা অথবা চূর্ণকময় কণা থাকে।

নাসিকা (Nose)

নাসাপথের শেষভাগে অবস্থিত ঘ্রাণ-এপিথিলিয়াম (Olfactory epithelium)-এর সরু সরু নিউরোন থাকে (11 নং চিত্র-খ)। ইহাদের সিলিয়া-যুক্ত

মুক্ত-প্রান্ত নাসাপথে উন্মুক্ত থাকে। বায়ু-বাহিত উদ্বায়ী বস্তুর সংস্পর্শে এই নিউরোনগুলির মুক্ত-প্রান্ত উদ্দীপিত হয়। ঐ উদ্দীপনা নার্ভ-বাহিত হইয়া



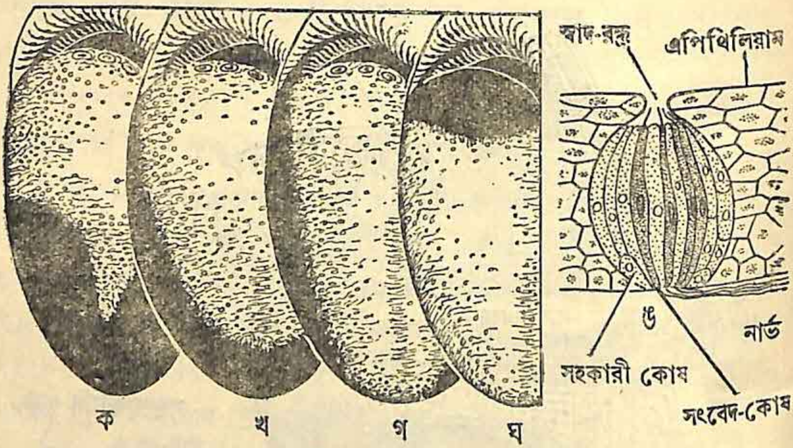
11 নং চিত্র—ক. মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্বাদেন্দ্রিয় ; খ. ঘ্রাণ-এপিথিলিয়াম।

মস্তিষ্কে পৌঁছিলে, আমরা কোনও বস্তুর ঘ্রাণ পাই। মানুষের তুলনায় বন্য স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং অনেক পতঙ্গের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর।

জিহ্বা (Tongue)

জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয়। জিহ্বায় **স্বাদ-কোরক** (**Taste buds**) থাকে (12 নং চিত্র-ঙ)। স্বাদ-কোরকে চুলের মতো প্রলম্বিত অংশযুক্ত সরু সরু একগুচ্ছ সংবেদ-কোষ থাকে। উদ্দীপিত হইলে, আমরা বস্তুর স্বাদ পাই। মানুষের জিহ্বায় মিষ্ট, লবণাক্ত, টক এবং তিতা—এই কয় ধরনের স্বাদ অনুভব করার জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল (12 নং চিত্র ক. হইতে ঘ.) আছে। মুখ-গহ্বরের

অন্যান্য অংশে এবং মুখের চারপাশেও স্বাদ-কোরক থাকে। শিঙি, মাগুর ও পোনা মাছের সারা গায়ে এবং প্রজাপতির পায়ে স্বাদ-কোরক থাকে।



12 নং চিত্র—মানুষের স্বাদেন্দ্রিয় :
ক. হইতে ঘ. মানুষের জিহ্বার বিভিন্ন স্বাদ অনুভূতির অঞ্চল (ক. মিষ্ট, খ. লবণাক্ত, গ. টক, ঘ. তিতা ; ঙ. স্বাদ-কোরক।

ত্বক্ (Skin)

ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়। ইহা যে কেবল স্পর্শ অনুভব করিতে পারে তাহাই নয়, চাপ ও তাপের পার্থক্যও অনুভব করিতে পারে। ত্বক্ বা চর্মের প্রায় সব জায়গায় সংবেদ-নার্ভের মুক্ত-প্রান্ত সরাসরি অথবা **কর্পাস্‌ল** (Corpuscles) নামের বিশিষ্ট গঠনের মাধ্যমে ছড়াইয়া থাকে। মুখমণ্ডলে এবং আঙুলের ডগায় এইগুলি খুব বেশি পরিমাণে থাকায়, এই অঞ্চলগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি সুবেদী।

জেলি-ফিশ (8 নং চিত্র-খ), তারামাছ (8 নং চিত্র-ঘ) এবং গেঁড়ি(8 নং চিত্র-ঙ)-র **কর্ষিকা**(Tentacles)-য় স্পর্শেন্দ্রিয় থাকে। পতঙ্গ (8 নং চিত্র-খ) এবং চিংড়ির **শুঙ্গ**(Antennae)-এ স্পর্শেন্দ্রিয় থাকে। কুকুর, বিড়াল (8 নং চিত্র-জ) ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর **গুম্ফ** (Vibrissae) স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

———

হর্‌মোন
(Hormones)

২

জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জননের জন্য খাদ্য ও জল, এবং খুব অল্প পরিমাণে খনিজ-পদার্থ ও ভাইটামিন (Vitamins) নামের একধরনের জৈব পদার্থ দরকার। অধিকাংশ জীবের বৃদ্ধি, জনন এবং নানারকম বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য আরও একধরনের জৈব পদার্থ প্রয়োজন। ইহাদের নাম **হর্‌মোন (Hormones)**। খনিজ-পদার্থ এবং এই দুই ধরনের জৈব পদার্থ (ভাইটামিন ও হর্‌মোন), অবশ্য, খুবই অল্প পরিমাণে দরকার—কোনও কারণে জীবদেহে ইহাদের পরিমাণ বেশি হইলে, জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ভাইটামিন প্রাণি-দেহে সংশ্লেষিত হয় না, খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত হয় (উদ্ভিদ-দেহে ভাইটামিন সংশ্লেষিত হইলেও উদ্ভিদের জীবনধারণে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সঠিক জানা নাই), কিন্তু হর্‌মোন মাত্রেই জীবদেহে সংশ্লেষিত হয়।

যে সব জৈব পদার্থ জীবদেহের কোনও এক অংশে খুব অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্যান্য অংশে পরিবাহিত হইয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের হর্‌মোন (Hormones) বলা হয়।

জীবাণু ও জীবাণু-সদৃশ জীব ছাড়া অন্যান্য প্রায় সবরকম জীবের দেহে হর্‌মোন পাওয়া যায়। উদ্ভিদ-দেহে নার্ভ-তন্ত্র না থাকায়, কেবল হর্‌মোন-ই আভ্যন্তরীণ সমন্বয়সাধন এবং যোগাযোগ রক্ষা করে।

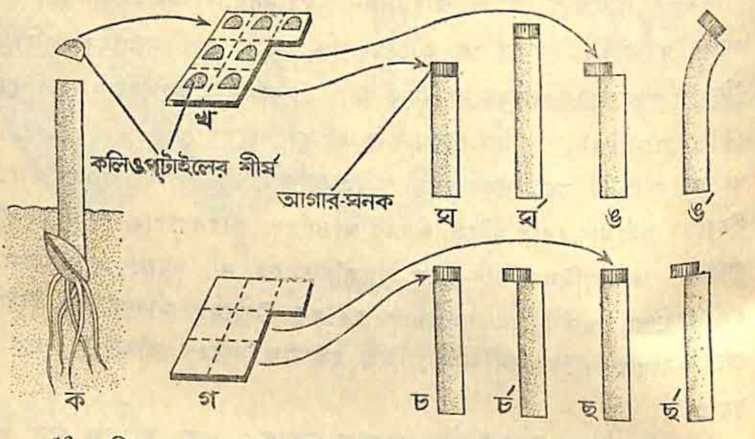
উদ্ভিদ-হর্‌মোন (Plant hormones)

উদ্ভিদের বর্ধমান অঞ্চলের ভাজক কলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং পরিবহন-যোগ্য হর্‌মোন উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে, বিশেষ করিয়া পরিণত কোষেও, হর্‌মোন উৎপন্ন হইতে পারে ; তবে, খুবই কম পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায়, উৎপন্ন হর্‌মোন এইসব অঞ্চল হইতে পরিবাহিত হয় না।

অক্সিন (Auxins, জিব্রালিন (Gibberellins) এবং সাইটোকাইনিন (Cytokinins)—উদ্ভিদে প্রধানতঃ এই তিন ধরনের হর্‌মোন পাওয়া যায়—পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় ইহাদের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

অক্সিন (Auxins)

ইহারা উদ্ভিদের ভাজক কলায় অর্থাৎ বর্ধমান অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং সেখান হইতে সংবহন-কলার মধ্য দিয়া নিচের দিকে পরিবাহিত হয়। **নিম্নাভিমুখী** (Basipetally) পরিবহন অক্সিনের বৈশিষ্ট্য। অক্সিনের নিম্নাভিমুখিতা প্রমাণের জন্য নিচে বর্ণিত **ওয়েন্‌ট(Went, 1928-32)-এর আভেনা কলিওপ্‌টাইল পরীক্ষা** (Avena coleoptile test) করা যায়।



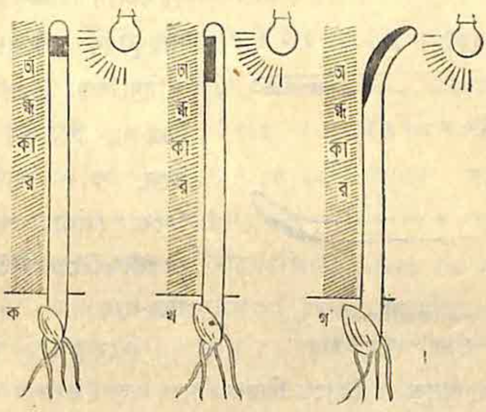
13 নং চিত্র—আভেনা কলিওপ্‌টাইল পরীক্ষা [ঘ´ কলিওপটাইলের ঠিক উপরে (একধারে নয়) আগার-ঘনক বসিবে ; কলিওপ্‌টাইলের এক ধারে (ঠিক উপরে নয়) আগার-ঘনক বসিবে]।

কয়েকটি সদ্য-অঙ্কুরিত জই (*Avena*) গাছের কলিওপ্‌টাইলের শীর্ষের তিন-চার মিলিমিটার নিচে কাটিয়া (13 নং চিত্র-ক), কাটা-অংশগুলি একটি আগার-খণ্ড(Agar block]*-এর (13 নং চিত্র-খ) উপর সাজাইয়া রাখিতে হয়। ঠিক একইরকম দেখিতে আর একটি আগার-খণ্ড (13 নং চিত্র-গ)নেওয়া দরকার। আগার-খণ্ড দুইটি কয়েকটি সমান আয়তনের ঘনকে কাটিতে হয়। ইহার পর, খ-চিহ্নিত আগার-খণ্ড হইতে কাটা একটি ঘনক একটি কলিওপ্‌টাইলের কাটা-অংশের ঠিক উপরে (13 নং চিত্র-ঘ) এবং দ্বিতীয় একটি ঘনক অন্য একটি কলিওপ্‌টাইলের কাটা-অংশের এক ধারে (13 নং চিত্র-ঙ) বসাইয়া দিতে হইবে। একইভাবে, গ-চিহ্নিত আগার-খণ্ড হইতে কাটা দুইটি ঘনক একটি কলিওপ্‌টাইলের কাটা-অংশের ঠিক উপরে (13 নং চিত্র-চ) এবং অন্য একটির কাটা-অংশের এক ধারে (13 নং চিত্র-চ´) বসাইয়া দিতে হয়।

* আগার একধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। জলে উত্তপ্ত করিলে, ইহা আঠালো তরলে পরিণত হয় ; ঠাণ্ডা করিলে, জেলির মতো হয়।

এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে, যে কলিওপ্‌টাইল দুইটিতে গ-চিহ্নিত আগারের ঘনক রাখা হইয়াছিল, তাহাদের বৃদ্ধি হয় নাই (13 নং চিত্র-ছ ও ছ´), কিন্তু থ-চিহ্নিত আগারের ঘনক যে দুইটি কলিওপ্‌-টাইলের কাটা-অংশের উপর রাখা হইয়াছিল, তাহারা লম্বায় বাড়িয়াছে (13 নং চিত্র-ঘ´ ও ঙ´)। তবে, ঙ-চিহ্নিত কলিওপ্‌টাইলের যে পাশে আগার-ঘনক রাখা হইয়াছিল, উহা তাহার বিপরীতদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে।

কলিওপ্‌টাইলের বর্ধমান অঞ্চল উহার শীর্ষে। এইখানে অক্সিন উৎপন্ন হইয়া, নিচের দিকে পরিবাহিত হয়। কাজেই, কলিওপ্‌টাইলের কাটা-শীর্ষগুলি থ-চিহ্নিত আগার-খণ্ডের উপর রাখিলে, অক্সিন ঐ আগার-খণ্ডে আসিয়া জমা হয়। আবার, শীর্ষ কাটিয়া দিলে, অক্সিন না থাকায়, কলিওপ্‌-টাইলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়। সেইজন্য, চ ও চ´-চিহ্নিত (অক্সিন-বিহীন আগার-ঘনক

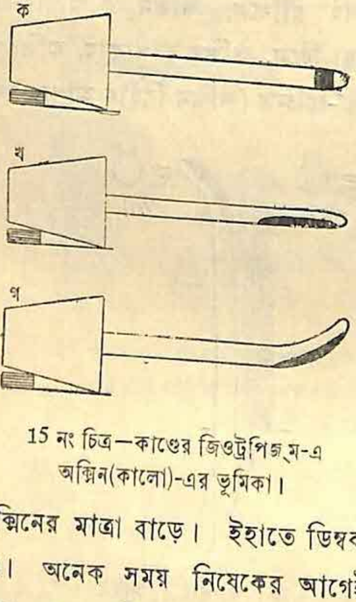


14 নং চিত্র—কাণ্ডের ফোটোট্রপিজ্‌ম-এ অক্সিন (কালো)-এর ভূমিকা।

দেওয়ায়) কলিওপ্‌টাইলের বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু ঘ ও ঙ-চিহ্নিত কলিওপ্‌-টাইলের কাটা-অংশের উপরে অক্সিন-যুক্ত আগার-ঘনক রাখায়, অক্সিন আগার-ঘনক হইতে কলিওপ্‌টাইলের কাটা-অংশে পরিবাহিত হয় বলিয়া, উহাদের বৃদ্ধি হয়। ঙ চিহ্নিত কলিওপ্‌টাইলের কাটা-অংশের এক ধারে অক্সিন-যুক্ত আগার-ঘনক বসানো হইয়াছিল বলিয়া, অক্সিন কেবল কলিওপ্‌টাইলের সেই দিকে প্রবেশ করিয়া ঐ দিকেরই বৃদ্ধি ঘটায়, বিপরীতদিকে অক্সিন না থাকায়, ঐ অংশ বাড়ে না। দুই পাশে এইরকম অসমান বৃদ্ধির জন্য কলিওপ্‌টাইল বাঁকিয়া যায়। অতএব, এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হয় যে, অক্সিন ছাড়া উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্সিন কেবল নিচের দিকে পরিবাহিত হয়।

অক্সিনের কাজ (Functions of Auxins—অক্সিন নিউক্লিয়াস-বিভাজনে সাহায্য করে। অক্সিনের উপস্থিতিতে গৌণ ভাজক কলার কোষ তাড়াতাড়ি বিভাজিত হয়। অক্সিনের প্রভাবে কোষের রসস্ফীতি-চাপ বাড়ে; ফলে, কোষান্তর আস্রাবণ অব্যাহত থাকায়, অক্সিন পরোক্ষভাবে জল-শোষণেও সাহায্য করে।

উদ্ভিদের ট্রপিক চলন, বিশেষ করিয়া ফোটোট্রপিজ্‌ম এবং জিওট্রপিজ্‌ম, অক্সিনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। অক্সিন কাণ্ডের আলোকিত অংশের বিপরীতদিকে পরিবাহিত হয় (14 নং চিত্র-খ); ফলে, কাণ্ডের অন্ধকার দিকটি বেশি পরিমাণে বাড়ে। এই অসমবৃদ্ধির জন্য, কাণ্ড আলোকের দিকে বাঁকিয়া যায় (14 নং চিত্র-গ)। একইভাবে অক্সিন অনুভূমিক কাণ্ডের নিচের তলে পরিবাহিত হওয়ায় (15 নং চিত্র-খ), ঐ তল বেশি বাড়ে। ফলে, কাণ্ড বাঁকিয়া উপরের দিকে (অর্থাৎ অভিকর্ষজ বলের বিপরীতদিকে) উঠে (15 নং চিত্র-গ)।



15 নং চিত্র—কাণ্ডের জিওট্রপিজ্‌ম-এ অক্সিন(কালো)-এর ভূমিকা।

নিষেকের পর ডিম্বাশয়ে অক্সিনের মাত্রা বাড়ে। ইহাতে ডিম্বক বীজে এবং ডিম্বাশয় ফলে রূপান্তরিত হয়। অনেক সময় নিষেকের আগেই ডিম্বাশয়ে অক্সিনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। তখন ডিম্বাশয় সরাসরি ফলে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু ফলের মধ্যে বীজ সৃষ্টি হয় না। এইভাবে, বীজহীন কলা, পেঁপে ও আঙুর উৎপন্ন হয়।

অক্সিনের মাত্রা কমিয়া গেলে, গাছ হইতে পত্র ও ফল খসিয়া পড়ে। অক্সিনের প্রভাবে শীর্ষমুকুলের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, কিন্তু কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি হয় না। অক্সিনের উপস্থিতিতে পাথরকুচির পাতা এবং অনেক বৃক্ষের কর্তিত শাখা হইতে মূল বাহির হয়।

জিব্রালিন (Gibberellins)

1937 খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন জাপানী বিজ্ঞানী এই হর্‌মোন আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন উদ্ভিদে একুশ রকম জিব্রালিনের সন্ধান পাওয়া যায়।

জিব্রালিনের কাজ (Functions of Gibberellins)—জিব্রালিন মোটামুটি অক্সিনের মতো কাজ করে; অর্থাৎ, কোষ-বিভাজন এবং কোষের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জিব্রালিনের উপস্থিতিতে ক্যাম্‌বিয়াম (Cambium) নামের গৌণ ভাজক কলার কোষ তাড়াতাড়ি বিভাজিত হয়। সুপ্ত অবস্থায়, বীজের মধ্যে জিব্রালিন থাকে না বলিলেই চলে। সেইজন্য, ঐ সময় বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। অঙ্কুরোদ্গমের আগে বীজে জিব্রালিনের মাত্রা বাড়িয়া যায়। অনেক সময় জিব্রালিনের উপস্থিতিতে বীজহীন ফল সৃষ্টি হয়।

জিব্রালিন কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই হর্‌মোন ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে না। অক্সিন ও জিব্রালিনের মূলগত পার্থক্য এই যে, জিব্রালিন সবসময় নিচের দিকে পরিবাহিত হয় না, যে-কোনও দিকে সমানভাবে পরিবাহিত হইতে পারে।

সাইটোকাইনিন (Cytokinins)

অন্যান্য হর্‌মোন হইতে সাইটোকাইনিনের প্রধান পার্থক্য এই যে, ইহারা উৎপত্তি-স্থলেই ক্রিয়াকলাপ করিতে পারে, অথবা পরিবাহিত হইয়া অন্য অঞ্চলেও ক্রিয়াকলাপে অংশ নেয়। ইহারা যে-কোনও দিকে পরিবাহিত হইতে পারে। সাইটোকাইনিন প্রধানতঃ কোষ-বিভাজনের সাইটোকাইনেসিস (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) পর্যায়ে সাহায্য করে।

কৃষিকার্যে হর্‌মোনের উপযোগিতা (**Uses of hormones in agriculture**)—আজকাল কৃষিকার্যে নানাভাবে হর্‌মোনের প্রয়োগ করা হয়। যেমন—গোলাপ, জবা প্রভৃতি যে সমস্ত উদ্ভিদে সহজে বীজ উৎপন্ন হয় না, তাহাদের ব্যাপক চাষের জন্য অপরিণত শাখা ছোট করিয়া কাটিয়া, কাটা-অংশে অক্সিনের দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়। তখন কাটা-অংশ হইতে মূল সৃষ্টি হয়। মূল-যুক্ত শাখা রোপণ করিলে নূতন গাছ পাওয়া যায়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া ফল চাষ করিলে, একই সময়ে সমস্ত পরিণত ফল গাছ হইতে তোলা সম্ভব হয় না। এইসময়ে গাছে অক্সিনের দ্রবণ ছিটাইয়া দেওয়া হয়; ইহাতে ফল পরিণত হইলেও বৃক্ষচ্যুত হয় না। ফলে, অযথা ফসল নষ্ট হয় না। আগাছা দমনের কাজেও অক্সিন ব্যবহৃত হয়। আবাদী জমিতে নির্দিষ্ট মাত্রায় অক্সিনের দ্রবণ ছিটাইলে আগাছা মরিয়া যায়, কিন্তু শস্য-উদ্ভিদের ক্ষতি হয় না। বীজহীন ফল উৎপন্ন করার জন্য অক্সিন প্রয়োগ করা হয়। যে সব বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না, তাহাদের ক্ষেত্রে জিব্রালিন প্রয়োগ করিয়া অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত করা হয়।

প্রাণী-হর্‌মোন (Animal hormones)

উন্নততর প্রাণীদের দেহে হর্‌মোন উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রন্থি থাকে। যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি গ্রন্থির নিজস্ব নালী থাকে। এইসব গ্রন্থির ক্ষরণ নালীপথে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু হর্‌মোন-উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলির কোনও নালী থাকে না। সেইজন্য, ইহাদের নাম **অনাল গ্রন্থি** (Ductless glands। ইহাদের ক্ষরণ অর্থাৎ হর্‌মোন সরাসরি রক্তে মিশিয়া যায় এবং রক্ত-বাহিত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায়। হর্‌মোনের অন্য নাম **অন্তঃক্ষরণ** (Internal secretion) এবং **এণ্ডোক্রিন** (Endocrines)। সেই হিসাবে, এই গ্রন্থিগুলিকে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (Glands of internal secretion) এবং **এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি** (Endocrine glands)-ও বলা হয়। নিচে প্রাণীদের হর্‌মোন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হর্‌মোন (Hormones of invertebrates)

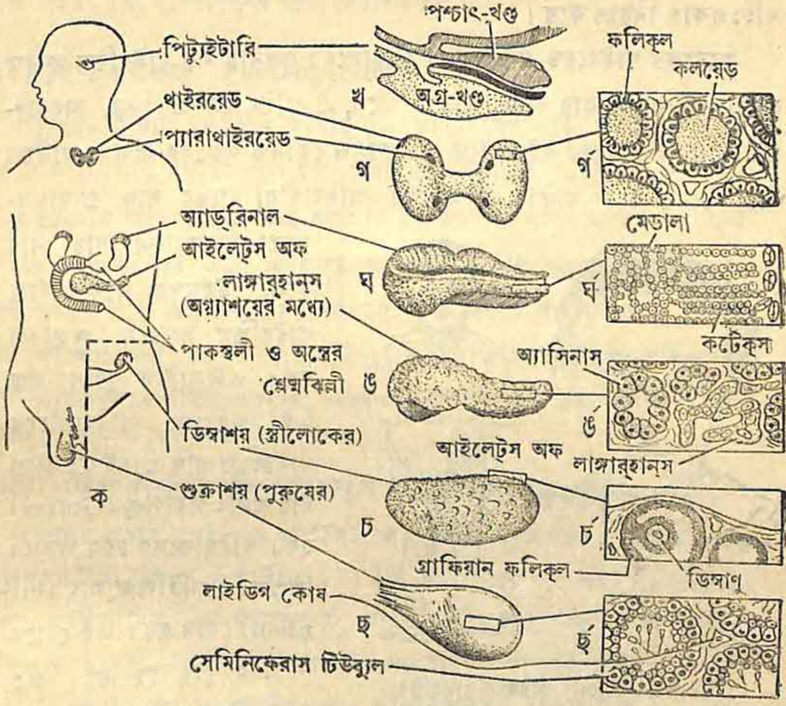
চ্যাপ্টা কৃমি, অঙ্গুরীমাল, কম্বোজ এবং বিভিন্ন ধরনের পর্বপদী প্রাণীর দেহে হর্‌মোনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। চিংড়ি-জাতীয় কবচী (Crustacean) প্রাণীদের চক্ষু-বৃন্তে **সাইনাস গ্রন্থি** (Sinus glands) নামের গ্রন্থি হইতে একরকম হর্‌মোন ক্ষরিত হয়। ইহা পরিবেশ অনুযায়ী দেহের রঙ পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে।

পতঙ্গের নির্মোচন (Moulting) ও রূপান্তর হর্‌মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পতঙ্গের শূক(Larva)-এর মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অঞ্চলে **নিউরোসিক্রিটরি কোষ** (Neurosecretory cells) নামের কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের কোষ থাকে। শূক পরিণত হইলে, এই কোষে **নিউরোসিক্রিটরি হর্‌মোন** (Neurosecretory hormone) নামের হর্‌মোন উৎপন্ন হয়। ঐ হর্‌মোন নার্ভ-বাহিত হইয়া মস্তিষ্কের পিছনে অবস্থিত **কর্‌পোরা কার্ডিয়াকা** (Corpora cardiaca) নামের দুইটি গ্রন্থিতে পৌঁছাইয়া সেখান হইতে রক্তে পরিবাহিত হয়। রক্ত-বাহিত হইয়া উহা বক্ষে অবস্থিত **প্রোথোরাসিক গ্রন্থি** (Prothoracic glands)-তে পৌঁছিলে, ঐ গ্রন্থি হইতে **এক্‌ডাইজোন** (Ecdysone) নামের হর্‌মোন ক্ষরিত হয়। এই হর্‌মোন রূপান্তরে সাহায্য করে। অপরিণত শূকের মস্তিষ্কের পিছনে অবস্থিত **কর্‌পোরা অ্যালাটা** (Corpora alata) নামের গ্রন্থি হইতে একধরনের হর্‌মোন নিঃসৃত হয়।

ইহা রূপান্তরে বাধা দেয়। রূপান্তরের ঠিক আগে এই হর্‌মোনের ক্ষরণ কমিয়া যায়। তখন একডাইজোনের সাহায্যে রূপান্তর সম্ভব হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হর্‌মোন (Hormones of vertebrates)

মানুষ ও অন্যান্য উন্নতধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে পিট্যুইটারি (Pituitary), থাইরয়েড (Thyroid), প্যারাথাইরয়েড (Parathyroids), আইলেট্‌স অফ লাঙ্গার্‌হান্‌স (Islets of Langerhans), অ্যাড্‌রিনাল (Adrenals), গোনাড (Gonads) এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লেষ্মঝিল্লীর



16 নং চিত্র—মানুষের অনাল গ্রন্থিগুলির অবস্থান ও গঠন।

অংশবিশেষ (Parts of the gastric and intestinal mucosa) হর্‌মোন-নিঃসরণকারী প্রধান গ্রন্থি (16 নং চিত্র-ক)। ইহা ছাড়া অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর অমরা(Placenta)-ও হর্‌মোন নিঃসরণ করে। নিচে প্রধানতঃ মানুষের এই গ্রন্থিগুলি হইতে ক্ষরিত হর্‌মোনের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

থাইরয়েড (Thyroid)

মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থি পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি খণ্ড এবং মাঝখানের একটি সরু অংশ নিয়া গঠিত (16 নং চিত্র-গ)। ইহা বাগ্‌যন্ত্রের নিচে,

শ্লোমনালিকার দুই পাশে অবস্থিত। ইহাকে **গলগ্রন্থি**-ও বলা হয়। ইহা প্রধানতঃ ফলিক্‌ল (Follicles) নামের বর্তুলাকার বদ্ধ থলির মতো আণু-বীক্ষণিক অংশ দিয়া গঠিত (16 নং চিত্র-গ)। ফলিক্‌ল-এর গহ্বরে একধরনের কলয়েড (Colloid) থাকে। এই কলয়েডের সঙ্গে থাইরয়েড গ্রন্থি-নিঃসৃত হর্‌মোন **থাইরক্সিন (Thyroxin)** মিশিয়া থাকে। থাইরক্সিন আয়োডিন-ঘটিত একধরনের জৈব যৌগ।

থাইরক্সিন প্রাণীর সামগ্রিক বিপাক, দৈহিক বৃদ্ধি এবং গৌণ যৌন লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

অনেকের থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে প্রয়োজনের তুলনায় অল্প থাইরক্সিন ক্ষরিত হওয়ায়, বিপাকের হার কমিয়া যায়। ফলে, ঐ ব্যক্তি অলসপ্রকৃতির, অবসাদগ্রস্ত এবং শীতকাতুরে হইয়া পড়ে। কোনও কোনও অঞ্চলের জলে ও মাটিতে আয়োডিনের অভাব থাকায়, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজন-মতো আয়োডিন পায় না। ফলে, ইহাদের পক্ষে পর্যাপ্ত থাইরক্সিন সংশ্লেষে অসুবিধা হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের থাইরয়েড গ্রন্থি প্রায়ই বড় হইয়া যায় অর্থাৎ **গলগণ্ড (Goiter)** হয়। থাইরক্সিনের চরম অভাবে শিশুদের **ক্রিটিনিজ্‌ম (Cretinism)** রোগ হয়। এই রোগে শিশুদের বৃদ্ধি হয় না, এবং উহারা বিকলাঙ্গ (17নং চিত্র-খ), বুদ্ধিহীন ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে থাইরক্সিনের এইরকম অভাবে **শ্লেষ্মা-স্ফীতি** বা **মিক্সিডিমা (Myxedema)** রোগ হয়। এই রোগে চামড়া পুরু ও ফোলা, চুল অল্প ও শুষ্ক এবং স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির অতিক্রিয়াশীলতায় গ্রন্থিটি আকারে বড় হয় এবং খুব বেশি পরিমাণে থাইরক্সিন উৎপন্ন হয়। ফলে, বিপাক ও হৃদ্‌বাতের হার এবং তাপ উৎপাদন বাড়িয়া যায়, এবং সর্বদাই উত্তেজনা, মেজাজ খারাপ, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই



17 নং চিত্র—ক. বেশি পরিমাণে থাইরক্সিন ক্ষরিত হওয়ার ফলাফল ; খ. ক্রিটিনিজ্‌ম রোগগ্রস্ত শিশু।

অবস্থায় অক্ষিগোলক দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায় (17 নং চিত্র-ক)।

থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং থাইরক্সিন ক্ষরণ পিট্যুইটারি গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত থাইরোট্রপিক হর্‌মোন (35 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নামের হর্‌মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনি, থাইরক্সিন আবার অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স এবং গোনাড—এই দুই ধরনের অনাল গ্রন্থির ক্ষরণকে প্রভাবিত করে।

ব্যাঙাচির রূপান্তর, নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরীসৃপদের নির্মোচন এবং পাখির পালক খসিয়া পড়া থাইরক্সিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্যারাথাইরয়েড (Parathyroids)

থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রোথিত অবস্থায় দুই জোড়া **ডিম্বাকার** প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি দেখা যায় (16 নং চিত্র-গ)। ইহারা **প্যারাথর্‌মোন**(Parathormone) নামের হর্‌মোন ক্ষরণ করে। এই হর্‌মোন রক্তরসে ক্যালশিয়াম ও ফস্‌ফেটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এইরকম খনিজের বিপাককেও প্রভাবিত করে। ইহার অভাবে রক্তে ক্যাল্‌শিয়ামের পরিমাণ কম হইয়া যায়। ফলে, পেশীর প্রবল আক্ষেপ দেখা দেয়। প্যারাথাইরয়েডের অতিক্রিয়াশীলতায় অস্থি হইতে রক্তে ক্যাল্‌শিয়াম চলিয়া আসায়, রক্তে ক্যাল্‌শিয়ামের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। মাছেদের দেহে প্যারাথাইরয়েড থাকে না।

আইলেট্‌স অফ লাঙ্গার্‌হান্‌স (Islets of Langerhans)

অগ্ন্যাশয় প্রধানতঃ অসংখ্য **অ্যাসিনাস** (Acinus) নামের নালীযুক্ত থলির মতো অংশ দিয়া গঠিত (16 নং চিত্র-ঙ)। ইহা অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা(Exocrine) অংশ। অ্যাসিনাসের মধ্যে অগ্ন্যাশয়-রস ক্ষরিত হয়। অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অনেকগুলি কোষগুচ্ছ পাওয়া যায়। কোষগুচ্ছগুলি অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ এবং আইলেট্‌স অফ লাঙ্গার্‌হান্‌স (16 নং চিত্র-ঙ) নামে পরিচিত। ইহাতে দুই ধরনের কোষ থাকে—**আল্‌ফা কোষ** (Alfa cells) এবং **বিটা কোষ** (Beta cells)। আল্‌ফা কোষ হইতে **গ্লুকাগন** (Glucagon) এবং বিটা কোষ হইতে **ইন্‌সুলিন** (Insulin) নামের হর্‌মোন ক্ষরিত হয়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে, ইন্‌সুলিন যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন হইতে গ্লুকোজ সৃষ্টিতে বাধা দেয় এবং রক্তের গ্লুকোজ হইতে যকৃৎ ও পেশীতে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষে, এবং মেদ-কোষে স্নেহদ্রব্য সংশ্লেষে সহায়তা করে। অতএব, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমানো

ইন্সুলিনের কাজ। ইহা প্রোটীন-সংশ্লেষেও সাহায্য করে। গ্লুকাগন ইন্সুলিনের ঠিক বিপরীত কাজ করে।

রোগের ফলে আইলেট্স অফ লাঙ্গারহান্স ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ইন্সুলিনের অভাবে, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মূত্রের সঙ্গেও বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ নির্গত হয়। এই অবস্থাকে **মধুমেহ (Diabetes mellitus)** বলে। আর একধরনের রোগে খুব বেশি পরিমাণে ইন্সুলিন উৎপন্ন হয়। ফলে, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ খুব কম হইয়া যাওয়ায়, রোগী কতকটা মাতালের মতো ব্যবহার করে।

অ্যাড্রিনাল (Adrenals)

দুইটি বৃক্কের অগ্র-প্রান্তে (অর্থাৎ উপরের প্রান্তে) দুইটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থাকে (16 নং চিত্র-ক)। ইহাদের **সুপ্রারেনাল (Suprarenals) গ্রন্থি**-ও বলা হয়। ইহাদের দুইটি করিয়া স্তর থাকে। বাহিরের স্তরটির নাম **কর্টেক্স (Cortex)**, ভিতরেরটির (16 নং চিত্র-ঘ) নাম **মেডালা (Medulla)**।

মেডালা হইতে প্রধানতঃ **অ্যাড্রিনালিন (Adrenalin)** বা **এপিনেফ্রিন (Epinephrin)** নামের হর্মোন ক্ষরিত হয়। ইহা উদর-অঞ্চল ও চর্মের ধমনিকা সরু করে, রক্তচাপ ও হৃদ্ঘাতের হার এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়। এই হর্মোন আবার পেশী-সংলগ্ন ধমনিকা এবং ক্লোমশাখা বড় করে, অন্ত্রের ক্রমসঙ্কোচ কমায়। অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ সিম্প্যাথেটিক নার্ভ তন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাগ, ভয়, আনন্দ ইত্যাদি মানসিক উত্তেজনার সময় খুব বেশি পরিমাণ অ্যাড্রিনালিন ক্ষরিত হয়।

কর্টেক্স হইতে অনেকগুলি হর্মোন ক্ষরিত হয়। ইহারা সমবেতভাবে রক্তে লবণ ও গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে এবং ঠাণ্ডা, অক্সিজেনের স্বল্পতা ও রোগ-জীবাণুর আক্রমণ ইত্যাদি শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে সাহায্য করে। রোগের ফলে কর্টেক্স নষ্ট হইয়া গেলে চর্ম তামাটে হয়, রোগীর অবস্থার ক্রমাবনতি হইতে থাকে এবং ক্রমে মৃত্যু হয়।

ব্যাঙের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বৃক্কের অঙ্কতলে থাকে। হাঙর এবং অন্যান্য মাছের কর্টেক্স ও মেডালা আলাদা আলাদাভাবে থাকে।

গোনাড (Gonads)

গোনাড বলিতে পুরুষ-প্রাণীর একজোড়া **শুক্রাশয় (Testes)** এবং স্ত্রী-প্রাণীর একজোড়া **ডিম্বাশয়(Ovaries)**-কে বোঝায়। ইহাদের যৌন গ্রন্থি

(Sex glands) বা **মুখ্য যৌন অঙ্গ**(Primary sex organs)-ও বলা হয়। অগ্ন্যাশয়ের মতো, ইহাদেরও দুইটি অংশ—বহিঃক্ষরা অংশ হইতে **জনন-কোষ** (Germ cells), অর্থাৎ শুক্রাশয় হইতে **শুক্রাণু** (Sperms) এবং ডিম্বাশয় হইতে **ডিম্বাণু** (Ova) উৎপন্ন হয়; অন্তঃক্ষরা অংশ হইতে কয়েক রকম **যৌন হর্‌মোন** (Sex hormones) ক্ষরিত হয়।

শুক্রাশয় প্রধানতঃ **সেমিনিফেরাস টিউব্যুল** (Seminiferous tubules) নামের অসংখ্য সূক্ষ্ম নালী দিয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এই নালীগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে **ইণ্টার্‌স্টিশিয়াল কোষ** (Interstitial cells) বা **লাইডিগ কোষ** (Leydig cells) নামের কোষ থাকে (16 নং চিত্র-ছ´)। এই কোষগুলি **টেস্‌টোস্টিরোন** (Testosterone) নামের হর্‌মোন ক্ষরণ করে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে এই হর্‌মোনের প্রভাবে **আনুষঙ্গিক যৌন অঙ্গগুলি** (Accessory sex organs), অর্থাৎ গোনাড ছাড়া জনন-তন্ত্রের অন্যান্য অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে এবং **গৌণ যৌন লক্ষণগুলি** (Secondary sexual characters)*, যেমন গোঁফ-দাড়ি, বড় কণ্ঠমণি, মোটা স্বর এবং পুরুষোচিত চেহারা ও স্বভাব প্রকাশ পায়। ষাঁড়ের কাঁধ মোটা, স্বভাব অশান্ত হয়। উপস্থচ্ছেদ (Castration) করিলে, অর্থাৎ যৌন পরিপূর্ণতা লাভের আগে গোনাড কাটিয়া বাদ দিলে ষাঁড় বলদে পরিণত হয়। বলদের কাঁধ চওড়া হয় না; ইহা স্বভাবে শান্ত এবং সহজে বশ মানে। টেস্‌টোস্টিরোনের অভাবে বলদ ষাঁড়ের বৈশিষ্ট্য পায় না। তেমনিভাবে, উপস্থচ্ছেদ-করা মোরগের ঝুঁটি বড় হয় না।

ডিম্বাশয়ে **গ্রাফিয়ান ফলিক্‌ল** (Graafian follicles) নামের ছোট ছোট তরলপূর্ণ গহ্বরের মধ্যে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় (16 নং চিত্র-চ´)। এই তরলে প্রধানতঃ **এস্‌ট্রাডা'ওল** (Estradiol) নামের হর্‌মোন ক্ষরিত হয়। এই হর্‌মোনের প্রভাবে স্ত্রী-প্রাণীর আনুষঙ্গিক যৌন অঙ্গগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং স্ত্রী-প্রাণী জননক্ষম হয়। গ্রাফিয়ান ফলিক্‌ল হইতে ডিম্বাণু নির্গত হওয়ার পর, ঐখানে **কর্পাস লিউটিয়াম** (Corpus luteum) নামের গঠন সৃষ্টি হয়। এইখান হইতে **প্রোজেস্‌টেরোন** (Progesterone) নামের হর্‌মোন ক্ষরিত হয়। গর্ভাবস্থার শেষদিকে **অমরা** হইতেও এই হর্‌মোন ক্ষরিত হয়।

---

* জনন-অঙ্গের পার্থক্য ছাড়া, বহিরাকৃতি ও স্বভাবের যে সমস্ত পার্থক্য দেখিয়া স্ত্রী- ও পুরুষ-প্রাণী চেনা যায়, তাহাদের গৌণ যৌন লক্ষণ বলে। ময়ূরের পেখম, সিংহের কেশর ইত্যাদিও গৌণ যৌন লক্ষণের উদাহরণ।

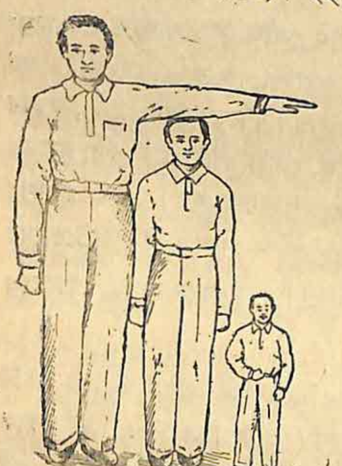
প্রোজেস্‌টেরোন এবং এস্‌ট্রাডা'ওল মিলিতভাবে জরায়ুকে নিষিক্ত ডিম্বাণু গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তোলে। এই দুইটি হর্‌মোনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাবে স্তন্য-গ্রন্থি স্ফীত হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লেষ্মঝিল্লী (Gastric and intestinal mucosa)

পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লেষ্মঝিল্লীতে অবস্থিত দুই ধরনের এককোষী গ্রন্থি হইতে যথাক্রমে **গ্যাস্‌ট্রিন** (Gastrin) এবং **সিক্রিটিন** (Secretin) নামের হর্‌মোন ক্ষরিত হয়। গ্যাস্‌ট্রিন পাকস্থলীকে পাক-রস (Gastric juice) নিঃসরণে এবং সিক্রিটিন অগ্ন্যাশয়কে অগ্ন্যাশয়-রস নিঃসরণে উদ্‌বুদ্ধ করে।

পিটুাইটারি (Pituitary)

মস্তিষ্কের অঙ্কতলে অবস্থিত ছোট এই গ্রন্থিটির অপর নাম **হাইপোফাইসিস** (Hypophysis)। ইহার দুইটি অংশ (16 নং চিত্র-খ)—**অগ্র-খণ্ড** (Anterior lobe) এবং **পশ্চাৎ-খণ্ড** (Posterior lobe)।



18 নং চিত্র—পিটুাইটারি গ্রন্থি-নিঃসৃত বৃদ্ধি-উদ্দীপক হর্‌মোনের মাত্রাধিক্যের ফলে উৎপন্ন অতিকায় দেহধারী (বাঁয়ে), সাধারণ উচ্চতা-বিশিষ্ট মানুষ (মাঝে) এবং বৃদ্ধি-উদ্দীপক হর্‌মোনের অপ্রতুলতার ফলে সৃষ্ট বামন (ডাইনে)।

মস্তিষ্কের **হাইপোথ্যালামাস** (Hypothalamus) অংশে **অ্যান্‌টি-ডায়ুরেটিক হর্‌মোন** (Antidiuretic hormone) এবং **অক্সিটোসিন** (Oxytocin) নামের দুইটি হর্‌মোন উৎপন্ন হয়। ইহারা নার্ভ-তন্তুর মাধ্যমে পরিবাহিত হইয়া পিটুাইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎ-খণ্ডে আসিয়া জমা হয় এবং সেখান হইতে প্রয়োজন-মতো রক্তে বাহিত হয়। প্রথমোক্ত হর্‌মোন বৃক্কের জল-শোষণ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ক্যাপিলারি সরু করে। অক্সিটোসিন অন্ত্র, পিত্তাশয়, গবিনী, মূত্রাশয়, জরায়ু এবং স্তন্য-গ্রন্থির রেখা-বিহীন পেশীর সঙ্কোচন করে। অগ্র-খণ্ড হইতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ হর্‌মোন ক্ষরিত হয়। পরের পৃষ্ঠায় এই খণ্ড হইতে ক্ষরিত প্রধান কয়টি হর্‌মোনের বিষয়ে বলা হইল।

বৃদ্ধি-উদ্দীপক হর্‌মোন (Growth-stimulating hormone)—ইহা বিপাক এবং দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। এই হর্‌মোন বেশি মাত্রায় ক্ষরিত হইলে অথবা পিট্যুইটারি গ্রন্থি বড় হইয়া গেলে, দেহ অস্বাভাবিক রকম লম্বা হইয়া যায়। কৈশোরে অথবা যৌবনের প্রারম্ভে এই-রকম হইলে হাত-পায়ের অস্থিগুলি খুব লম্বা হইয়া যায়; ফলে, উচ্চতা পৌনে তিন মিটার (9 ফুট) পর্যন্ত হইতে পারে। বেশি বয়সে এই হর্‌মোনের আধিক্য হইলে, কপাল, নাক ও নিচের চোয়ালের হাড় বড় হয় এবং মুখমণ্ডলের চামড়া পুরু ও খস্‌খসে হইয়া যায়। অপরপক্ষে, এই হর্‌মোনের ঘাট্‌তি হইলে দৈহিক বৃদ্ধি বাধা পায়। ফলে, বামন সৃষ্টি হয়। বামনদের বুদ্ধি অবশ্য কম হয় না।

ল্যাক্‌টোজেনিক হর্‌মোন (Lactogenic hormone)—ইহা স্তন্য-গ্রন্থিকে দুগ্ধ-ক্ষরণে উদ্‌বুদ্ধ করে।

ডায়াবিটোজেনিক হর্‌মোন (Diabetogenic hormone)—ইহা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়।

গোনাডোট্রপিক হর্‌মোন (Gonadotropic hormone)—এই ধরনের হর্‌মোনের প্রভাবে গ্রাফিয়ান ফলিক্‌ল-এর স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। ইহা সেমিনিফেরাস টিউব্যুল এবং ইন্‌টার্‌স্টিশিয়াল কোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহার অভাবে গোনাড এবং আনুষঙ্গিক যৌন অঙ্গগুলি ক্ষয়িষ্ণু হইয়া যায়।

অ্যাড্‌রিনোকর্টিকোট্রপিক হর্‌মোন (Adrenocorticotropic hormone)—ইহা অ্যাড্‌রিনাল গ্রন্থির বৃদ্ধি ও ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে।

থাইরোট্রপিক হর্‌মোন (Thyrotropic hormone)—এই হর্‌মোন থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ও ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

বিভিন্ন হর্‌মোনের প্রকৃতি এবং উহাদের উৎপন্নকারী অনাল গ্রন্থিগুলির অবস্থান, গঠন ও উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন। তবু ইহারা দলবদ্ধভাবে এবং পিট্যুইটারি গ্রন্থি-নিঃসৃত হর্‌মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, দেহের যাবতীয় কাজের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ করে। হর্‌মোনগুলি সমবেতভাবে এবং স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দেহের বিভিন্ন কাজে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ করে।

হর্‌মোন যে প্রাণীর দেহে উৎপন্ন হয়, ইহার ক্রিয়াকলাপ শুধু সেই প্রাণীর দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যধরনের প্রাণীর, এমন কি উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করাইলে, ইহা ঐ সব জীবের বিপাককে প্রভাবিত করে। যেমন—অ্যাড্‌রি-নালিন কবচী প্রাণীদের দেহে এবং অক্সিন ইউগ্লিনা নামের এককোষী প্রাণীর দেহে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি কয়েক ধরনের প্রাণি-হর্‌মোন মূলের বৃদ্ধি ঘটায়।

কোষ-বিভাজন ও ইহার তাৎপর্য
(Cell-division and its significance)

3

একটিমাত্র কোষ হইতেই জীবের জীবনের শুরু হয়। এককোষী জীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় একটি পরিণত কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষ গঠন করে। পরিণত কোষকে **মাতৃ-কোষ (Mother-cell)** এবং উৎপন্ন কোষ দুইটিকে **অপত্য কোষ (Daughter cells)** বলা হয়। অপত্য কোষ ক্রমে আয়তনে বাড়িতে থাকে এবং যথাসময়ে একইভাবে অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। বহুকোষী জীবের যৌন জননের সময় দুই ধরনের দুইটি জনন-কোষ (Reproductive cells) মিলিত হইয়া **ভ্রূণাণু** বা **জাইগোট (Zygote)** গঠন করে। ভ্রূণাণু ক্রমাগত বিভক্ত হইতে থাকে এবং শেষে কোষগুলি কার্যগতভাবে আলাদা হইয়া **ভ্রূণ (Embryo)** এবং অবশেষে পূর্ণাঙ্গ জীব গঠন করে। এইভাবে ভ্রূণাণু হইতে পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে 10^{14}-সংখ্যক কোষ উৎপন্ন হয়। কাজেই, বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রেও একটি কোষ (ভ্রূণাণু) হইতে জীবনের সূত্রপাত হয়। **যে প্রক্রিয়ায় একটি কোষ হইতে দুইটি কোষ সৃষ্টি হয়, তাহাকে কোষ-বিভাজন (Cell-division) বলে।**

কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া, অধিকাংশ জীবে প্রধানতঃ দুই ধরনের কোষ-বিভাজন দেখা যায়। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর **দেহ-কোষ (Somatic cells)** যে পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়, তাহাকে **সোমাটিক কোষ-বিভাজন (Somatic cell-division)** বলে। জীবাণু এবং নীল-হরিৎ শেওলা ছাড়া সমস্ত উদ্ভিদে এবং প্রায় সব প্রাণীতে এই পদ্ধতিতে দেহ-কোষ বিভাজিত হয়। বহুকোষী উদ্ভিদের সমস্ত সজীব কোষ প্রয়োজনমতো বিভাজন করিতে পারিলেও, সাধারণতঃ উদ্ভিদ-দেহের কতকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলের কোষ ক্রমাগত বিভক্ত হয় ; যেমন—কাণ্ড ও মূলের শীর্ষের, মুকুলের এবং দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের পরিধিতে বৃদ্ধির সময় কাণ্ড ও মূলের কোষ বিভাজিত হয়। অন্যান্য অঞ্চলে ক্ষত সৃষ্টি হইলে, ঐ অঞ্চলের কোষেও সোমাটিক বিভাজন হয়। প্রাণীর ভ্রূণের পরিস্ফুরণ, বৃদ্ধি, ক্ষত-নিরাময় এবং নির্মোচনের সময় এই পদ্ধতিতে কোষ-বিভাজন হয়।

জনন-কোষ সৃষ্টির আগে কোষ-বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস যে পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়, তাহাকে **মা'য়োসিস (Meiosis)** বলা হয়। মস্, ফার্ন ইত্যাদি উদ্ভিদের স্পোর-সৃষ্টির সময়, সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগরেণু (Pollen

grain) ও ভ্রূণস্থলী (Embryo sac) উৎপত্তির সময়, এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির সময় প্রাণীর প্রাথমিক জনন-অঙ্গে অর্থাৎ গোনাডে মা'য়োসিস পদ্ধতিতে কোষ-বিভাজন হয়।

অল্প কিছু পার্থক্য ছাড়া, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কোষ-বিভাজন পদ্ধতি মোটা-মুটি একইরকম। বিভাজনের সময়, কোষের নিউক্লিয়াস আগে এবং সাইটো-প্লাজ্‌ম পরে বিভক্ত হয়। কোষ-বিভাজনে নিউক্লিয়াস প্রধান অংশ নেয় এবং কতকগুলি অবস্থার মধ্য দিয়া প্রথমে দুইটি নিউক্লিয়াসে ভাগ হয়। প্রত্যেকটি অবস্থাকে ফেজ (Phase) বলে। বিভিন্ন ফেজে নিউক্লিয়াস এবং উহার অন্তর্গত অংশগুলির আকৃতিগত, ভৌত ও রাসায়নিক জটিল পরিবর্তন ঘটে।

নিচে সংক্ষেপে সোমাটিক কোষ-বিভাজন এবং মা'য়োসিস আলোচনা করা হইল।

সোমাটিক কোষ-বিভাজন (Somatic cell-division)

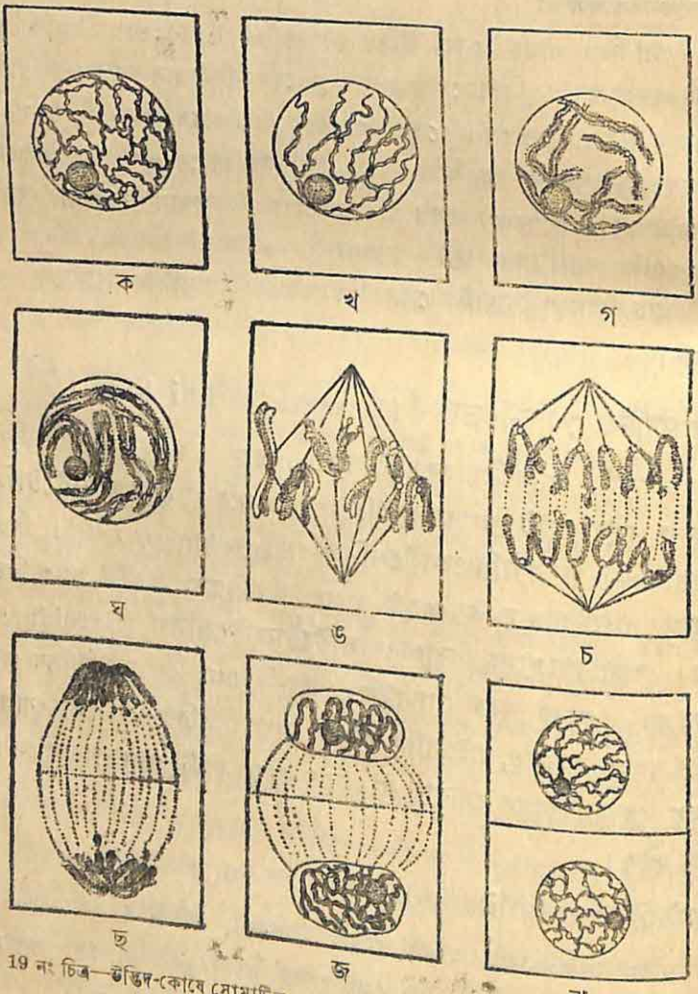
সোমাটিক কোষ-বিভাজন দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। ইহাকে **মাইটোসিস** (Mitosis) বা **ক্যারিওকাইনেসিস** (Karyokinesis) বলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সাইটোপ্লাজ্‌ম এক-একটি অপত্য নিউক্লিয়াস-সহ দুইটি অংশে বিভক্ত হয়। সাইটোপ্লাজ্‌মের বিভাজনকে **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis) বলা হয়। অনেক সময় সোমাটিক কোষ-বিভাজন এবং মাইটোসিস একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, মাইটোসিস বলিতে কেবল নিউক্লিয়াস-বিভাজন বোঝায়, সমগ্র কোষ-বিভাজন বোঝায় না। নিচে পর্যায় দুইটি পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

মাইটোসিস (Mitosis)

মাইটোসিস চারটি প্রধান ফেজে বিভক্ত। ফেজগুলি যথাক্রমে—(1) **প্রোফেজ** (Prophase), (2) **মেটাফেজ** (Metaphase), (3) **অ্যানা-ফেজ** (Anaphase) এবং (4) **টেলোফেজ** (Telophase)।

বিভাজনের ঠিক আগে নিউক্লিয়াসের অবস্থাকে **ইণ্টার্‌ফেজ** (Inter-phase) বলা হয়। ইণ্টার্‌ফেজ নিউক্লিয়াসে বিপাকের হার বাড়িয়া যায়। সেইজন্য, ইহাকে **মেটাবলিক নিউক্লিয়াস**(Metabolic nucleus)-ও বলা হয়। অতিরিক্ত জল-শোষণের ফলে, এই সময় নিউক্লিয়াসটি আয়তনে বাড়িয়া যায়। ইণ্টার্‌ফেজ নিউক্লিয়াসে স্পষ্ট **নিউক্লিয়ার মেম্‌ব্রেন** (Nuclear

membrane), নিউক্লিয়োলাস (Nucleolus) এবং জালিকার মতো ক্রোমাটিন রেটিকুলাম (Chromatin reticulum) থাকে (19 নং চিত্র-ক, 21 নং চিত্র ক)।



19 নং চিত্র—উদ্ভিদ-কোষে সোমাটিক কোষ-বিভাজন (মাইটোসিস ও সাইটোকাইনেসিস) : ক. ইন্টার্‌ফেজ নিউক্লিয়াস ; খ. হইতে ঘ. প্রোফেজ ; ঙ. মেটাফেজ ; চ. অ্যানাফেজ ; ছ. ও জ. টেলোফেজ ; ঝ. সাইটোকাইনেসিস।

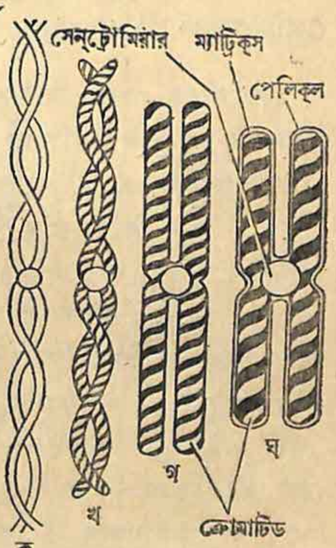
প্রোফেজ (Prophase)

প্রোফেজের শুরুতে নিউক্লিয়াসের নিরুদন (Dehydration) হইতে থাকে ; অর্থাৎ, জলের পরিমাণ কমিয়া যাইতে থাকে। রঙ করিলে,* এই সময়

* ক্রোমোজোম দেখিতে হইলে উহাদের বিশেষ পদ্ধতিতে রঙ করা প্রয়োজন।

নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতোর মতো সর্পিলাকার কতকগুলি বস্তু দেখা যায় (19 নং চিত্র-খ, 21 নং চিত্র-খ)। ইহাদের **ক্রোমোজোম** (**Chromosomes**) বলে। ক্রোমাটিন রেটিকুলাম হইতে ইহারা সৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের দুইটি করিয়া সূক্ষ্ম সুতোর মতো অংশ থাকে। ইহাদের নাম **ক্রোমাটিড** (**Chromatids**)। ক্রোমাটিড দুইটি একটিমাত্র নির্দিষ্ট বিন্দুতে পরস্পর যুক্ত থাকে। এই বিন্দুর নাম **সেন্‌ট্রোমিয়ার** (**Centromere**) বা **কাইনেটোকোর** (**Kinetochore**) (21 নং চিত্র-খ)। নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমে সেন্‌ট্রোমিয়ারের অবস্থানও নির্দিষ্ট। ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে; অর্থাৎ, একই কোষে একই আকৃতির ক্রোমোজোম দুইটি করিয়া থাকে। আবার, নির্দিষ্ট জীবের ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। যেমন—পিঁয়াজে 8 জোড়া, ভুট্টায় 10 জোড়া, তামাকে 24 জোড়া, মুরগিতে 9 জোড়া, ঘোড়ায় 30 জোড়া এবং মানুষে 23 জোড়া।

গোড়ার দিকে পরস্পর দড়ির মতো পাকানো থাকায় (20 নং চিত্র-ক), ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুইটি সহজে দেখা যায় না। ক্রমশঃ ইহারা পৃথকভাবে স্প্রিং-এর মতো প্যাচাইতে থাকে (20 নং চিত্র-খ)। ফলে ক্রোমাটিড তথা ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য কমিতে থাকে এবং পরোক্ষভাবে ইহারা আয়তনে বাড়ে। শুধু তাহাই নয়, ক্রমাগত প্যাচাইতে থাকায়, ক্রোমাটিড দুইটির মধ্যে টান পড়ায় ইহারা পরস্পর (সেন্‌ট্রোমিয়ার অংশ ছাড়া) পৃথক হইতে থাকে এবং শেষে দৈর্ঘ্য-বরাবর সমান্তরালভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে (20 নং চিত্র-গ)। ক্রোমোজোমের চারপাশে একরকম পদার্থ জমা হইয়া ক্রোমাটিড দুইটিকে ঢাকিয়া ফেলে। ইহাকে **ধাত্র**, **ম্যাট্রিক্স** (**Matrix**) বা **হায়ালোলেমা** (**Hyalolemma**) বলে। ধাত্র-সহ ক্রোমাটিড দুইটি একটি পাতলা পর্দা দিয়া ঢাকা থাকে। এই পর্দাকে **পেলিক্‌ল** (**Pellicle**) বলে (20 নং চিত্র-গ)।



20 নং চিত্র—ক হইতে খ প্রোফেজ ক্রোমোজোমের ক্রমিক পরিবর্তন (চিত্ররূপ)।

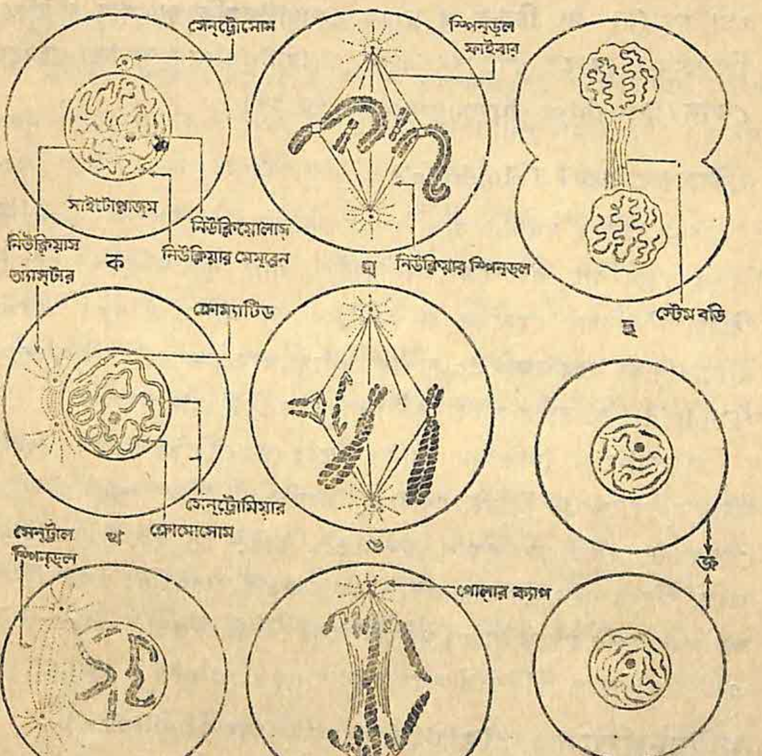
প্রাণি-কোষের প্রোফেজে **সেন্ট্রোজোম (Centrosome)** উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। ক্রোমোজোমের যখন এই সমস্ত পরিবর্তন হইতে থাকে, তখন নিউক্লিয়াসের বাহিরে অবস্থিত সেন্ট্রোজোম বিভক্ত হইয়া নূতন সেন্ট্রোজোম গঠন করে। নবজাত সেন্ট্রোজোম দুইটির প্রত্যেকটিকে ঘিরিয়া রশ্মির মতো বিন্যস্ত কতকগুলি সূক্ষ্ম তন্তুর আবির্ভাব হয়। ইহাদের **অ্যাস্ট্রাল রে'জ (Astral rays)** বলে। সেন্ট্রোজোম-সহ অ্যাস্ট্রাল রে'জকে **অ্যাস্টার (Aster)** বলা হয়। সেন্ট্রোজোম দুইটি পরস্পরের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। ফলে, উহাদের মধ্যবর্তী অংশ মাকু (Spindle)-র মতো দেখিতে হয়। ইহাকে **সেন্ট্রাল স্পিন্ড্ল (Central spindle)** বলে। ইহা ক্রমে বড় হইতে থাকে। প্রোফেজের শেষ পর্যায়ে নিউক্লিয়োলাস লুপ্ত হয় (21 নং চিত্র-গ)।

মেটাফেজ (Metaphase)

মেটাফেজের শুরুতে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন লুপ্ত হয়। তখন প্রাণি-কোষের নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্ল নিউক্লিয়াসের জায়গায় চলিয়া আসে এবং উহার চারদিকে নিউক্লিয়োপ্লাজ্ম জমিয়া, অপেক্ষাকৃত বড় আর একটি মাকুর মতো অংশ গঠন করে। ইহাকে **নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্ল (Nuclear spindle)** বা **বাই-পোলার স্পিন্ড্ল (Bipolar spindle)** বলে। উদ্ভিদের কোষে সেন্ট্রোজোম না থাকায়, সেন্ট্রাল স্পিন্ড্ল তৈয়ারি হয় না। নিউক্লিয়োপ্লাজ্ম-ই দুই-মেরু-যুক্ত নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্ল গঠন করে।

মেটাফেজে ক্রোমজোমগুলি নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্লের মাঝখানে বিন্যস্ত হয়। নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্লের মাঝখানের ব্যাস বেশি; ইহাকে **নিরক্ষীয় তল (Equatorial plane)** ধরা হয়। সাধারণতঃ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিরক্ষীয় তলে ক্রোমোজোমগুলি বিক্ষিপ্তভাবে এবং প্রাণি-কোষের ক্ষেত্রে অরীয়ভাবে বিন্যস্ত থাকে। এইভাবে ক্রোমোজোমগুলি নিরক্ষীয় তলে একটি পাত (Plate) সৃষ্টি করে। ইহাকে **নিরক্ষীয় পাত (Equatorial plate)** বা **মেটাফেজ প্লেট (Metaphase plate)** বলে। স্পিন্ড্লের দুই প্রান্ত—অর্থাৎ, মেরু-অঞ্চল হইতে অনেকগুলি সূতার মতো বস্তু আবির্ভূত হয়। ইহাদের **আকর্ষ-তন্তু (Tractile fibres)** বা **স্পিন্ড্ল ফাইবার (Spindle fibres)** বলে। তন্তুগুলি দুই ধরনের—কতকগুলি দুইটি মেরুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে এবং কতকগুলি মেরু হইতে বিষুব-অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। শেষোক্ত

তন্তুগুলিকে **ক্রোমোজোমিক ফাইবার** (Chromosomic fibres) বলা হয়। নিরক্ষীয় তলে ক্রোমজোমগুলি উভয় মেরু হইতে আগত ক্রোমোজোমিক ফাইবারের সঙ্গে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে জুড়িয়া যায়। এই সময়, সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী, ক্রোমোজোমগুলিকে V, L অথবা I-এর মতো দেখায়। মেটাফেজে ক্রোমোজোমগুলিকে বড় এবং স্পষ্ট দেখা



21 নং চিত্র—প্রাণি-কোষে সোমাটিক কোষ-বিভাজন (মাইটোসিস ও সাইটোকাইনেসিস) :
ক. ইন্টার্‌ফেজ নিউক্লিয়াস ; খ. ও গ. প্রোফেজ ; ঘ. মেটাফেজ ;
ঙ. ও চ. অ্যানাফেজ ; ছ. টেলোফেজ ; জ. অপত্য কোষ।

যায়। এইসময় ইহাদের গোনা সহজ। কাজেই, ক্রোমোজোমের গঠনগত বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা এবং সংখ্যা গণনা করার পক্ষে মেটাফেজ-ই প্রশস্ত সময়।

অ্যানাফেজ (Anaphase)

অ্যানাফেজের আরম্ভে সেন্ট্রোমিয়ার দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয় এবং ক্রোমাটিড দুইটি পরস্পর পৃথক হইতে থাকে। অপত্য সেন্ট্রোমিয়ার দুইটিও

পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে এবং নিরক্ষীয়-অঞ্চল হইতে মেরুর দিকে অগ্রসর হয় (19 নং চিত্র-চ, 21 নং চিত্র-ঙ)। সম্ভবতঃ ক্রোমোজোমিক ফাইবারের সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমাটিডগুলি ফাইবারের গা বাহিয়া মেরুর দিকে যায়। প্রাণি-কোষের ক্ষেত্রে অ্যানাফেজের শেষের দিকে নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্লের মধ্যবর্তী অংশ লম্বা হইয়া যায়। এই অংশকে **স্টেম-বডি (Stem body)** বলা হয় (21 নং চিত্র-চ ও ছ)। ক্রোমাটিডগুলি অবশেষে নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্লের মেরুতে পৌছায়। এখন ক্রোমাটিডগুলিকে **অপত্য ক্রোমোজোম (Daughter chromosomes)** বলা হয়।

টেলোফেজ (Telophase)

উভয় মেরুতে সমান-সংখ্যক অপত্য ক্রোমোজোম পৌছিলে, ক্রমশঃ ধাত্র বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং ক্রোমোজোমগুলির প্যাঁচ খুলিতে থাকে। ইহাদের ঘিরিয়া নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন ও নিউক্লিয়োলাস আবির্ভূত হয়। এইভাবে মাইটোসিসের ফলে একটি **2n**-সংখ্যক ক্রোমোজোম-যুক্ত অর্থাৎ **ডিপ্লয়েড (Diploid)** নিউক্লিয়াস হইতে দুইটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়।

মাইটোসিসের স্থিতিকাল বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। যেমন—জটাকান্শিরাতে 30 মিনিট, স্পাইরোগাইরাতে 45 মিনিট, স্তন্যপায়ী জীবের কোষে 60 মিনিট, কতকগুলি তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদে 78 হইতে 110 মিনিট। অবশ্য, জীবের বয়স, কোষের প্রকৃতি এবং উষ্ণতার তারতম্যের উপর এই সময় কম অথবা বেশি হইতে পারে। মাইটোসিসের বিভিন্ন ফেজগুলির মধ্যে প্রোফেজ এবং টেলোফেজের স্থিতিকাল সবচেয়ে বেশি।

মাইটোসিসের তাৎপর্য (Significance of mitosis)

মাইটোসিসের সাহায্যে বহুকোষী জীবের দৈহিক বৃদ্ধি হয়। এক্ষেত্রে মাতৃ-নিউক্লিয়াস এবং অপত্য নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম-সংখ্যা সবসময় সমান থাকে। ক্রোমোজোমের অন্তর্গত **জিন(Gene)**-গুলি জীবের বৈশিষ্ট্য ও বংশ-গতি গুণাগুণ বহন করে। মাইটোসিসের ক্ষেত্রে অপত্য ও মাতৃ-নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমে আঙ্গিক ও মাত্রিক কোনও পরিবর্তন না হওয়ায়, অপত্য নিউক্লিয়াসের গঠন ও গুণ হুবহু মাতৃ-নিউক্লিয়াসের মতো হয়। সেইজন্য, যে সমস্ত জীব কোষ-বিভাজনের সাহায্যে (যেমন—অ্যামিবা, ঈস্ট ইত্যাদি) অথবা অঙ্গজ জননের সাহায্যে (যেমন—আমরুল প্রভৃতি ব্রততী-শ্রেণীর উদ্ভিদ) বংশ-বিস্তার করে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তাহাদের ক্ষেত্রে বংশধর ও জনিতৃর

মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না। এই সমস্ত কারণে মাইটোসিসকে **সদৃশ বিভাজন(Equational division)**-ও বলা হয়।

মাইটোসিসে কোনও কারণে অসংলগ্নভাবে ক্রোমোজোমের বণ্টন হইলে, অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে না। ক্যান্সার (Cancer) অথবা টিউমার(Tumor)-গ্রস্ত কলায় অসংলগ্নভাবে মাইটোসিস হয়।

সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis)

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টেলোফেজের শেষাশেষি স্পিন্ড্লের নিরক্ষীয় তলে বিভিন্ন রকম কোষ-প্রাকার উপাদান বিন্দুর মতো পাশাপাশি জমিতে থাকে। ফলে, একটি পাতের মতো অংশ গঠিত হয় (19 নং চিত্র-ছ, জ)। ইহাকে **কোষভাগ-প্রাকার (Cell-plate)** বলে। ইহা পরিধি-বরাবর বাড়িতে থাকে এবং শেষে মাতৃ-কোষের প্রাকারের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইহার উপর ক্রমাগত সেলুলোজ, পেক্‌টিন ইত্যাদি জমিতে থাকায়, পাতটি পুরু হইতে থাকে। এইভাবে নূতন **কোষ-প্রাকার (Cell wall)** গঠিত হয়। ফলে, মাতৃ-কোষের সাইটোপ্লাজ্‌ম দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হইয়া, এক-একটি নিউক্লিয়াস-সহ দুইটি অপত্য কোষ গঠন করে।

প্রাণি-কোষে টেলোফেজের শেষের দিকে, নিরক্ষীয় তল-বরাবর সাইটোপ্লাজ্‌মে একটি খাঁজ সৃষ্টি হয় (21 নং চিত্র-ছ)। ঐ খাঁজ ক্রমেই গভীর হইতে থাকে এবং অবশেষে ঐ অঞ্চল দিয়া কোষটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। অপত্য কোষ দুইটির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া অপত্য নিউক্লিয়াস থাকে।

মা'য়োসিস (Meiosis)

মা'য়োসিসে নিউক্লিয়াস পর পর দুইবার (বিরতি ছাড়া) বিভক্ত হয়। প্রথম বিভাজনের ফলে উৎপন্ন অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দেহ-কোষের ক্রোমোজোমের তুলনায় অর্ধেক হইয়া যায়; অর্থাৎ, দেহ-কোষে যদি আট জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, তবে উৎপন্ন অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটির প্রত্যেকটিতে (প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোম হইতে একটি করিয়া মোট) আটটি ক্রোমোজোম থাকিবে। সেইজন্য প্রথম বিভাজনটিকে **হ্রাস-বিভাজন (Reduction division)** বলে। দ্বিতীয় বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস দুইটির প্রত্যেকটি কেবল মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়। কাজেই, এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিভাজনটি সদৃশ বিভাজন।

প্রথম মা'য়োটিক বিভাজন (First meiotic division)

মাইটোসিসের মতো এক্ষেত্রেও চারটি ফেজ দেখা যায়। নিচে ফেজগুলি আলোচনা করা হইল।

প্রথম প্রোফেজ (First prophase)

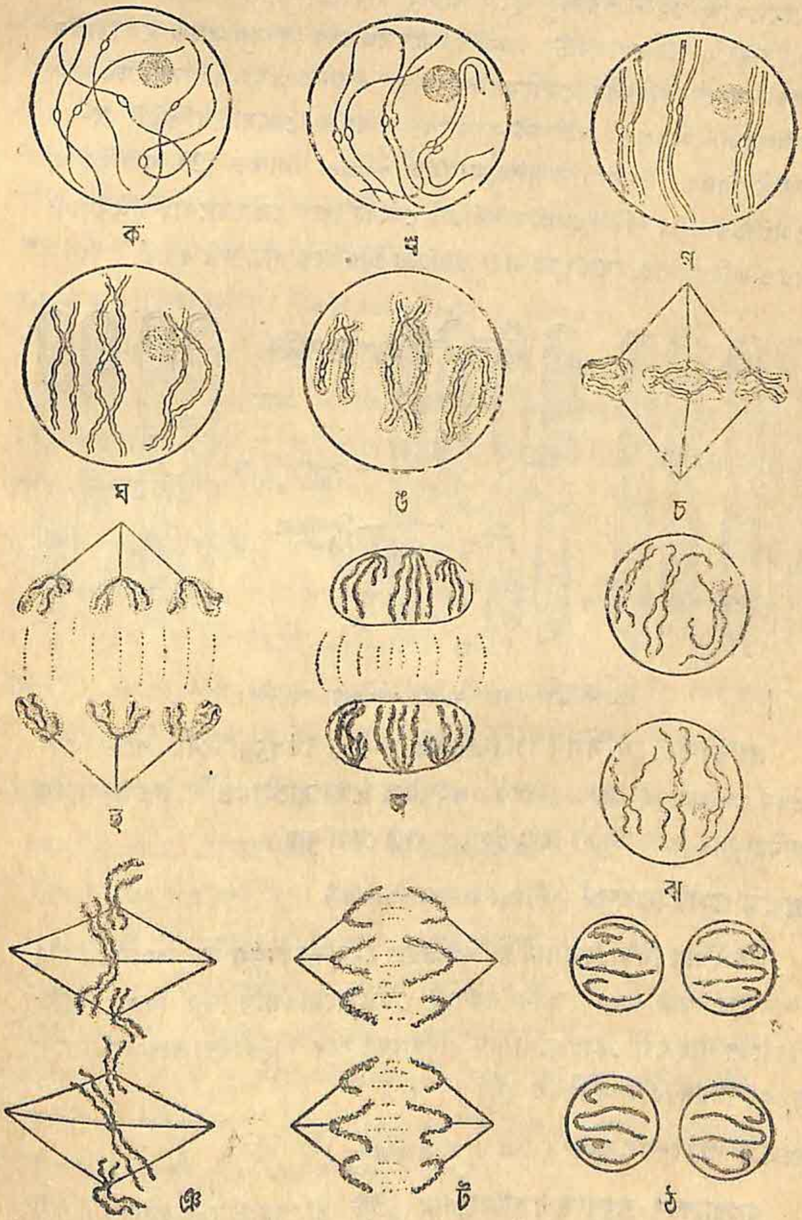
এই দশার স্থিতিকাল সবচেয়ে বেশি এবং এইসময় ধাপে ধাপে নিউ-ক্লিয়াসের মধ্যে নানারকম জটিল পরিবর্তন হয়। সেইজন্য প্রোফেজকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। নিচে এই পর্যায়গুলিতে নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোমের ক্রমিক পরিবর্তন বর্ণনা করা হইল।

লেপ্‌টোটিন (Leptotene)—ইহা প্রোফেজের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে যথারীতি ক্রোমাটিন রেটিকুলাম হইতে ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়। ক্রোমোজোমগুলি সরু ও লম্বা সুতার মতো। নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেনের মধ্যে ইহাদের স্পষ্ট এবং জট-পাকানো অবস্থায় দেখা যায় (22 নং চিত্র-ক)। বলা বাহুল্য, এই সময়ে নিউক্লিয়াসে ডিপ্‌লয়েড-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

জাইগোটিন (Zygotene)—ইহা লেপ্‌টোটিনের পরের পর্যায়। আগে বলা হইয়াছে (39 পৃষ্ঠা, এক এক জোড়া ক্রোমোজোমে একইরকম দেখিতে দুইটি করিয়া ক্রোমোজোম থাকে। ইহাদের **সমসংস্থ ক্রোমোজোম** (Homologous chromosomes) বলে। জাইগোটিন পর্যায়ে সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি কাছাকাছি চলিয়া আসে এবং দৈর্ঘ্য-বরাবর পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে (22 নং চিত্র-খ)। সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির এইরকম পাশাপাশি অবস্থান করাকে **সিন্যাপ্‌সিস** (Synapsis) বলা হয়। এইভাবে উৎপন্ন এক এক জোড়া ক্রোমোজোমকে **বাইভ্যালেন্ট** (Bivalents) বলে।

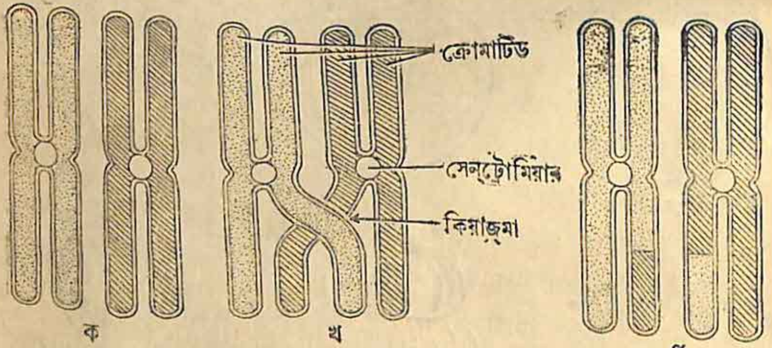
প্যাকীটিন (Pachytene)—এই পর্যায়ে বাইভ্যালেন্টের প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিডে ভাগ হইয়া যায়; কিন্তু ইহাদের সেনট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না। ফলে, এক-একটি বাইভ্যালেন্ট হইতে (একটি ক্রোমোজোমের দুইটি, করিয়া মোট) চারটি ক্রোমাটিড উৎপন্ন হয়। একটি বাইভ্যালেন্টের (দুইটি ক্রোমোজোমের) চারটি ক্রোমাটিডকে **টেট্রাড** (Tetrads) বলা হয় (22 নং চিত্র-গ)। প্যাকীটিন পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলি দৈর্ঘ্যে কমিতে থাকে এবং মোটা হইতে থাকে।

ডিপ্‌লোটিন (Diplotene)—টেট্রাড সৃষ্টি হওয়ার পর বাইভ্যালেন্টের



22 নং চিত্র—মা'য়োসিস : ক. লেপ্‌টোটিন ; খ. জাইগোটিন ; গ. প্যাকীটিন ; ঘ. ডিপ্‌লোটিন ; ঙ. ডা'য়াকাইনেসিস ; চ. প্রথম মেটাফেজ ; ছ. প্রথম অ্যানাফেজ ; জ. প্রথম টেলোফেজ ; ঝ. দ্বিতীয় প্রোফেজ ; ঞ. দ্বিতীয় মেটাফেজ ; ট. দ্বিতীয় অ্যানাফেজ ; ঠ. দ্বিতীয় টেলোফেজ।

ক্রোমোজোম দুইটি পরস্পর দূরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। এইসময়ে দেখা যায় যে, বাইভ্যালেন্টের একটি ক্রোমোজোমের কোনও একটি ক্রোমাটিড বাইভ্যালেন্টের দ্বিতীয় ক্রোমোজোমের যে-কোনও একটি ক্রোমাটিডের সঙ্গে আট্‌কাইয়া আছে। এই জট-পাকানো জায়গায় ক্রোমাটিড দুইটি X-এর মতো দেখায়। ইহাকে **কিয়াজ্‌মা (Chiasma)** বলা হয় (23 নং চিত্র খ, 22 নং চিত্র-ঘ)। ডিপ্‌লোটিন পর্যায়ের শেষের দিকে ক্রোমোজোমগুলি দৈর্ঘ্যে আরও কমিয়া যায়, মোটা হয় এবং উহাদের চারদিকে ধাত্র সৃষ্টি হয়।



23 নং চিত্র—কিয়াজ্‌মা-সৃষ্টি এবং উহার ফলাফল।

ডা'য়াকাইনেসিস (Diakinesis)—ইহা ডিপ্‌লোটিনের পরের এবং প্রথম প্রোফেজের শেষ পর্যায়। এইসময়ে ক্রোমোজোমগুলি দৈর্ঘ্যে আরও কমিয়া যায় ও মোটা হয় এবং ইহাদের স্পষ্ট দেখা যায়।

প্রথম মেটাফেজ (First metaphase)

এই দশায় নিউক্লিয়োলাস ও নিউক্লিয়ার মেম্‌ব্রেন বিলুপ্ত হয় এবং নিউক্লিয়ার স্পিন্‌ড্‌ল সৃষ্টি হয়। তখন সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি নিজ নিজ সেন্ট্রো-মিয়ারের সাহায্যে ক্রোমোজোমিক ফাইবারের সঙ্গে আট্‌কাইয়া যায় এবং স্পিন্-ড্‌লের নিরক্ষীয় তলে বিন্যস্ত হয়।

প্রথম অ্যানাফেজ (First anaphase)

অ্যানাফেজে সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুইটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরক্ষীয় তল হইতে মেরুর দিকে অভিসারীভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন কিয়াজ্‌মা-সৃষ্টিকারী ক্রোমাটিড দুইটি একই তলে ভাঙিয়া যায় এবং একটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড অপর ক্রোমোজোমের ভাঙা ক্রোমাটিডটির সঙ্গে

জুড়িয়া যায়। তেমনিভাবে, দ্বিতীয় ক্রোমোজোমের ক্রোমোটিড প্রথম ক্রোমোজোমের ভাঙা ক্রোমাটিডটির সঙ্গে জুড়িয়া যায়। ফলে, প্রতিটি ক্রোমোজোমের **একটি** ক্রোমাটিডের কিছু পুরানো অংশের বিনিময়ে নূতন অংশ পায় (23 নং চিত্র-গ)। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষণীয় যে, মাইটোসিসের অ্যানাফেজের মতো এই দশায় সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না। জাইগোটিন পর্যায়ে সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুইটি পাশাপাশি আসিয়াছিল। তাহারাই (অল্প পরিবর্তন-সহ) পরস্পর দূরে চলিয়া যায়।

প্রথম টেলোফেজ (First telophase)

ইহা মোটামুটিভাবে মাইটোসিসের টেলোফেজের মতো ; অর্থাৎ, ক্রোমোজোমগুলি মেরুতে পৌছিলে নিউক্লিয়োলাস এবং নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন সৃষ্টি হয়। এইভাবে প্রথম মা'য়োটিক বিভাজনের শেষে দুইটি n-সংখ্যক ক্রোমোজোম-যুক্ত অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়।

সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis)

প্রথম টেলোফেজের পর কতকগুলি ক্ষেত্রে মাইটোসিসের মতো সাইটোকাইনেসিস হয় এবং সম্পূর্ণভাবে দুইটি কোষ গঠিত হইলে, দ্বিতীয় বিভাজন শুরু হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, টেলোফেজের ঠিক পরেই দ্বিতীয় বিভাজন শুরু হইয়া যায়। কাজেই, প্রথম বিভাজনের শেষে সাইটোকাইনেসিস হয় না।

দ্বিতীয় মা'য়োটিক বিভাজন (Second meiotic division)

যেখানে প্রথম টেলোফেজের পর সাইটোকাইনেসিস হয়, সেক্ষেত্রে মাইটোসিসের মতো প্রোফেজ দশা হইতে দ্বিতীয় মা'য়োটিক বিভাজন শুরু হয়। এক্ষেত্রে, অবশ্য প্রোফেজের স্থিতিকাল মাইটোসিসের চেয়ে কম। অনেক সময় প্রথম বিভাজনের টেলোফেজে ক্রোমোজোমগুলি মেরুতে পৌছিলে, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বিভাজন আরম্ভ হয়। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাজনের শুরুতে প্রোফেজ দশা থাকে না, সরাসরি **দ্বিতীয় মেটাফেজ** শুরু হয় ; অর্থাৎ, নিউক্লিয়োলাস ও নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন বিলুপ্ত হয়, নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্‌ল তৈয়ারি হয় এবং ক্রোমোজোমগুলি নিরক্ষীয় তলে বিন্যস্ত হয়।

দ্বিতীয় অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ মাইটোসিসের মতো। **দ্বিতীয় অ্যানাফেজের** সূচনায় যথারীতি সেন্ট্রোমিয়ার দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং **দ্বিতীয় টেলোফেজের** পর সাইটোকাইনেসিস হয়। কাজেই, সমগ্র মা'য়োসিস প্রক্রিয়ায় ডিপ্‌লয়েড (2n-সংখ্যক ক্রোমোজোম-যুক্ত) নিউক্লিয়াস

হইতে মোট চারটি **হ্যাপ্লয়েড** (Haploid) অর্থাৎ n-সংখ্যক ক্রোমোজোম-যুক্ত নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। লক্ষণীয় যে, মা'য়োসিসে নিউক্লিয়াস দুইবার বিভক্ত হইলেও ক্রোমোজোমগুলি মাত্র একবার (দ্বিতীয় মা'য়োটিক বিভাজনের সময়) বিভাজিত হয়।

মা'য়োসিসের তাৎপর্য (Significance of meiosis)

যে সমস্ত জীব যৌন পদ্ধতিতে জনন ও বংশবৃদ্ধি করে, তাহাদের জীবনের কোনও-না-কোনও সময় মা'য়োসিস হয়। আগেই আলোচনা করা হইয়াছে, যৌন জননের ফলে দুইটি জনন-কোষ (পুং- এবং স্ত্রী-) মিলিত হইয়া জাইগোট গঠন করে এবং জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া শেষে পূর্ণাঙ্গ জীব গঠন করে। জনন-কোষগুলি ডিপ্লয়েড হইলে, জীবদেহে বংশ পরম্পরায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা—4n, 8n, 16n,···এই হারে অর্থাৎ গুণোত্তর শ্রেণী (Geometrical series)-তে ক্রমেই বাড়িয়া যাইত। কিন্তু মা'য়োসিস হওয়ায়, এইরকম হইতে পারে না। সুতরাং, ক্রোমোজোমের সংখ্যা এবং বংশগতি উপাদানের মাত্রা ও সমতা বজায় রাখার জন্য মা'য়োসিস অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, সমস্ত বহুকোষী জীবের জীবন-চক্রে মা'য়োসিস এবং মাইটোসিস চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

মা'য়োসিসের ফলে সৃষ্ট চারটি কোষের ক্রোমোজোমের গঠন এবং গুণাগুণ হুবহু মাতৃ-কোষের মতো হয় না—কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকে। ইহা বংশগতির পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্থক্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবের অভিব্যক্তি (Evolution)-তে সাহায্য করে।

———

4

বৃদ্ধি ও জনন
(Growth and Reproduction)

বৃদ্ধি (Growth) অর্থাৎ দেহের আয়তন স্থায়িভাবে বাড়িয়া যাওয়া সমস্ত জীবের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। জীবনের শুরু হইতে জীবের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। বৃদ্ধির ফলে ক্রমে দৈহিক পূর্ণতা আসে। জীবনের শেষভাগে জীব জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে জীবের মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুতে জীবনের গতি ব্যাহত হয় না। মৃত্যুর আগে, দৈহিক পূর্ণতা লাভের পর, জীব নিজের মতো জীব সৃষ্টি করে। ইহাই **জনন (Reproduction)**। জনন-ও জীবের আর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। জননের দ্বারাই জীবনের ধারা অব্যাহত থাকে। যদিও বৃদ্ধির ফলে নূতন জীব সৃষ্টি হয় না, তবু জননের সঙ্গে বৃদ্ধি ও **পরিস্ফুরণ (Development)**-এর সম্পর্ক নিগূঢ়। এই পরিচ্ছেদে জীবের বৃদ্ধি ও জনন সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইল।

বৃদ্ধি (Growth)

যে প্রক্রিয়ায় জীবের আয়তন ও শুষ্ক ওজন (Dry weight)* স্থায়িভাবে বাড়িয়া যায়, তাহাকে বৃদ্ধি (Growth) বলা হয়। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধি প্রোটোপ্লাজমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এককোষী জীবের বৃদ্ধিতে কোষটি ক্রমে আয়তনে বাড়িতে থাকে। অবশেষে কোষটি চরম আয়তনে পৌছিলে, উহা বিভাজিত হয়। বহুকোষী জীবের বৃদ্ধির সময় বার বার কোষের বিভাজন হয় এবং অপত্য কোষগুলি আয়তনে বাড়িতে থাকে। এই-ধরনের জীবের বৃদ্ধিতে আর একটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে, অপত্য কোষগুলি নানাভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া পেশী-কোষ, নার্ভ-কোষ, গ্রন্থি-কোষ প্রভৃতি নানাধরনের কলার-কোষ সৃষ্টি করে। বৃদ্ধির এই পর্যায়কে **পরিস্ফুরণ (Development)** বলা হয়। পরবর্তী আলোচনায় বৃদ্ধি বলিতে কোষ-বিভাজন, কোষের আয়তনে বাড়িয়া যাওয়া এবং পরিস্ফুরণ—এই তিনটি পর্যায়কে মিলিতভাবে ধরা হইয়াছে।

* সদ্যমৃত জীবকে 24 ঘণ্টা 75° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখার পর যে ওজন পাওয়া যায়, তাহাকে জীবের শুষ্ক ওজন বলে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি (Growth in plants)

উন্নতধরনের উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা যায়—(ক) ভ্রূণের বৃদ্ধি অর্থাৎ **পরিস্ফুরণ**, (খ) **অঙ্কুরোদ্গম** (Germination) এবং (গ) **শিশু-উদ্ভিদের বৃদ্ধি**। নিষিক্ত ডিম্বাণু (Fertilised ovum) বা **জাইগোট** (Zygote) নামের একটিমাত্র কোষ দিয়া বহুকোষী উদ্ভিদের জীবনের আরম্ভ হয়। জাইগোট মাইটোসিস পদ্ধতিতে বার বার বিভাজিত হইয়া 2, 4, 8, 16, 32,......এইভাবে অনেকগুলি কোষ উৎপন্ন করে। এই কোষগুলি এক বিশেষ রীতিতে বিন্যস্ত হইয়া অবশেষে **ভ্রূণ** (**Embryo**) তৈয়ারি করে। ভ্রূণের দুইটি অংশ—ভ্রূণাক্ষ (Axis of the embryo) এবং একটি অথবা দুইটি বীজপত্র (Cotyledons)। ভ্রূণ সৃষ্টি হয় বীজের মধ্যে। বৃদ্ধির এই ধাপে ভ্রূণ জনিতৃ-উদ্ভিদ হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে।

ভ্রূন সৃষ্টি হওয়ার পর কিছুদিন ভ্রূণের আর বৃদ্ধি হয় না। ইহা ভ্রূণের **সুপ্ত অবস্থা** (**Dormancy**)। ভ্রূণে জিব্রালিনের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে (27 পৃষ্ঠা), সুপ্ত অবস্থা শেষ হয় এবং ভ্রূণের দ্বিতীয় ধাপের বৃদ্ধির সূচনা হয়। ইহাকে বলা হয় **অঙ্কুরোদ্গম** (**Germination**)। বৃদ্ধির এই দ্বিতীয় ধাপে, অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্গমের সময়, ভ্রূণমূল (Radicle) এবং ভ্রূণমুকুল (Plumule) খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে এবং প্রথমে ভ্রূণমূল ও পরে ভ্রূণমুকুল বীজ হইতে বাহির হইয়া আসে। এই সময় ভ্রূণ সস্য (Endosperm), পরিভ্রূণ (Perisperm) অথবা বীজপত্রে সঞ্চিত খাদ্যের সাহায্যে পুষ্ট হয়। পরে ভ্রূণমূল মাটিতে প্রবেশ করিলে, ভ্রূণমূলের সাহায্যে মাটি হইতে খাদ্যের রসদ গৃহীত হয়। তখন উদ্ভিদকে শিশু-উদ্ভিদ বা **চারা** (**Seedling**) বলা হয়। নিচের কয়েকটি অনুচ্ছেদে শিশু-উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

বৃদ্ধির দশা (Phases of growth)

শিশু-উদ্ভিদের প্রাথমিক বৃদ্ধির তিনটি দশা—(ক) **সৃষ্টির দশা** (**Phase of formation**), (খ) **দীর্ঘীকরণ দশা** (**Phase of elongation**), (গ) **পরিণতির দশা** (**Phase of maturation**)। সৃষ্টির দশায় উদ্ভিদের বর্ধমান অঞ্চলের ভাজক কলার কোষগুলি দ্রুতহারে বিভাজিত হইয়া অসংখ্য অপত্য কোষ উৎপন্ন করে। অগ্রস্থ ভাজক কলার কোষের বিভাজনে উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে বাড়ে এবং পার্শ্বস্থ ভাজক কলার কোষের বিভাজনে উদ্ভিদ প্রস্থে বাড়ে।

দীর্ঘীকরণ দশায় নবজাত কোষগুলি আকারে বড় হয়। পরিণতির দশায় কোষগুলি নানারকম কাজের জন্য নানাভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া নানাধরনের কলা ও কলাতন্ত্র গঠন করে। এইসময়ে কোষের প্রাকারে নানা-ধরনের কোষ-প্রাকার উপাদান (যেমন—সেলুলোজ, লিগ্নিন প্রভৃতি) জমা হইয়া কোষ-প্রাকার পুরু হয়। কোষ-প্রাকার পুরু হয় দুইভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে কোষ-প্রাকারের উপাদানগুলির কণা পুরানো কোষ-প্রাকারের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। ইহাকে **পৃষ্ঠবৃদ্ধি (Intussusception)** বলা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ **স্থূলত্ব-বৃদ্ধি(Apposition)**-তে কোষ-প্রাকার উপাদানগুলি প্রাথমিক কোষ-প্রাকারের ভিতরের তলে স্তরে স্তরে জমা হয়।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধির পর **গৌণ বৃদ্ধি(Secondary growth)**-ও হয়। বৃদ্ধির এই দ্বিতীয় পর্যায়ে কাণ্ড ও মূলে অবস্থিত **ক্যাম্বিয়াম (Cambium)** নামের গৌণ ভাজক কলার কোষগুলি বিভাজিত হইয়া উদ্ভিদের প্রস্থ বৃদ্ধি করে।

উপরে উদ্ভিদের যে দুইটি পর্যায়ের কথা বলা হইল, তাহাতে উদ্ভিদের কেবল **অঙ্গজ বৃদ্ধি (Vegetative growth)** বা **দৈহিক বৃদ্ধি (Somatic growth)** হয়। বৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে উদ্ভিদের **জননগত বৃদ্ধি (Reproductive growth)** হয়। এইসময় উদ্ভিদের পুষ্পমুকুল, পুষ্প, ফল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের আমৃত্যু কম-বেশি অঙ্গজ বৃদ্ধি হয়। জননগত বৃদ্ধি সাময়িক, অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ।

বৃদ্ধির হার (Rate of growth)

দেখা গিয়াছে যে, অঙ্কুরোদ্গমের পর বৃদ্ধির হার খুব অল্প থাকে। কিন্তু ক্রমেই উহা বাড়িয়া সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়। ইহার পর বৃদ্ধির হার আবার কমিতে থাকে এবং শেষে বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। অঙ্কুরোদ্গমের পর হইতে বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়া পর্যন্ত সময়ে যে বৃদ্ধি হয়, তাহাকে বিজ্ঞানী **স্যাক্স**(Sachs)-এর মত অনুসারে, **মুখ্য বৃদ্ধিকাল (Grand period of growth)** বলা হয়।

বৃদ্ধির শর্ত (Conditions for growth)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করে। এই শর্তগুলির কয়েকটি আভ্যন্তরীণ (Internal), অন্যগুলি বাহ্য (External)। জল এবং হর্মোন ও কয়েক ধরনের ভাইটামিন বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য আভ্যন্তরীণ শর্ত। বৃদ্ধির জন্য

কোষের রসস্ফীতি হওয়া প্রয়োজন। রসস্ফীতির জন্য জল দরকার। ইহা ছাড়া, বৃদ্ধির সময় বর্ধিত হারে বিপাকের জন্য, এবং বর্ধমান অঞ্চলে খাদ্যের রসদ পরিবহন ও উৎপন্ন খাদ্যের সংবহনের জন্যও জল প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা আলোচনা করা হইয়াছে। বৃদ্ধির সময় যে বিভিন্ন বিপাকীয় বিক্রিয়া হয়, তাহাতে নানারকম উৎসেচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

সূর্যালোক, উষ্ণতা, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, আর্দ্রতা, বায়ু-প্রবাহ প্রভৃতি **আন্তরীক্ষ শর্ত (Climatic conditions)**, এবং মাটির আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা, বায়ু-চলাচলের সুবিধা, মাটিতে খাদ্যের পরিমাণ ইত্যাদি **ভৌম শর্ত (Edaphic conditions)**—এই দুই ধরনের বাহ্য শর্ত সরাসরি উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। টম্যাটো, সূর্যমুখী প্রভৃতি **আলোকবিলাসী (Photo-philic)** উদ্ভিদ সরাসরি সূর্যের আলো না পাইলে ভালভাবে বাড়িতে পারে না। আবার মস, ফার্ন, কচু প্রভৃতি **আলোকবিমুখী (Photophobic)** উদ্ভিদ ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় ভালভাবে বাড়ে।

গোলাপ, হুড়হুড়ে ইত্যাদি **আলোক-নিরপেক্ষ (Photoneutral)** উদ্ভিদ, অবশ্য, আলোকিত এবং ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় সমানভাবে বাড়ে। তীব্র আলোক এবং নীল ও লাল রঙের আলোক উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

আলোকের স্থিতিকালের তারতম্যের উপরে কয়েক ধরনের উদ্ভিদের জননগত বৃদ্ধি নির্ভর করে। দেখা গিয়াছে যে, 25° হইতে 35° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। সাধারণতঃ 4° সেন্টি-গ্রেডের কম এবং 50° সেন্টিগ্রেডের বেশি উষ্ণতায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না। বৃদ্ধির সময় বর্ধিত হারে সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন প্রয়োজন। অবশ্য, খুব বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। বায়ুর আর্দ্রতা এবং বায়ু-প্রবাহের গতি বাড়িয়া গেলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। যে মাটিতে জল ও খনিজ পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে ও ভালভাবে বায়ু-চলাচল করে এবং যে মাটির উষ্ণতা মাঝামাঝি ধরনের, সেইরকম মাটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে ভালো।

প্রাণীর বৃদ্ধি (Growth in animals)

উদ্ভিদের মতো, প্রাণীদের বৃদ্ধিতেও তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়—কোষ-বিভাজন, কোষ বড় হওয়া এবং পরিস্ফুরণ অর্থাৎ কাজের প্রকৃতি

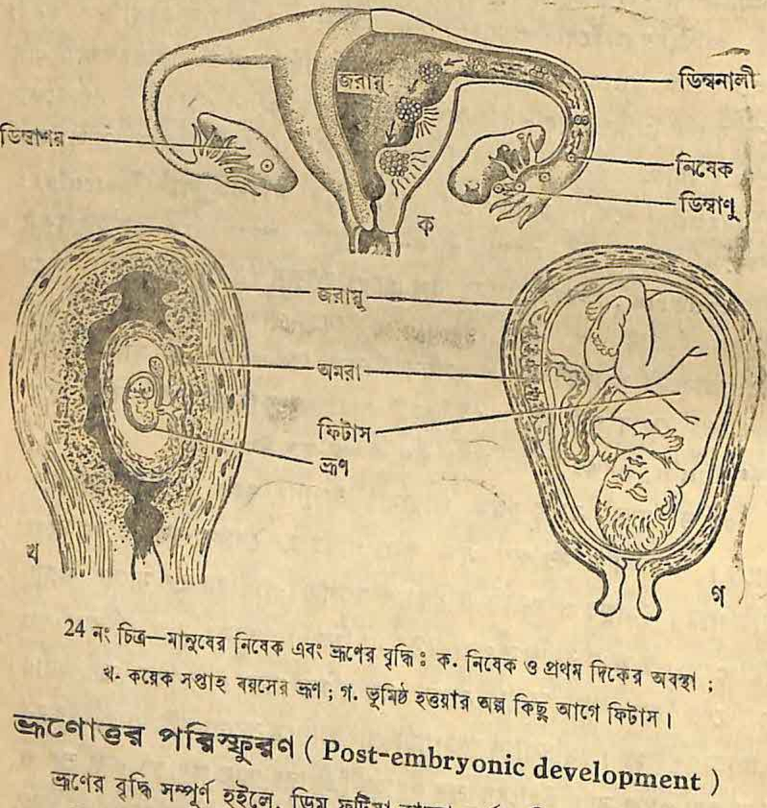
অনুযায়ী কোষগুলির নানাভাবে পরিবর্তিত হওয়া। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির এই তিনটি পর্যায়কে একসঙ্গে যেমন বৃদ্ধি বলা হয়, তেমনি প্রাণীর ক্ষেত্রে বৃদ্ধির এই পর্যায় তিনটিকে মিলিতভাবে সচরাচর পরিস্ফুরণ বলা হয়। প্রাণীদের পরিস্ফুরণে দুইটি প্রধান ধাপ লক্ষ্য করা যায়—ভ্রূণের পরিস্ফুরণ এবং ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ।

ভ্রূণের পরিস্ফুরণ (Embryonic Development)

প্রাণীদের জাইগোট-ও মাইটোসিস পদ্ধতিতে বার বার বিভাজিত হইয়া অনেকগুলি কোষ সৃষ্টি করে। উভচর, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই কোষগুলি মিলিতভাবে একটি ফাঁপা গোলক গঠন করে—কোষগুলি গোলকের পরিধি-বরাবর একটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। এই অবস্থাকে ব্লাস্টুলা (Blastula) বলে। ইহার পরের অবস্থার নাম গ্যাস্ট্রুলা (Gastrula)। ইহাতে দুইটি স্তর কোষ থাকে—বাহিরের স্তরের নাম **এক্টোডার্ম** (Ectoderm , ভিতরের স্তরের নাম **এণ্ডোডার্ম** (Endoderm)। ক্রমে (ছিদ্রাল প্রাণী ও একনালীদেহী প্রাণীদের ক্ষেত্র ছাড়া) এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্মের মধ্যবর্তী অঞ্চলে **মেসোডার্ম** (Mesoderm) নামে তৃতীয় এক স্তর কোষ সৃষ্টি হয়। এই তিনটি প্রাথমিক কোষ-স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে ভ্রূণ(Embryo)-এর বিভিন্ন কলা, অঙ্গ ও অঙ্গ-তন্ত্র উৎপন্ন হয়।

হাইড্রা, মাছ, সাগর-কুসুম, তারামাছ ইত্যাদি জলজ প্রাণীর ভ্রূণ জলে বাড়ে। অধিকাংশ সরীসৃপ এবং সমস্ত পাখীর ভ্রূণ খোলক-যুক্ত ডিমের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। মানুষ ও অন্যান্য অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভ্রূণ মায়ের জরায়ু (Uterus)-র মধ্যে বাড়িতে থাকে (24 নং চিত্র)। অনেক মাছ, সরীসৃপ এবং পাখিদের ডিমে কুসুম (Yolk) নামের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বর্ধমান ভ্রূণ ইহার সাহায্যে পুষ্ট হয়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিমে ভ্রূণের পুষ্টির জন্য এইরকম খাদ্য জমা থাকে না। ইহাদের ভ্রূণ জরায়ুর ভিতরের তলে অবস্থিত এবং ভ্রূণ ও জরায়ুর কলা দিয়া গঠিত **অমরা**(Placenta)-র মাধ্যমে মায়ের রক্তে দ্রবীভূত খাদ্যের সাহায্যে পুষ্ট হয়। ভ্রূণের দেহে উৎপন্ন রেচন-পদার্থ-ও অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্তে চলিয়া যায় (24 নং চিত্র-খ, গ)। স্তন্যপায়ী প্রাণীর গর্ভাবস্থার যে সময়ে ভ্রূণকে স্তন্যপায়ীর ভ্রূণ বলিয়া চেনা যায়, তখন হইতে ঐ ভ্রূণকে **গর্ভস্থ শিশু** বা **ফিটাস** (Foetus) বলা হয়। দুই মাস বয়সের পর হইতেই মানব-ভ্রূণকে ফিটাস বলা যায়। বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ অথবা ফিটাসের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইতে বিভিন্ন সময় লাগে। এই সময়কে পাখিদের ক্ষেত্রে বলা হয় **তা' দেওয়ার সময়** (Period of incubation) এবং স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে বলা

য়ে গর্ভধারণ কাল (Period of gestation)। কয়েকটি পাখির তা দেওয়ার সময় এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর গর্ভধারণ কাল (দিন হিসাবে) এইরকম—মুরগি—21, হাঁস—28, নেংটি ইঁদুর—19, ইঁদুর—22, কুকুর—63, শুয়ার—114, ছাগল—148, বানর—160, মানুষ—267, ঘোড়া—336, হাতি—600।

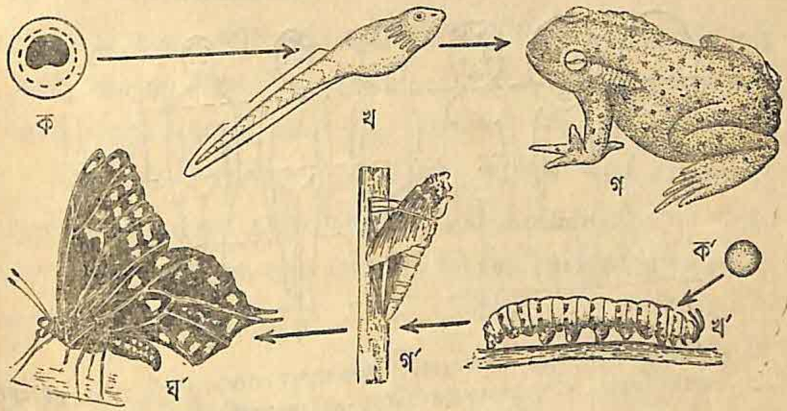


24 নং চিত্র—মানুষের নিষেক এবং ভ্রূণের বৃদ্ধি : ক. নিষেক ও প্রথম দিকের অবস্থা ; খ. কয়েক সপ্তাহ বয়সের ভ্রূণ ; গ. ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্প কিছু আগে ফিটাস।

ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ (Post-embryonic development)

ভ্রূণের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে, ডিম ফুটিয়া বাচ্চা অর্থাৎ শিশু-প্রাণী বাহির হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ফিটাসের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে, মা বাচ্চা প্রসব করে। সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং উন্নতধরনের আরও অনেক প্রাণীর বাচ্চা আকারে ছোট হইলেও, দেখিতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো। এইরকম, যে ধরনের পরিস্ফুরণে আকারে ছোট কিন্তু দেখিতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো শিশু-প্রাণী সরাসরি ভ্রূণ (অথবা ফিটাস) হইতে বাহির হয়, তাহাকে **প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ**(Direct development) বলা হয়। ব্যাঙ, ঝিনুক, মশা, মৌমাছি, প্রজাপতি, মথ প্রভৃতি অনেক প্রাণীর ভ্রূণ হইতে যে বাচ্চা বাহির হয়, তাহা দেখিতে আদৌ পূর্ণাঙ্গ

প্রাণীর মতো নয়। এইরকম বাচ্চাকে শূক বা **লার্ভা** (Larva)* বলা হয় (25নং চিত্র-খ, খ´)। প্রজাপতির লার্ভাকে **শুঁয়াপোকা** (Caterpillar) বলে। ইহার লম্বাটে বেলনাকার দেহ আদৌ প্রজাপতির মতো দেখিতে নয়। তেমনিভাবে, **ব্যাঙাচি** ((Tadpole) অর্থাৎ ব্যাঙের লার্ভা দেখিতে কতকটা মাছের মতো (25নং চিত্র-খ)। ইহা জলে থাকে এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন



25 নং চিত্র—পরোক্ষ পরিস্ফুরণ (উপরের সারি—ব্যাঙ ; নিচের সারি—প্রজাপতি) : ক. ও ক´. ডিম (ভ্রূণ) ; খ. ও খ´. লার্ভা ; গ. পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ ; গ´. পিউপা (এই অবস্থায় লার্ভার রূপান্তর হইতে থাকে) ; ঘ´. সমঙ্গ প্রজাপতি।

নিয়া শ্বসন করে। লার্ভা খাদ্য-সংগ্রহে এবং আত্মরক্ষায় স্ব-নির্ভর। লার্ভা দৈহিক (বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ) এবং শারীরবৃত্তীয় আমূল পরিবর্তনের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। এইরকম পরিবর্তনকে **রূপান্তর** (Metamorphosis)† বলে। যে পরিস্ফুরণে লার্ভার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি হয়, তাহাকে **পরোক্ষ পরিস্ফুরণ** (Indirect development) বলে। যে সব প্রাণীর ডিমে পর্যাপ্ত খাদ্য সঞ্চিত থাকে না, তাহাদের ক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ দেখা যায়।

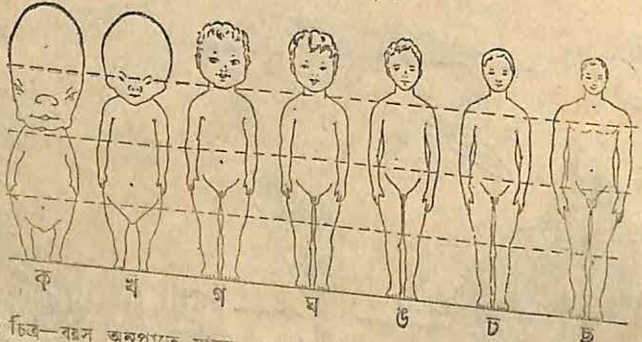
শিশু-প্রাণীর বৃদ্ধি (Growth of the young animal)

জন্মের পরও শিশু-প্রাণীর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। কারণ, শিশু-প্রাণী এবং পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর দৈহিক গঠন ও আচরণের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে।

* ভ্রূণের ঠিক পরের এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থার আগের যে দশায় প্রাণী স্বাধীনভাবে চলাফেরা, খাদ্যসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহাকে লার্ভা (Larva) বলা হয়।

† যে প্রক্রিয়ায় কতকগুলি দ্রুত ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের দ্বারা লার্ভা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়, তাহাকে রূপান্তর (Metamorphosis) বলে।

বৃদ্ধির ফলে ক্রমে এইসব পার্থক্য লোপ পায়। মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় 22 বছর পর্যন্ত এইরকম বৃদ্ধি চলিতে থাকে। মানুষের জন্ম-পরবর্তী বৃদ্ধিকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(1) দশ মাস বয়স পর্যন্ত (26নং চিত্র-গ), (2) দশ মাসের পর হইতে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত (26নং চিত্র-ঘ), (3) পাঁচ বছরের পর হইতে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত (26 নং চিত্র-ঙ ও চ), এবং (4) চৌদ্দ বছরের পর হইতে বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত (26 নং চিত্র-ছ)।



26 নং চিত্র—বয়স অনুপাতে মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক বৃদ্ধি: ক. দুই মাস বয়সের ফিটাস; খ. পাঁচ মাস বয়সের ফিটাস; গ. জন্ম-সময়ে; ঘ. দুই বছর বয়সে; ঙ. ছয় বছর বয়সে; চ. বারো বছর বয়সে; ছ. পূর্ণবয়স্ক।

মায়ের দুধই নবজাত শিশুর একমাত্র খাদ্য। পাঁচ-ছয় মাস বয়সে শিশু সুজি, খিচুড়ি ইত্যাদি শক্ত খাবার খাইতে আরম্ভ করে। ছয় হইতে আট মাস বয়সে দাঁত ওঠে; এই দাঁত অস্থায়ী। কিন্তু ছয়-সাত বছর বয়সে এই দাঁত পড়িয়া আবার স্থায়ী দাঁত উঠে। তিন মাস বয়সে শিশু মাথা তুলিতে ও ধরিয়া রাখিতে পারে, ছয় থেকে আট মাস বয়সে বসিতে শেখে। প্রথম বছরের শেষের দিকে শিশু হাঁটিতে শেখে এবং এই সময় কথা বলাও শুরু করে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে অর্থাৎ চৌদ্দ হইতে আঠারো বছর বয়সে শিশুর বৃদ্ধি খুব দ্রুতহারে হয়। এই সময় জনন-তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে এবং গৌণ যৌন লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। 22 বছরের পর আর বৃদ্ধি হয় না। তবে, দেহে চর্বি জমিয়া বা অস্থিতে ধাতব লবণ জমিয়া দেহের ওজন বাড়িতে পারে। 26 নং চিত্রে বয়স অনুপাতে মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক বৃদ্ধি দেখানো হইয়াছে।

বৃদ্ধির শর্ত (Conditions for growth)

প্রাণীদের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য (কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, স্নেহদ্রব্য ও তৈল), পরিমাণমতো জল এবং নানাধরনের খনিজ পদার্থ

অপরিহার্য। প্রাণীদের বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের ভাইটামিন, বিশেষ করিয়া, ভাইটামিন B-কম্‌প্লেক্স্‌ এবং ভাইটামিন D অবশ্য প্রয়োজনীয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃদ্ধিতে একাধিক হর্‌মোন, যেমন—বৃদ্ধি-উদ্দীপক হর্‌মোন, থাইরক্সিন এবং এস্ট্রাডা'ওল ও টেস্‌টোস্টিরোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

জনন (Reproduction)

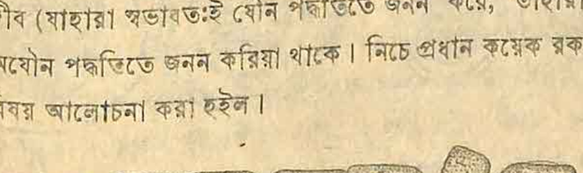
যে প্রক্রিয়ায় জীব দেহের অংশ দিয়া নিজের মতো জীব সৃষ্টি করে, তাহাকে জনন (Reproduction) বলে। জীবনের ধারা অব্যাহত রাখাই জননের উদ্দেশ্য। জননের ফলে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

জীব-রাজ্যে দুই ধরনের জনন দেখা যায়—**অযৌন জনন (Asexual reproduction)** এবং **যৌন জনন (Sexual reproduction)**। অবশ্য, যৌন জননই বেশি দেখা যায়। নিচে এই দুই ধরনের জনন সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

অযৌন জনন (Asexual reproduction)

এই ধরনের জননে বিশিষ্ট কোনও অঙ্গ অর্থাৎ জনন-অঙ্গ প্রয়োজন হয় না, এবং জনন-কোষ (পরে দ্রষ্টব্য) উৎপন্ন হয় না; একটিমাত্র জনিতৃ-জীবের একটি কোষ বা দেহের কিছু অংশ হইতে নূতন জীব সৃষ্টি হয়।

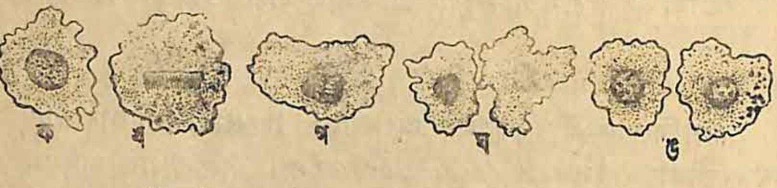
ভাইরাস, অধিকাংশ জীবাণু, নীল-হরিৎ শেওলা, অনেক এককোষী প্রাণী ইত্যাদি জীব স্বভাবতঃই এই পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে। ইহা ছাড়া, আরও অনেক জীব (যাহারা স্বভাবতঃই যৌন পদ্ধতিতে জনন করে, তাহারা) বিভিন্ন অবস্থায় অযৌন পদ্ধতিতে জনন করিয়া থাকে। নিচে প্রধান কয়েক রকম অযৌন জননের বিষয় আলোচনা করা হইল।



27 নং চিত্র—ক. হইতে ঘ. ঈস্‌টের দ্বিভাজনের ক্রমিক অবস্থা।

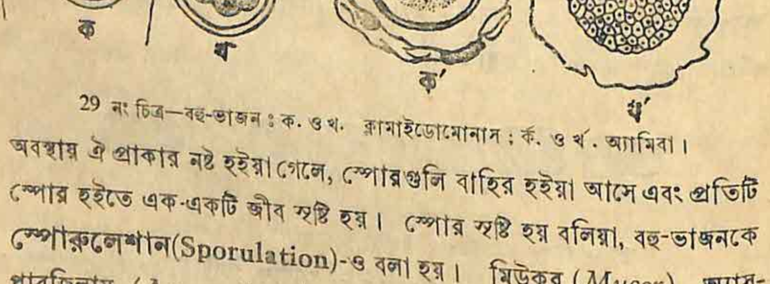
(ক) **দ্বিভাজন (Binary fission)**—জীবাণু, ঈস্‌ট (Yeast), প্রোটোকক্কাস (*Protococcus*), কস্‌মেরিয়াম (*Cosmerium*) ইত্যাদি এককোষী উদ্ভিদ, অ্যামিবা (*Amoeba*) ও প্যারামিসিয়াম (*Paramecium*) নামের এক কোষী প্রাণী প্রভৃতি অধিকাংশ এককোষী জীব সচরাচর দ্বিভাজন পদ্ধতিতে

জনন করে। দ্বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস পদ্ধতিতে দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং সাইটোপ্লাজ্‌ম-ও দুই ভাগে ভাগ হইয়া, দুইটি অপত্য কোষ গঠন করে (27 নং ও 28 নং চিত্র)।



28 নং চিত্র—ক. হইতে ঙ. অ্যামিবার দ্বিভাজনের ক্রমিক অবস্থা।

(খ) বহু-ভাজন (Multiple fission)—সাধারণতঃ প্রতিকূল অবস্থাতে অনেক এককোষী জীব, যেমন ঈস্ট, ক্লামাইডোমোনাস (*Chlamydomonas*) ইত্যাদি এককোষী উদ্ভিদ, অ্যামিবা, প্লাস্‌মোডিয়াম (*Plasmodium*) প্রভৃতি এককোষী প্রাণী বহু-ভাজন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে। এই পদ্ধতিতে নিউক্লিয়াসটি বার বার বিভাজিত হইয়া অসংখ্য অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে (29 নং চিত্র-ক´)। কিছু সাইটোপ্লাজ্‌ম-সহ প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াস এক-একটি স্পোর (Spore) তৈয়ারি করে (29 নং চিত্র-খ, খ´)। স্পোরগুলি একটি অপ্রতিরোধ্য প্রাকার দিয়া বেষ্টিত থাকে (29 নং চিত্র-খ, ক´, খ´)। অনুকূল



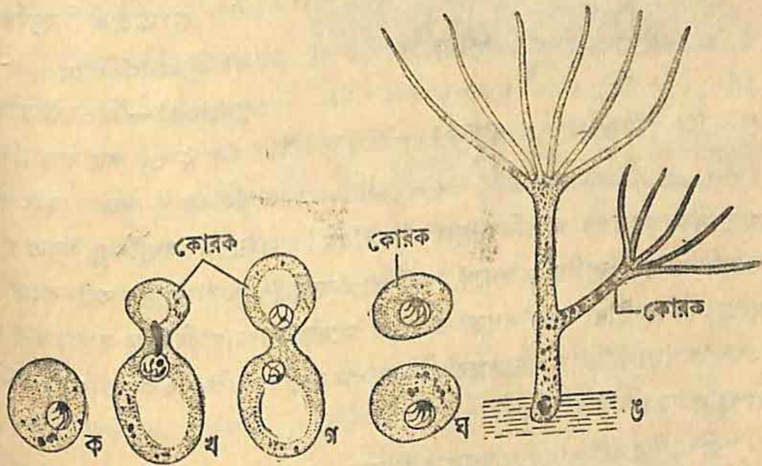
29 নং চিত্র—বহু-ভাজন : ক. ও খ. ক্লামাইডোমোনাস : ক´. ও খ´. অ্যামিবা।

অবস্থায় ঐ প্রাকার নষ্ট হইয়া গেলে, স্পোরগুলি বাহির হইয়া আসে এবং প্রতিটি স্পোর হইতে এক-একটি জীব সৃষ্টি হয়। স্পোর সৃষ্টি হয় বলিয়া, বহু-ভাজনকে স্পোরুলেশান (Sporulation)-ও বলা হয়। মিউকর (*Mucor*), অ্যাস্‌পার্‌জিলাস (*Aspergtllus*) ইত্যাদি অনেক বহুকোষী উদ্ভিদেও এইরকম অযৌন রেণু (Asexual spore) সৃষ্টি হয়।

(গ) কোরকোদ্গম (Budding)—ঈস্ট কোরকোদ্গমের দ্বারা অযৌন

জননের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পদ্ধতিতে জননের সময় কোষের একপাশ স্ফীত হইয়া উঠে (30 নং চিত্র-খ) ; নিউক্লিয়াসটি ইত্যবসরে দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

নিউক্লিয়াসের একটি ভাগ স্ফীত অংশে প্রবেশ করে, অন্য ভাগটি মাতৃ-কোষের মধ্যে থাকিয়া যায় (30 নং চিত্র-গ)। স্ফীত অংশটি ক্রমে বড় হইতে থাকে ; তখন ইহাকে **কোরক (Bud)** বলা হয়। কোরকটি অবশেষে মাতৃ-কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (30 নং চিত্র-ঘ) এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন শুরু করে। ইহা লক্ষণীয় যে, দ্বিভাজনে অপত্য কোষ দুইটি সমান হয়, কিন্তু কোরকোদ্গমে অপত্য কোষ (কোরক) মাতৃ-কোষের চেয়ে অনেক ছোট।

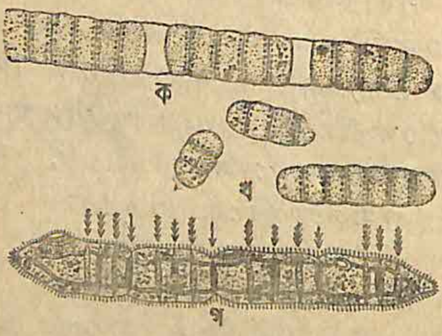


30 নং চিত্র—কোরকোদ্গম : ক. হইতে ঘ. ঈস্ট ; ঙ. হাইড্রা।

সাধারণতঃ মাতৃ-কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে কোরক হইতে আবার কোরক সৃষ্টি হয়। বহুকোষী প্রাণী হাইড্রার পাদচক্র-অঞ্চলের কাছাকাছি হইতে ছোট হাইড্রার মতো কোরক উৎপন্ন হয় (30 নং চিত্র-ঙ)। স্পঞ্জ, প্রবাল ইত্যাদি প্রাণীদের ক্ষেত্রে বার বার কোরকোদ্গমের ফলে উপনিবেশ (Colony) সৃষ্টি হয়।

(ঘ) খণ্ডিত হওয়া ও পুনরুৎপত্তি (Fragmentation and regeneration)—অসিলাটোরিয়া (*Oscillatoria*), ইউলোথ্রিকস (*Ulothrix*) ইত্যাদি সূত্রাকার শেওলার দেহ অনেক সময় কয়েকটি ছোট ছোট খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (31 নং চিত্র-খ)। ইহাকে **খণ্ডিত হওয়া (Fragmentation)** বলে। পরে বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি কোষ-বিভাজনের দ্বারা হৃত অংশের **পুনরুৎপত্তি**

(Regeneration) করে। এইভাবে একটি সূত্র হইতে কয়েকটি নূতন সূত্র সৃষ্টি হয়। কয়েক ধরনের স্বাধীনজীবী চ্যাপ্টা কৃমির দেহ-ও নির্দিষ্ট পন্থায় কয়েকটি টুকরায় বিভক্ত হয় (31 নং চিত্র-গ)। বিভক্ত অংশগুলির প্রত্যেকটি হৃত অংশের পুনরুৎপত্তি দ্বারা এক-একটি সম্পূর্ণ চ্যাপ্টা কৃমি উৎপন্ন করে।



31 নং চিত্র—খণ্ডিত হওয়া ও পুনরুৎপত্তি : ক. ও খ. অসিলাটোরিয়া : গ. চ্যাপ্টা কৃমি (ক্রমান্বয়ে এক, দুই, তিন এবং চার মাথা তীর-চিহ্নিত অঞ্চলে খণ্ডিত হয়)।

(ঙ) **অঙ্গজ বিস্তার (Vegetative propagation)**—বিভিন্ন উদ্ভিদে মূল, কাণ্ড, পত্র ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ হইতে অস্থানিক মুকুল ও অস্থানিক মূল বাহির হয়। এইরকম অস্থানিক মুকুল ও অস্থানিক মূল মাটির সংস্পর্শে আসিয়া নূতন (অপত্য) উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। পরে, জনিতৃ-উদ্ভিদ ও অপত্য উদ্ভিদের মধ্যের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন, অপত্য উদ্ভিদ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে। এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়।

বংশবৃদ্ধির এই পদ্ধতিকে **অঙ্গজ বিস্তার (Vegetative propagation)** বলে। বলা বাহুল্য, ইহাও এক বিশেষ ধরনের অযৌন জনন। পটলের মূল এবং রাঙা-আলুর **কন্দাল মূল (Root tuber)** হইতে উৎপন্ন অস্থানিক মুকুল অঙ্গজ বিস্তারে সাহায্য করে। পাথরকুচি ও বিগোনিয়া(*Begonia*)-র পত্র হইতে উৎপন্ন **পত্রাশয়ী মুকুল(Foliar bud)**-ও এইভাবে উদ্ভিদের বংশ বিস্তার করে। আদার **গ্রন্থিকাণ্ড (Rhizome)**, গোল-আলুর **স্ফীতকন্দ (Tuber)**, ওলের **গুঁড়িকন্দ (Corm)** এবং পিঁয়াজের **কন্দ (Bulb)**—এই সমস্ত **মৃদ্গত কাণ্ড(Underground stems)**-এ উৎপন্ন অস্থানিক মুকুলের প্রত্যেকটি হইতে অনুকূল পরিবেশে নূতন উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে। আমরুল, থানকুনি, পিপারমেন্ট (*Mentha*), কচুরিপানা, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি উদ্ভিদের কিছু কিছু শাখা কাণ্ডের নিচের দিকের পর্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া মাটির উপরে বা অল্প নিচে বাড়িতে থাকে। ইহাদের **অর্ধ-বায়ব কাণ্ড (Sub-aerial stem)** বলে। ইহাদের পর্ব হইতে উপরের দিকে বায়ব বিটপ অংশ এবং

নিচের দিকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। এইভাবে খুব তাড়াতাড়ি অনেক অপত্য উদ্ভিদ জন্মায়।

খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করা অযৌন জননের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এক পোষক হইতে অন্য পোষকে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় অনেক পরজীবী বিনষ্ট হয়। এই ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে পরজীবীদের ক্ষেত্রে অযৌন জননের দ্বারা খুব বেশি সংখ্যায় বংশধর সৃষ্টি হয়। জনিতৃ-জীব এবং অযৌন জননের ফলে উৎপন্ন অপত্য জীবের মধ্যে কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

যৌন জনন (Sexual Reproduction)

অধিকাংশ জীব সচরাচর যে পদ্ধতিতে জনন করে, তাহার নাম **যৌন জনন** (Sexual reproduction)। এই পদ্ধতিতে জননের সময় দুইটি জনিতৃ-জীব প্রয়োজন এবং জনিতৃ-জীব দুইটি হইতে উৎপন্ন দুইটি **জনন-কোষ** (Gametes, Germ cells, Reproductive cells মিলিত হইয়া **জাইগোট** (Zygote) বা **ভ্রূণাণু** সৃষ্টি করে। জাইগোট হইতে অপত্য জীব উৎপন্ন হয়। যৌন জননের কোনও-না-কোনও পর্যায়ে (পূর্ণাঙ্গ জীবটি ডিপ্লয়েড হইলে অর্থাৎ ইহার দেহ-কোষের ক্রোমোজোম ডিপ্লয়েড-সংখ্যক হইলে, জনন-কোষ সৃষ্টির আগে, পূর্ণাঙ্গ জীবটি হ্যাপ্লয়েড হইলে, জাইগোট সৃষ্টির পরে) মা'য়োসিস পদ্ধতিতে কোষ-বিভাজন হয়। অতএব, যে সব জীব যৌন পদ্ধতিতে জনন করে, তাহাদের জীবনের কোনও-না-কোনও দশায় জীবটি হ্যাপ্লয়েড, অন্যান্য দশায় ডিপ্লয়েড, অথবা কোনও দশায় ডিপ্লয়েড, অন্যান্য দশায় হ্যাপ্লয়েড। তবে, সব জীবের জনন-কোষমাত্রেই হ্যাপ্লয়েড এবং জাইগোট-মাত্রেই ডিপ্লয়েড।

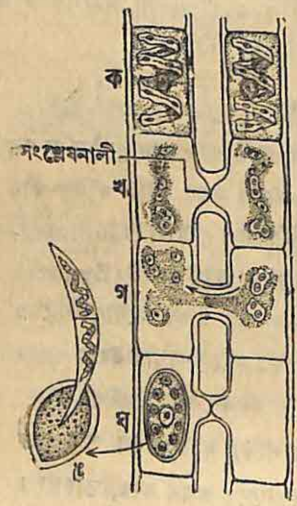
বিভিন্ন জীবে প্রধানতঃ দুই ধরনের যৌন জনন দেখা যায়—সংশ্লেষ (Conjugation) এবং নিষেক (Fertilization)। নিচে ইহাদের বিষয়ে আলোচনা করা হইল।

সংশ্লেষ (Conjugation)

সংশ্লেষ অনুন্নতধরনের যৌন জনন পদ্ধতি। ইহা সচরাচর অনুন্নতধরনের জীবে দেখা যায়। এই যৌন জননে গ্যামেট দুইটির মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য থাকে না। স্পাইরোগাইরা নামের শেওলা এবং প্যারামিসিয়াম নামক এক-কোষী প্রাণী এই পদ্ধতিতে যৌন জনন করে।

সংশ্লেষের সময় দুইটি স্পাইরোগাইরা-সূত্র পাশাপাশি চলিয়া আসে (32 নং চিত্র-ক)। পরে দুইটি সূত্রের পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি কোষ হইতে পরস্পরের

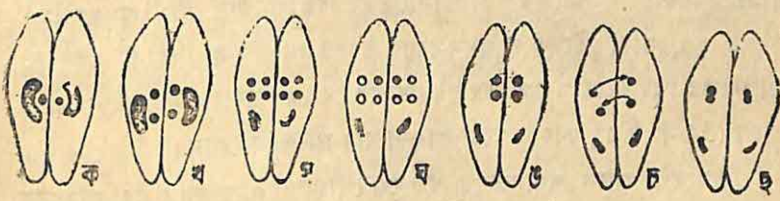
দিকে নলের মতো উপবৃদ্ধি বাহির হয় (32 নং চিত্র-খ)। উপবৃদ্ধি দুইটির নাম সংশ্লেষনালী (Conjugation tube)। সংশ্লেষনালী দুইটি যুক্ত হইয়া যায় এবং শেষে ইহাদের মধ্যেকার প্রাকার লুপ্ত হয়; ফলে, একটি পথ সৃষ্টি হয় (32 নং চিত্র-গ)। ইত্যবসরে এই দুইটি কোষের প্রোটোপ্লাজম পরিবর্তিত হইয়া দুইটি একই রকম গ্যামেট সৃষ্টি করে। তখন একটি গ্যামেট সংশ্লেষ নালীর মধ্য দিয়া অন্য গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হইয়া জাইগোট (Zygote) সৃষ্টি হয়। এইখানেই সংশ্লেষের সমাপ্তি। ইহার পরে জাইগোটের নিউক্লিয়াস মা'য়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হইয়া চারটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে; ইহাদের তিনটি বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থ নিউক্লিয়াসটি সহ জাইগোট একটি অপ্রতিরোধ্য আবরণ দ্বারা বেষ্টিত হয় (32 নং চিত্র-ঘ); তখন ইহার নাম **জাইগোস্পোর** (Zygospore)। ইহা হইতে নূতন স্পাইরোগাইরা-সূত্র জন্মায় (32 নং চিত্র-ঙ)।



32 নং চিত্র—প্যারামিসিয়ামের সংশ্লেষ (ক. হইতে ঘ.) ও জাইগোস্পোরের অঙ্কুরোদ্গম (ঙ)।

সংশ্লেষের সময় দুইটি প্যারামিসিয়াম পরস্পর পাশাপাশি আট্‌কাইয়া যায় (33 নং চিত্র-ক)। প্যারামিসিয়ামের দুইটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকে—বড় **ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস** (Macronucleus), এবং ছোট **মাইক্রোনিউক্লিয়াস** (Micronucleus)। সংশ্লেষের সময় ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসটি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং মাইক্রোনিউক্লিয়াস মা'য়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হইয়া চারটি নূতন মাইক্রোনিউক্লিয়াস গঠন করে (33 নং চিত্র-খ, গ)। ইহাদের তিনটি বিনষ্ট হয় (33 নং চিত্র-ঘ) এবং চতুর্থটি আবার বিভাজিত হইয়া দুইটি **প্রোনিউক্লিয়াস** (Pronucleus) গঠন করে (33 নং চিত্র-ঙ)। ইহাদের একটি সক্রিয় এবং অন্যটি নিষ্ক্রিয়। প্রতিটি প্যারামিসিয়ামের সক্রিয় প্রোনিউক্লিয়াস অন্য প্যারামিসিয়ামের নিষ্ক্রিয় প্রোনিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয় (33 নং চিত্র-চ)। ইহার ফলে, জাইগোট সৃষ্টি হয় (33 নং চিত্র-ছ)।

এইখানেই সংশ্লেষের সমাপ্তি। ইহার পর প্যারামিসিয়াম দুইটি পৃথক হইয়া যায়। ইহার পর প্রতিটি প্যারামিসিয়ামের নিউক্লিয়াস (জাইগোট) মোট পাঁচবার, এবং প্যারামিসিয়াম দুইটি মোট দুইবার বিভাজিত হওয়ার ফলে, প্রতিটি প্যারামিসিয়াম হইতে ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস ও মাইক্রোনিউক্লিয়াস-সমন্বিত চারটি করিয়া নূতন প্যারামিসিয়াম সৃষ্টি হয়।



33 নং চিত্র—ক. হইতে ছ. প্যারামিসিয়ামের সংশ্লেষের ক্রমিক অবস্থা।

নিষেক (Fertilization)

নিষেক উন্নত পর্যায়ের যৌন জনন। ইহা উন্নতধরনের জীবে দেখা যায়। নিষেকে যে দুইটি জনন-কোষ মিলিত হয়, তাহারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন। ইহাদের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট, সচল এবং সক্রিয়। ইহার নাম **পুং-জনন-কোষ** (Male gamete) বা **শুক্রাণু** (Sperm, Spermatozoon)। অন্যটি অপেক্ষাকৃত বড়, নিশ্চল এবং নিষ্ক্রিয়। ইহাকে **স্ত্রী-জনন-কোষ** (Female gamete) বা **ডিম্বাণু** (Ovum, Egg-cell) বলা হয়। **জনন-অঙ্গ** (Reproductive organ) নামের নির্দিষ্ট অঙ্গে জনন-কোষ উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-জনন-কোষ এবং পুং-জনন-কোষ যথাক্রমে **স্ত্রী-জনন-অঙ্গ** (Female reproductive organ)-এ এবং **পুং-জনন-অঙ্গ**(Male reproductive organ)-এ উৎপন্ন হয়। একই জীবের দেহে স্ত্রী- এবং পুং-জনন-অঙ্গ থাকিলে, ঐ জীবকে **উভলিঙ্গ** (Bisexual, Hermaphrodite, Monoecius) বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদ এবং চ্যাপ্টা কৃমি, জোঁক ইত্যাদি অমেরুদণ্ডী প্রাণী উভলিঙ্গ। যদি কোনও জীবের দেহে হয় পুং-অথবা স্ত্রী- যে-কোনও একধরনের জনন-অঙ্গ থাকে, তবে ঐ জীবকে **একলিঙ্গ** (Unisexual, Dioecious) বলা হয়। একলিঙ্গ জীব দুই ধরনের—স্ত্রী-জনন-অঙ্গ-যুক্ত **স্ত্রী** (Female) এবং পুং-জনন-অঙ্গ-যুক্ত **পুরুষ** (Male)।

পেঁপে, তাল, খেজুর প্রভৃতি অল্প কয়েকটি উদ্ভিদ, গোলকৃমি, পর্বপদী প্রাণী ও আরও অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণী একলিঙ্গ। পরের পৃষ্ঠায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিষেক পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

উদ্ভিদের নিষেক (Fertilization in plants)

সপুষ্পক উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন ধরনের অপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জননের বিস্তারিত বিবরণে কম-বেশি পার্থক্য থাকিলেও, উহাদের মৌলিক ভিত্তি একই। নিচে গুপ্তবীজী সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক বর্ণনা করা হইল।

পুষ্প সপুষ্পক উদ্ভিদের জনন-অঙ্গ : পুংস্তবক পুং-জনন-অঙ্গ এবং স্ত্রীস্তবক স্ত্রী-জনন-অঙ্গ। পুংস্তবকের পরাগধানীতে যে **পরাগরেণু (Pollen grain)** উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই পুংজনন-কোষ উৎপন্ন হয় (34 নং চিত্র)। তেমনি, স্ত্রীস্তবকের ডিম্বাশয়ের মধ্যস্থ ডিম্বাণুর ভিতরে যে **ভ্রূণস্থলী (Embryo-sac)** থাকে (34 নং চিত্র), তাহার মধ্যে পাওয়া যায় স্ত্রী-জনন-কোষ।

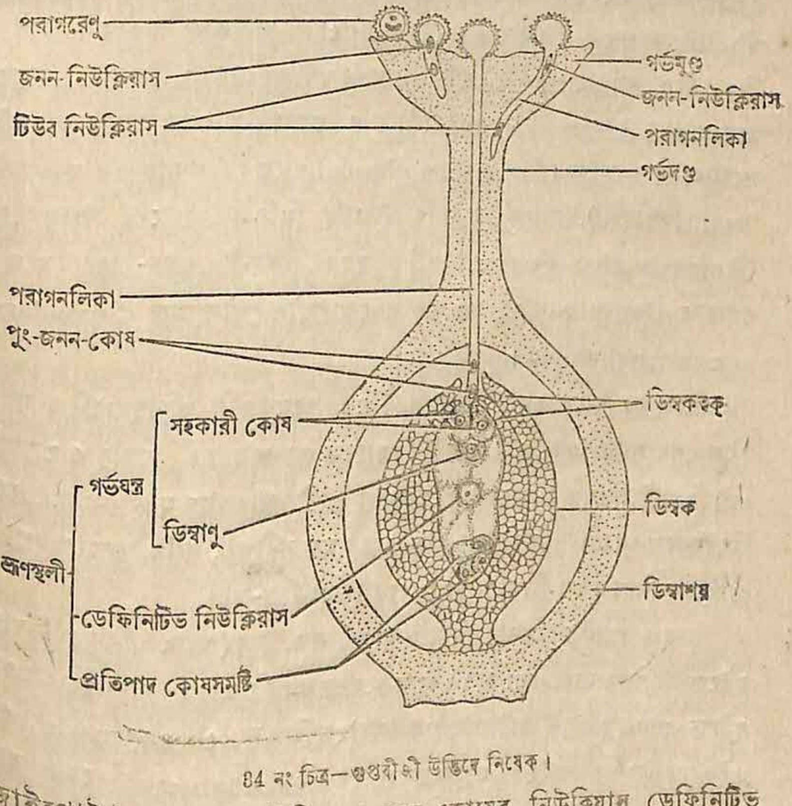
নিষেকের আগে পরাগরেণুর গর্ভমুণ্ডে পৌঁছানো প্রয়োজন। যে প্রক্রিয়ায় পরাগরেণু পরাগধানী হইতে গর্ভমুণ্ডে পৌঁছায়, তাহাকে বলে **পরাগযোগ (Pollination)**। পরাগরেণু যখন একই পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে পড়ে, তখন তাহাকে **স্বপরাগযোগ (Self-pollination)** বলে। পরাগরেণু (অন্য গাছের) অন্য পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে পড়িলে, **ইতর-পরাগযোগ (Cross pollination)** হয়। বায়ু, জল, পতঙ্গ প্রভৃতির সাহায্যে ইতর-পরাগযোগ সম্ভব হয়।

গর্ভমুণ্ডে পতিত পরাগরেণুতে দুইটি অসমান নিউক্লিয়াস থাকে—বড়টির নাম **টিউব নিউক্লিয়াস (Tube nucleus)** এবং ছোটটির নাম **জনন-নিউক্লিয়াস (Generative nucleus)**। গর্ভমুণ্ড হইতে নিঃসৃত রসের সাহায্যে পরাগরেণু ফুলিয়া উঠে এবং ইহার ত্বক্ নলের আকারে গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়া বাড়িতে বাড়িতে ডিম্বকের দিকে আগাইতে থাকে। এই নলকে **পরাগনলিকা (Pollen tube)** বলে। পরাগনলিকার ডগার দিকে টিউব নিউক্লিয়াস এবং উহার পিছনে জনন-নিউক্লিয়াস থাকে। ডিম্বকের কাছাকাছি আসিলে, জনন-নিউক্লিয়াসটি দুই ভাগে ভাগ হইয়া দুইটি **পুং-জনন-কোষ** সৃষ্টি করে ; টিউব নিউক্লিয়াসটি নষ্ট হইয়া যায়।

নিষেকের ঠিক আগে **ডিম্বক(Dvule)**-এর মধ্যস্থ ভ্রূণস্থলীর দুই প্রান্তে তিনটি করিয়া মোট ছয়টি কোষ এবং কেন্দ্রে **ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়াস (Definitive nucleus), সেকেণ্ডারি নিউক্লিয়াস (Secondary nucleus)** বা **ফিউশন নিউক্লিয়াস (Fusion nucleus)** নামের একটি নিউক্লিয়াস থাকে। ইহা দুইটি নিউক্লিয়াসের মিলনে উৎপন্ন হয়। ভ্রূণস্থলীর **ডিম্বকরন্ধ্র(Micropyle)**-সংলগ্ন প্রান্তে যে তিনটি কোষ থাকে, তাহাদের একসঙ্গে **গর্ভযন্ত্র (Egg-apparatus)** বলা হয়। গর্ভযন্ত্রের বাহিরের দিকে

পাশাপাশি অবস্থিত কোষ দুইটি **সহকারী কোষ** (Synergids), ভিতরের বড় কোষটি **ডিম্বাণু**। গর্ভযন্ত্রের বিপরীত দিকের কোষ তিনটি **প্রতিপাদ কোষ-সমষ্টি** (Antipodal cells)।

পরাগনলিকা ক্রমে ডিম্বকরন্ধ্রের মধ্য দিয়া ভ্রূণস্থলীর সংস্পর্শে আসে। তখন পরাগনলিকার ডগা হইতে নিঃসৃত উৎসেচকের সাহায্যে পরাগনলিকা ও ভ্রূণ-স্থলীর প্রাকার এবং সহকারী কোষ দুইটি বিনষ্ট হয়, এবং পুং-জনন-কোষ দুইটি ভ্রূণস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে। একটি পুং-জনন-কোষের নিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়। ইহাই **প্রকৃত নিষেক**। ইহার ফলে



34 নং চিত্র—গুপ্তবীজী উদ্ভিদে নিষেক।

জাইগোট উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পুং-জনন-কোষের নিউক্লিয়াস ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়। ইহা দ্বিতীয় নিষেক। ইহার ফলে সস্য নিউক্লিয়াস(Endosperm nucleus) উৎপন্ন হয়। জাইগোট হইতে ভ্রূণ এবং সস্য নিউক্লিয়াস হইতে সস্য (Endosperm) সৃষ্টি হয়। দুইটি পুং-জনন-নিউক্লিয়াস ভ্রূণস্থলীর দুইটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়

বলিয়া, এইরকম নিষেককে দ্বি-নিষেক (Double fertilization) বলে। দ্বি-নিষেক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।

প্রাণীদের নিষেক (Fertilization in animals)

প্রাণীদের জনন-কোষ উৎপন্ন হয় গোনাড(Gonads)-এ। পুরুষ-প্রাণীর গোনাড শুক্রাশয় (Testis)। ইহা হইতে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-প্রাণীর গোনাডের নাম ডিম্বাশয় (Ovary)। ইহা হইতে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। গোনাডকে মুখ্য যৌন অঙ্গ (Primary sex organs) বলা হয়। শুক্রাণু বহন করার জন্য, অধিকাংশ প্রাণীর শুক্রাশয়ের সঙ্গে শুক্রনালী (Vas deferens) নামের নালী যুক্ত থাকে। তেমনিভাবে, ডিম্বাণু বহন করার জন্য স্ত্রী-প্রাণীদের থাকে ডিম্বনালী (Oviduct)। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বনালীর শেষ ভাগে একটি পেশীবহুল কক্ষ সৃষ্টি হয় (24 নং চিত্র-ক)। ইহার নাম জরায়ু (Uterus)। শুক্রনালী এবং ডিম্বনালীর বিভিন্ন অংশে কয়েকটি আনুষঙ্গিক গ্রন্থি (Accessory glands) থাকে। গোনাড এবং শুক্রনালী অথবা (ডিম্বনালী), আনুষঙ্গিক গ্রন্থি ইত্যাদি মিলিয়া প্রাণীদের জনন-তন্ত্র (Reproductive system) গঠিত হয়। জনন-ই জনন-তন্ত্রের কাজ। গোনাড ছাড়া জনন-তন্ত্রের অন্য সব অঙ্গকে গৌণ যৌন অঙ্গ (Secondary sex organs) বলা হয়।

নিষেকের আগে একটি ডিম্বাণুর দিকে অনেকগুলি শুক্রাণু ধাবিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর এই মিলনই নিষেক। অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী, অধিকাংশ মাছ এবং ব্যাঙেদের নিষেক হয় জলে। কিছু কিছু মাছ এবং সমস্ত সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিষেক হয় ডিম্বনালীর মধ্যে (24 নং চিত্র-ক)।

অনেক প্রাণীর ডিম্বাণু নিষিক্ত না হইলেও, উহা (অর্থাৎ অনিষিক্ত ডিম্বাণু) হইতে সরাসরি ভ্রূণ, এবং ভ্রূণ হইতে অপত্য প্রাণী জন্মায়। অনিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে এইরকম প্রাণী সৃষ্টি হওয়াকে অপুংজনি (Parthenogenesis), এবং এইভাবে উৎপন্ন প্রাণীকে অপুংজাত (Parthenogenetic) বলে। রানী (Qu en) মৌমাছির অধিকাংশ ডিম নিষিক্ত হয়, কতকগুলি আবার নিষিক্ত হয় না। নিষিক্ত ডিম হইতে কর্মী (Worker) অথবা রানী সৃষ্টি হয়, কিন্তু অনিষিক্ত ডিম হইতে পুং মধুপ (Drone) জন্মায়। গ্যামেট (ডিম্বাণু) সৃষ্টি হয় বলিয়া, অপুংজনি এক বিশিষ্ট ধরনের যৌন জনন। কয়েক ধরনের পিঁপড়া, বোল্‌তা এবং আরও কয়েক রকম পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীতে অপুংজনি দেখা যায়।

অনেক মাছ এককালীন হাজার হাজার ডিম পাড়ে, হাঁস-মুরগিরা কুড়ি-পঁচিশটি করিয়া ডিম পাড়ে। এইসব ডিম হইতে (কিছু ডিম বিনষ্ট হইলেও) মোটামুটি সেই অনুপাতে বাচ্চা বাহির হয়। শুয়ার, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী পাঁচ-ছয়টি করিয়া বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু গরু, ঘোড়া এবং মানুষের ক্ষেত্রে এককালীন মাত্র একটি বাচ্চা প্রসব হয়। মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় এককালীন হুবহু একইরকম দেখিতে দুইটি ছেলে অথবা দুইটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। এইরকম সন্তান দুইটিকে **যমজ (Twins)** বলে। জাইগোটের প্রথম বিভাজনের ফলে যে দুইটি কোষ উৎপন্ন হয় (24 নং চিত্র-ক), তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে, ঐ কোষ দুইটি হইতে যমজ সৃষ্টি হয়। জাইগোটের দ্বিতীয় বিভাজনের ফলে উৎপন্ন চারটি কোষ হইতে এইভাবে চারটি সন্তান সৃষ্টি হয়। একই সময়ে দুইটি ডিম্বাণু নিষিক্ত হইলে, ঐ দুইটি জাইগোট হইতে দুইটি ছেলে, দুইটি মেয়ে অথবা একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। অনেক সময়, এই দুই পদ্ধতির মিলিত চেষ্টায়, গর্ভকালের শেষে আটটি পর্যন্ত (চারটি ছেলে, চারটি মেয়ে, অথবা অন্য অনুপাতে) সন্তান প্রসব হয়। একধরনের খুব ছোট পরজীবী পতঙ্গের একটিমাত্র জাইগোট হইতে এক হাজার পর্যন্ত অপত্য পতঙ্গ জন্মায়।

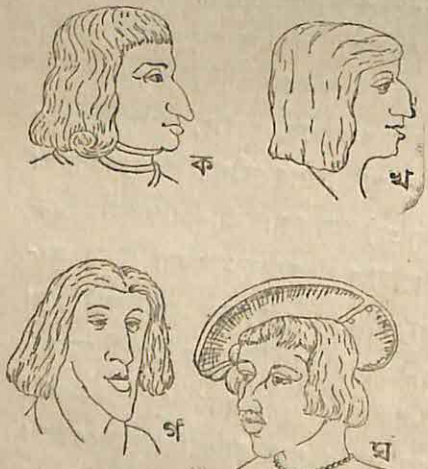
জননের ফলে উৎপন্ন নূতন বংশধরকে খাদ্যাভাব, দুর্যোগ, শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি হইতে রক্ষা করার জন্য অনেক প্রাণী বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। ইহাকে **জনিতৃ-যত্ন** (Parental care) বলা হয়। স্ত্রী-চিংড়ি উহার ডিম-গুলিকে উদরের পদের সঙ্গে আট্‌কাইয়া রাখে। অনেক মাকড়সা উহার ভ্রূণ-গুলিকে কোকুন(Cocoon)-এর মধ্যে রাখিয়া, কোকুনকে বুকে আট্‌কাইয়া বহিয়া বেড়ায়। একধরনের ট্যাংরা-জাতীয় মাছ উহাদের ডিমগুলিকে মুখ-গহ্বরের মধ্যে রাখিয়া দেয়। স্ত্রী-পাইপা (*Pipa*) ব্যাঙ এবং পুরুষ-ধাত্রী ব্যাঙ (Midwife Toad) ভ্রূণগুলিকে পিঠের গর্তে রাখিয়া বহিয়া বেড়ায়। পাখিরা ডিমে তা' দেয়—বাচ্চারা খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত উহাদের খাদ্য যোগায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর শিশুরা মায়ের দুধ খাইয়া বড় হয়। মানুষের ক্ষেত্রে চরম জনিতৃ-যত্ন দেখা যায়। সন্তানকে সবরকমভাবে রক্ষা করার জন্য মা-বাবার চেষ্টার অন্ত নাই।

জীবের অভিব্যক্তি(Evolution)-তে যৌন জনন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যৌন জননের ফলে জনিতৃ-জীব ও অপত্য-জীবের মধ্যে পরিবৃত্তি (Variation) হওয়া সম্ভব। পরিবৃত্তির অন্তিম ফলশ্রুতি প্রজাতির উৎপত্তি (Origin of species)।

বংশগতি
(Heredity)

5

অযৌন জননে একটিমাত্র জনিতৃ-জীব হইতে অপত্য-জীব সৃষ্টি হয়। সেইজন্য, জনিতৃ ও অপত্যের বিভিন্ন লক্ষণ একইরকম। কিন্তু যৌন জননে দুইটি জনিতৃ-জীবের দেহাংশের মিলনে অপত্য-জীব সৃষ্টি হয় বলিয়া, অপত্য-জীব জনিতৃ-জীব দুইটির কোনটির মতই হুবহু হয় না। শুধু তাহাই নয়, অপত্য-জীবগুলিও পরস্পর হুবহু এক হয় না। জনিতৃ-জীব ও অপত্য-জীবের নানা লক্ষণে পার্থক্য থাকিলেও, কতকগুলি লক্ষণ যে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়, এই তথ্য প্রাচীন কালেও অজানা ছিল না। যেমন, প্রাচীন কালে গ্রীকরা জানিতেন যে, টাক-মাথা, ট্যারা-চোখ, কয়েক ধরনের চক্ষুরোগ ইত্যাদি লক্ষণ বিশেষ বিশেষ পরিবারে বংশপরম্পরায় দেখা যায়।



35 নং চিত্র—হ্যাপ্‌সবার্গ পরিবারে পুরু অধরোষ্ঠ ও বাঁকানো নাকের উত্তরাধিকার: ক. প্রথম রুডল্ফ (1218—1291); খ. প্রথম ম্যাক্সিমিলান (1460—1619); গ. পঞ্চম চার্লস 1600—1658); ঘ. প্রথম ফার্দিনাণ্ড (1603—1564)।

এই প্রসঙ্গে মধ্য-ইউরোপের হ্যাপ্‌সবার্গ (Hapsburg) বংশের পুরু অধরোষ্ঠ এবং বাঁকানো নাক উল্লেখযোগ্য। প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর ধরিয়া (1218 হইতে 1565 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) এই বংশের সমস্ত বংশধরের মধ্যে এই দুইটি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

এইভাবে, জনিতৃ-জীবের লক্ষণ অপত্য-জীবের মধ্যে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হওয়াকে **উত্তরাধিকার (Inheritance)** বা **বংশগতি (Heredity)** বলে। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের বংশগতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাহাকে **সুপ্রজনন-বিদ্যা (Genetics)** বলে।

মিশর ও ব্যাবিলনের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে কৃত্রিম প্রজন (Artificial breeding)-এর সাহায্যে গৃহপালিত পশু ও শস্য-উদ্ভিদের উন্নততর বংশধর উৎপন্ন করার নজির পাওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে জননের ফলে বংশধর সৃষ্টি হয়, এবং জীবের লক্ষণ কিভাবে বংশানুক্রমে প্রবাহিত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সেবিষয়ে কোনও স্পষ্ট ও বিজ্ঞান-সম্মত ধারণা ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বংশগতির এক অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞান-ভিত্তিক মতবাদ খাড়া করা হয়। এই মতবাদকে **মিশ্রিত মতবাদ** (Blending theory) বলে। এই মতবাদ অনুসারে, জনন-কালে স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় দেহের অন্তর্গত বংশগতি-পদার্থ (Hereditary meterial) কোনওক্রমে মিশিয়া গেলে (যেমন—দুই রকম জলরঙ মিশিয়া যায়), মিশ্রিত বংশগতি-পদার্থ অপত্য তথা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। একবার মিশিয়া গেলে, বংশগতি-পদার্থ আর আলাদা হয় না। যেমন—যদি সাদা এবং কালো দুইটি ভিন্ন রঙের একই প্রজাতির প্রাণী জননের ফলে ধূসর রঙের বংশধর উৎপন্ন করে, তবে বংশানুক্রমে এই ধূসর রঙ অপরিবর্তিত থাকিবে। কোনও জন্ম(Generation)-তে আর সাদা অথবা কালো রঙের বংশধর সৃষ্টি হইবে না। বলা বাহুল্য, সব সময় তাহা হয় না। সুতরাং, এই মতবাদ ভ্রান্ত।

গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল (Gregor Johann Mendel) নামক অস্ট্রিয়াবাসী জনৈক যাজক সর্বপ্রথম মটরগাছ নিয়া প্রজনন পরীক্ষা (Breeding experiments) করেন এবং পরীক্ষার ভিত্তিতে বংশগতির কতকগুলি সূত্র (Laws) প্রবর্তন করেন। 1866 খ্রীষ্টাব্দে এই পরীক্ষার ফলাফল এক অখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ এই পরীক্ষার গুরুত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 1901 খ্রীষ্টাব্দে তিন জন বিজ্ঞানী স্বাধীনভাবে এবং একই সময়ে মেণ্ডেলের গবেষণার ফলাফল পুনরাবিষ্কার করেন।

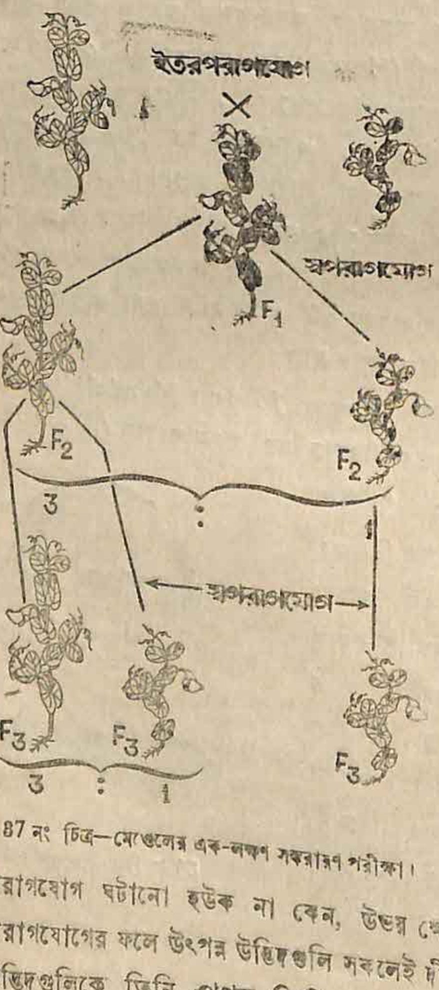


86 নং চিত্র—মেণ্ডেল।

ইহার পর হইতে বিজ্ঞানীরা ক্রমে মেণ্ডেলের সূত্রগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে থাকেন। মেণ্ডেলের পরীক্ষাকে বর্তমান বংশগতি এবং সুপ্রজনন-বিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর ধরা হয়।

মেণ্ডেলের পরীক্ষা (Mendel's experiments)

মেণ্ডেল **বিকল্প লক্ষণ**(Alternative character)-যুক্ত দুই ধরনের মটরগাছ নিয়া এই পরীক্ষা আরম্ভ করেন একধরনের উদ্ভিদগুলি আকারে লম্বা (অর্থাৎ, দীর্ঘ প্রকার), অন্যগুলি আকারে ছোট (অর্থাৎ, খর্ব প্রকার)। মেণ্ডেল প্রথমে বিকল্প লক্ষণের এই দুই প্রকার উদ্ভিদে পৃথকভাবে দুইটি জনু ধরিয়া স্বপরাগযোগ ঘটান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মটরগাছে খুব সহজে এবং কৃত্রিমভাবে স্বপরাগযোগ অথবা ইতর-পরাগযোগ ঘটানো যায়। সেইজন্য মেণ্ডেল প্রজনন পরীক্ষায় মটরগাছকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন।



87 নং চিত্র—মেণ্ডেলের এক-লক্ষণ সংকরায়ণ পরীক্ষা।

ক্রমাগত দুইটি জনুতে যে উদ্ভিদগুলি শুধু দীর্ঘ অথবা শুধু খর্ব বংশধর উৎপন্ন করে পরের পরীক্ষার জন্য তিনি সেই উদ্ভিদগুলি নির্বাচন করেন। ইহাদের **শুদ্ধ-লক্ষণ**(Pure character)-যুক্ত উদ্ভিদ ধরা হয়। ইহার পর মেণ্ডেল দীর্ঘ ও খর্ব উদ্ভিদের (শুদ্ধ-লক্ষণের) মধ্যে কৃত্রিম ইতর-পরাগযোগ ঘটান ; অর্থাৎ, দীর্ঘ উদ্ভিদের পরাগরেণু নিয়া খর্ব উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে, অথবা খর্ব উদ্ভিদের পরাগরেণু নিয়া দীর্ঘ উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে প্রয়োগ করেন। যেভাবেই পরাগযোগ ঘটানো হউক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি লক্ষ্য করেন, ইতর-পরাগযোগের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলি সকলেই দীর্ঘ হয় (37 নং চিত্র)। এই জনুর উদ্ভিদগুলিকে তিনি **প্রথম ফিলিয়াল জনু** (First filial generation) বা সংক্ষেপে F_1-জনুরূপে চিহ্নিত করেন। মেণ্ডেল F_1-জনুর উদ্ভিদগুলির স্ব-

পরাগযোগ ঘটান। ইহার ফলে উৎপন্ন বংশধরগুলিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় ফিলিয়াল জনু(বা F_2-জনু)-তে দীর্ঘ এবং খর্ব উভয় ধরনের উদ্ভিদ দেখা গেল। তিনি লক্ষ্য করেন, F_2-জনুতে প্রায় 3 : 1 অনুপাতে দীর্ঘ এবং খর্ব উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ, প্রতি চারটি উদ্ভিদের মধ্যে তিনটি দীর্ঘ এবং একটি খর্ব উদ্ভিদ দেখা যায়। মেণ্ডেল আবার এই দীর্ঘ এবং খর্ব উদ্ভিদগুলির স্বপরাগযোগ ঘটান এবং F_3-জনুতে দেখিতে পান, খর্ব উদ্ভিদগুলি শুধু খর্ব বংশধর উৎপন্ন করে, কিন্তু দীর্ঘ উদ্ভিদগুলির কতকগুলি শুধু দীর্ঘ এবং কতকগুলি আবার (F_2-জনুর মতো 3 : 1 অনুপাতে) দীর্ঘ এবং খর্ব বংশধর উৎপন্ন করে। 37 নং চিত্রে মেণ্ডেলের এই পরীক্ষা ও তাহার ফলাফল দেখানো হইল।

এইভাবে মেণ্ডেল মোট সাত জোড়া বিকল্প লক্ষণের মটরগাছ নিয়া উপরের পরীক্ষার মতো সাতটি পরীক্ষা করেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে একই ফলাফল পান। নিচে মেণ্ডেলের পরীক্ষিত মটরগাছের সাত জোড়া বিকল্প লক্ষণের তালিকা এবং F_2-জনুতে উৎপন্ন সঠিক বংশধরের সংখ্যা দেওয়া হইল। সংখ্যাগুলি ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, F_2-জনুতে বিকল্প লক্ষণের উদ্ভিদগুলি প্রায় 3 : 1 অনুপাতে উৎপন্ন হয়।

মটর গাছের বৈশিষ্ট্য	লক্ষণ		F_2-জনুতে উৎপন্ন বংশধর		মোট বংশধর
	প্রকট*	প্রচ্ছন্ন*	প্রকট*	প্রচ্ছন্ন*	
বীজের আকার	মসৃণ ত্বক	কুঞ্চিত ত্বক	5,474	1,850	7,324
বীজপত্রের রঙ	হলুদ	সবুজ	6,022	2,001	8,023
পুষ্পের অবস্থান	কাক্ষিক	শীর্ষ	651	207	858
পুষ্পের রঙ	লাল	সাদা	705	224	929
শিম্বের আকার	মসৃণ এবং চ্যাপ্টা	বীজ-যুক্ত	882	299	1,181
শিম্বের রঙ	সবুজ	হলুদ	428	152	580
কাণ্ডের দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ	খর্ব	787	217	1,064

এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেণ্ডেল বংশগতির প্রথম সূত্র প্রবর্তন করেন। ইহা মেণ্ডেলের **প্রথম সূত্র** (**Mendel's first law**) বা পৃথগ্‌ভবন সূত্র (**Law of segregation**) নামে পরিচিত।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মেণ্ডেলের সময় গ্যামেট (Gamete), জাইগোট (Zygote) প্রভৃতি শব্দগুলি জানা ছিল না। কাজেই, মেণ্ডেলের মূল

*72 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বক্তব্য মোটামুটি ঠিক রাখিয়া, বর্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে পৃথগ্‌ভবন সূত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

(1) উদ্ভিদের প্রত্যেকটি লক্ষণ এক-একটি **উপাদান**(Factor)-এর উপর নির্ভর করে। যেমন ধরা যাক, উপরের পরীক্ষায় দীর্ঘ এবং খর্ব লক্ষণের জন্য যথাক্রমে T এবং t উপাদান। বিকল্প লক্ষণের উপাদান দুইটিকে একত্রে **অ্যালিলোমরফিক জোড়া** (Allelomorphic pair) বা **অ্যালিল** (Allele) বলে ; যেমন—Tt।

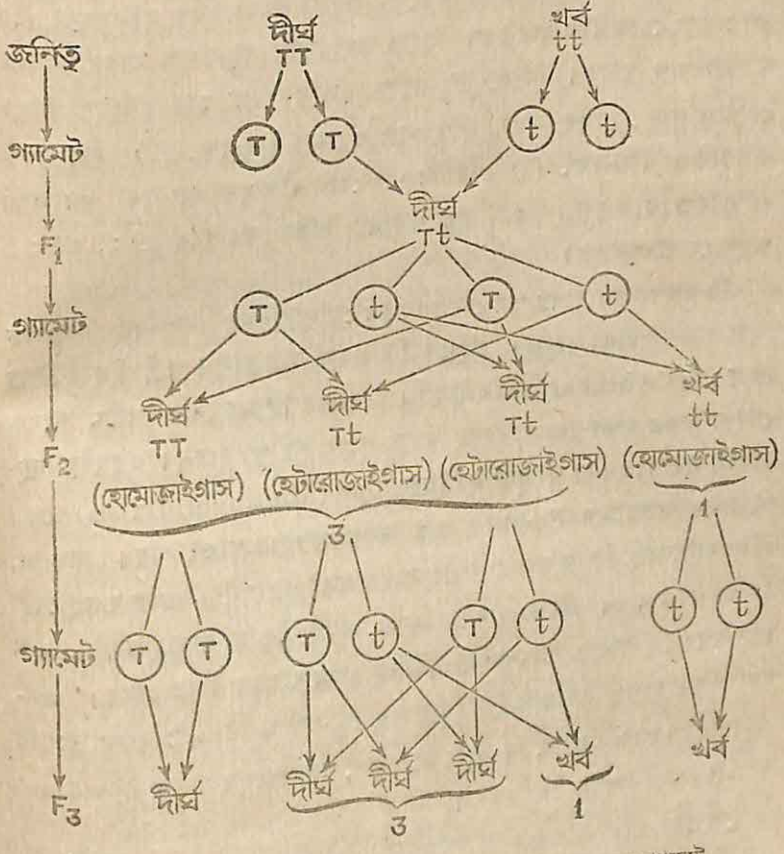
(2) জাইগোটে উপাদানগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। শুদ্ধ-লক্ষণের উদ্ভিদের জাইগোটে একই উপাদান একজোড়া থাকে, অর্থাৎ হয় TT অথবা tt। কাজেই, শুদ্ধ-লক্ষণ-যুক্ত উদ্ভিদের জাইগোটকে **হোমোজাইগোট** (Homozygote) এবং হোমোজাইগোট হইতে গঠিত উদ্ভিদকে **হোমো-জাইগাস উদ্ভিদ** (Homozygous plants) বলে। যে জাইগোটের উপাদান দুইটি এক নয় (যেমন Tt), তাহাকে **হেটারোজাইগোট** (Heterozygote) বা সঙ্কর (Hybrid) বলা হয়। হেটারোজাইগোট হইতে উদ্ভূত উদ্ভিদকে **হেটারোজাইগাস উদ্ভিদ** (Heterozygous plants) বলে।

(3) হোমোজাইগাস উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জাইগোটে যে লক্ষণের উপাদান থাকে, উদ্ভিদের বহিরাকৃতিতে (একই উপাদান এক-জোড়া থাকায়) সেই লক্ষণ প্রকাশ পায় ; অর্থাৎ, এক্ষেত্রে জাইগোটের অন্তর্গত লক্ষণ বা **জিনোটাইপ** (Genotype) এবং উদ্ভিদের প্রকাশিত লক্ষণ বা **ফিনোটাইপ** (Phenotype) একই হইয়া থাকে।

(4) হেটারোজাইগাস উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জাইগোটে বিকল্প দুইটি লক্ষণের উপাদান একত্রে (অ্যালিলোমরফিক জোড়া) থাকিলেও, যে-কোনও একটি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, অন্যটি চাপা থাকে। প্রকাশিত লক্ষণকে **প্রকট লক্ষণ** (Dominant character) এবং অপ্রকাশিত লক্ষণটিকে **প্রচ্ছন্ন লক্ষণ** (Recessive character) বলে। যেমন—উপরোক্ত পরীক্ষায় F_1-জনুতে সমস্ত উদ্ভিদগুলি দীর্ঘ হয়। এক্ষেত্রে দীর্ঘ ও খর্ব লক্ষণ দুইটি যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণ।

(5) গ্যামেট গঠনের সময় উপাদানগুলি সমানভাবে পৃথক হইয়া যায় ; ফলে, গ্যামেটে কোনও লক্ষণের একটিমাত্র উপাদান থাকে। সুতরাং, গ্যামেট-মাত্রেই শুদ্ধ-লক্ষণ-যুক্ত।

মেণ্ডেলের উপরোক্ত পরীক্ষায় বিভিন্ন জনুতে জাইগোটে এবং গ্যামেটে উপাদানগুলির বণ্টন নিচের চিত্রে দেখানো হইল।



৩৪ নং চিত্র—মেণ্ডেলের এক-লক্ষণ সঙ্করায়ণ পরীক্ষায় বিভিন্ন জনুতে গ্যামেটে ও জাইগোটে উপাদান দুইটির বণ্টন।

মেণ্ডেল প্রতিবারে একজোড়া বিকল্প লক্ষণ-যুক্ত মটরগাছ নিয়া অনেকবার উপরে বর্ণিত পরীক্ষাটি করেন। এইধরনের প্রজন পরীক্ষাকে **এক-লক্ষণ সঙ্করায়ণ বা মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross)** বলা হয়।

ইহার পর মেণ্ডেল দুই জোড়া বিকল্প লক্ষণ-যুক্ত মটরগাছ নিয়া প্রজন পরীক্ষা করেন। এইধরনের প্রজন পরীক্ষাকে **দ্বি-লক্ষণ সঙ্করায়ণ বা ডাই-হাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross)** বলা হয়। দ্বি-লক্ষণ সঙ্করায়ণের এক পরীক্ষায় মেণ্ডেল (ক) দীর্ঘ কাণ্ড-যুক্ত ও গোল বীজ উৎপন্নকারী এবং (খ)

খর্ব কাণ্ড-যুক্ত ও কুঞ্চিত বীজ উৎপন্নকারী—এই দুই ধরনের শুদ্ধ-লক্ষণ-যুক্ত মটরগাছ নিয়াছিলেন। আগের পরীক্ষার মতো, এই দুই ধরনের মটরগাছের মধ্যে ইতর-পরাগযোগ ঘটানোর ফলে, F_1-জনুতে উৎপন্ন সমস্ত মটরগাছই দীর্ঘ কাণ্ড এবং গোল বীজ-যুক্ত হয়। ইহার পর তিনি F_1-জনুর মটরগাছগুলির স্বপরাগযোগ ঘটান। ফলে, F_2-জনুতে তিনি মোট চার রকমের উদ্ভিদ দেখিতে পান ; যেমন—(1) দীর্ঘ কাণ্ড ও গোল বীজ-যুক্ত, (2) দীর্ঘ কাণ্ড ও কুঞ্চিত বীজ-যুক্ত, (3) খর্ব কাণ্ড ও গোল বীজ-যুক্ত এবং (4) খর্ব কাণ্ড ও কুঞ্চিত বীজ-যুক্ত। এই চার রকমের উদ্ভিদ যথাক্রমে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতে উৎপন্ন হয়।

দ্বি-লক্ষণ সঙ্করায়ণের পর মেণ্ডেল তিন জোড়া বিকল্প লক্ষণ-যুক্ত মটরগাছ নিয়া প্রজন পরীক্ষা করেন। ইহাকে **ত্রি-লক্ষণ সঙ্করায়ণ** বা **ট্রাইহাইব্রিড ক্রস (Trihybrid cross)** বলা হয়। মেণ্ডেল তিনের বেশি অর্থাৎ অনেক জোড়া বিকল্প লক্ষণ-যুক্ত মটরগাছ নিয়াও প্রজন পরীক্ষা করেন। ইহাদের **বহু-লক্ষণ সঙ্করায়ণ** বা **মাল্‌টি-হাইব্রিড ক্রস (Multihybrid cross)** বলে। ত্রি-লক্ষণ সঙ্করায়ণে F_2-জনুতে আট রকম মটরগাছ পাওয়া যায়। অতএব, দেখা যাইতেছে, বিকল্প লক্ষণজোড়ার সংখ্যা যতই বাড়ে, F_2-জনুতে ততই বেশি বিভিন্ন রকম বংশধর উৎপন্ন হয়। বিকল্প লক্ষণজোড়ার সংখ্যা যদি n ধরা হয়, তবে F_2-জনুতে 2^n-সংখ্যক বিভিন্ন রকম বংশধর উৎপন্ন হইবে। এক-লক্ষণ সঙ্করায়ণে n-এর মান 1। অতএব, F_2-জনুতে $2^1=2$ রকম বংশধর উৎপন্ন হয়। তেমনিভাবে, দ্বি- এবং ত্রি-লক্ষণ, সঙ্করায়ণে যথাক্রমে $2^2=4$ এবং $2^3=8$ রকম বংশধর উৎপন্ন হয়।

মেণ্ডেল প্রতিটি প্রজন-পরীক্ষায় F_2 বা F_3 জনু পর্যন্ত বংশধর উৎপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; তিনি পরবর্তী আরও অনেক জনু (F_4, F_5...ইত্যাদি) পর্যন্ত বংশধর উৎপন্ন করেন। F_2-র পরবর্তী সমস্ত জনুতে তিনি সমস্ত হেটারোজাইগাস উদ্ভিদ হইতে F_2-র মতো অনুপাতে বিভিন্ন রকম বংশধর পান। দ্বি-লক্ষণ, ত্রি-লক্ষণ এবং বহু-লক্ষণ সঙ্করায়ণের পরীক্ষার ফলাফল হইতে তিনি বংশগতির দ্বিতীয় একটি সূত্র প্রবর্তন করেন। ইহা মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র (Mendel's second law) নামে পরিচিত। এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, যদি দুইটি জনিতৃ-জীবের মধ্যে দুই অথবা তাহার বেশি জোড়া বিকল্প লক্ষণের পার্থক্য থাকে, তবে প্রতি জোড়া লক্ষণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে (অর্থাৎ, অন্য লক্ষণগুলির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখিয়া) বংশপরম্পরায়

প্রবাহিত হয়। যেমন, দীর্ঘ বনাম খর্ব কাণ্ড এবং গোল বনাম কুঞ্চিত বীজ— এই দুই জোড়া লক্ষণের যে কোনও জোড়া (ধরা যাউক, গোল বনাম কুঞ্চিত বীজ) অন্য জোড়া লক্ষণের অর্থাৎ দীর্ঘ বনাম খর্ব কাণ্ডের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া অপত্য উদ্ভিদে প্রবাহিত হয়। সেইজন্য, F_2-জনুতে 74 পৃষ্ঠায় বর্ণিত চার ধরনের অপত্য উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বক্তব্যের প্রকৃতি অনুসারে, মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রকে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্তিকরণ সূত্র (**Law of independent assortment**) বলা হয়।

মেণ্ডেলের সূত্রগুলি পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে নানা জীবের ক্ষেত্রে এইরকম কৃত্রিম প্রজননের পরীক্ষা করা হইতে থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, মেণ্ডেলের সূত্রগুলি মানুষ-সহ সমস্ত জীবের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। জনিতৃ-জীবের প্রকট লক্ষণগুলি জানা থাকিলে, কোনও সঙ্করায়ণ পরীক্ষার ফলে কি ধরনের বংশধর উৎপন্ন হইবে, তাহা আগে অনুমান করা যায়। ভুট্টা, সুগন্ধী মটর (Sweet pea), ড্রসোফিলা (*Drosophila*) নামক ফলের মাছি (Fruit fly), নিউরোস্পোরা (*Neurospora*) নামের ছত্রাক, ধান, গম ইত্যাদি শস্য-উদ্ভিদ, মুরগি, শুয়ার, গরু, গিনিপিগ ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী নিয়া নানারকম প্রজনন পরীক্ষা করার ফলে, ইহাদের অনেক প্রকট ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণ জানা গিয়াছে। বিভিন্ন পরিবারে বংশপরম্পরায় বংশধরদের লক্ষ্য করিয়া মানুষের ক্ষেত্রেও এই-রকম অনেক প্রকট ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণ জানা সম্ভব হইয়াছে। নিচের তালিকায় কয়েকটি জীবের কতকগুলি প্রকট ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণের তালিকা দেওয়া হইল।

জীবের নাম	প্রকট লক্ষণ	প্রচ্ছন্ন লক্ষণ
ভুট্টা	হলুদ রঙের দানা	সাদা রঙের দানা
সুগন্ধী মটর	লম্বা পরাগরেণু	গোল পরাগরেণু
ড্রসোফিলা (*Drosophila*)	ডোরা কাটা দেহ	কালো রঙের দেহ
	সাধারণ ডানা	ক্ষয়প্রাপ্ত (Vestigeal) ডানা
বিড়াল	খাটো লোম	লম্বা লোম
ঘোড়া	কালো রঙ	বাদামী রঙ
ভেড়া	সাদা লোম	কালো লোম
শুয়ার	জোড়া খুর	সাধারণ খুর
গিনিপিগ (Guineapig)	কালো	সাদা
মানুষ	চোখের সাধারণ রঙ	চোখের অ্যালবিনো (Albino) বা ফ্যাকাশে লাল (Pink) রঙ
	কোঁকড়ানো চুল	খাড়া চুল
	কালো রঙের চুল	হাল্কা রঙের চুল
	সাধারণ রঙের চামড়া	সাদা বা অ্যালবিনো চামড়া

খর্ব কাণ্ড-যুক্ত ও কুঞ্চিত বীজ উৎপন্নকারী—এই দুই ধরনের শুদ্ধ-লক্ষণ-যুক্ত মটরগাছ নিয়াছিলেন। আগের পরীক্ষার মতো, এই দুই ধরনের মটরগাছের মধ্যে ইতর-পরাগযোগ ঘটানোর ফলে, F_1-জনুতে উৎপন্ন সমস্ত মটরগাছই দীর্ঘ কাণ্ড এবং গোল বীজ-যুক্ত হয়। ইহার পর তিনি F_1-জনুর মটরগাছগুলির স্বপরাগযোগ ঘটান। ফলে, F_2-জনুতে তিনি মোট চার রকমের উদ্ভিদ দেখিতে পান ; যেমন—(1) দীর্ঘ কাণ্ড ও গোল বীজ-যুক্ত, (2) দীর্ঘ কাণ্ড ও কুঞ্চিত বীজ-যুক্ত, (3) খর্ব কাণ্ড ও গোল বীজ-যুক্ত এবং (4) খর্ব কাণ্ড ও কুঞ্চিত বীজ-যুক্ত। এই চার রকমের উদ্ভিদ যথাক্রমে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতে উৎপন্ন হয়।

দ্বি-লক্ষণ সঙ্করায়ণের পর মেণ্ডেল তিন জোড়া বিকল্প লক্ষণ-যুক্ত মটরগাছ নিয়া প্রজন পরীক্ষা করেন। ইহাকে **ত্রি-লক্ষণ সঙ্করায়ণ** বা **ট্রাইহাইব্রিড ক্রস (Trihybrid cross)** বলা হয়। মেণ্ডেল তিনের বেশি অর্থাৎ অনেক জোড়া বিকল্প লক্ষণ-যুক্ত মটরগাছ নিয়াও প্রজন পরীক্ষা করেন। ইহাদের **বহু-লক্ষণ সঙ্করায়ণ** বা **মাল্‌টি-হাইব্রিড ক্রস (Multihybrid cross)** বলে। ত্রি-লক্ষণ সঙ্করায়ণে F_2-জনুতে আট রকম মটরগাছ পাওয়া যায়। অতএব, দেখা যাইতেছে, বিকল্প লক্ষণজোড়ার সংখ্যা যতই বাড়ে, F_2-জনুতে ততই বেশি বিভিন্ন রকম বংশধর উৎপন্ন হয়। বিকল্প লক্ষণজোড়ার সংখ্যা যদি n ধরা হয়, তবে F_2-জনুতে 2^n-সংখ্যক বিভিন্ন রকম বংশধর উৎপন্ন হইবে। এক-লক্ষণ সঙ্করায়ণে n-এর মান 1। অতএব, F_2-জনুতে $2^1=2$ রকম বংশধর উৎপন্ন হয়। তেমনিভাবে, দ্বি- এবং ত্রি-লক্ষণ, সঙ্করায়ণে যথাক্রমে $2^2=4$ এবং $2^3=8$ রকম বংশধর উৎপন্ন হয়।

মেণ্ডেল প্রতিটি প্রজন-পরীক্ষায় F_2 বা F_3 জনু পর্যন্ত বংশধর উৎপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; তিনি পরবর্তী আরও অনেক জনু (F_4, F_5…ইত্যাদি) পর্যন্ত বংশধর উৎপন্ন করেন। F_2-র পরবর্তী সমস্ত জনুতে তিনি সমস্ত হেটারোজাইগাস উদ্ভিদ হইতে F_2-র মতো অনুপাতে বিভিন্ন রকম বংশধর পান। দ্বি-লক্ষণ, ত্রি-লক্ষণ এবং বহু-লক্ষণ সঙ্করায়ণের পরীক্ষার ফলাফল হইতে তিনি বংশগতির দ্বিতীয় একটি সূত্র প্রবর্তন করেন। ইহা মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র (Mendel's second law) নামে পরিচিত। এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, যদি দুইটি জনিতৃ-জীবের মধ্যে দুই অথবা তাহার বেশি জোড়া বিকল্প লক্ষণের পার্থক্য থাকে, তবে প্রতি জোড়া লক্ষণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে (অর্থাৎ, অন্য লক্ষণগুলির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখিয়া) বংশপরম্পরায়

প্রবাহিত হয়। যেমন, দীর্ঘ বনাম খর্ব কাণ্ড এবং গোল বনাম কুঞ্চিত বীজ—এই দুই জোড়া লক্ষণের যে কোনও জোড়া (ধরা যাউক, গোল বনাম কুঞ্চিত বীজ) অন্য জোড়া লক্ষণের অর্থাৎ দীর্ঘ বনাম খর্ব কাণ্ডের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া অপত্য উদ্ভিদে প্রবাহিত হয়। সেইজন্য, F_2-জনুতে 74 পৃষ্ঠায় বর্ণিত চার ধরনের অপত্য উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বক্তব্যের প্রকৃতি অনুসারে, মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রকে **স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্তিকরণ সূত্র** (**Law of independent assortment**) বলা হয়।

মেণ্ডেলের সূত্রগুলি পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে নানা জীবের ক্ষেত্রে এইরকম কৃত্রিম প্রজননের পরীক্ষা করা হইতে থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, মেণ্ডেলের সূত্রগুলি মানুষ-সহ সমস্ত জীবের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। জনিতৃ-জীবের প্রকট লক্ষণগুলি জানা থাকিলে, কোনও সঙ্করায়ণ পরীক্ষার ফলে কি ধরনের বংশধর উৎপন্ন হইবে, তাহা আগে অনুমান করা যায়। ভুট্টা, সুগন্ধী মটর (Sweet pea), ড্রসোফিলা (*Drosophila*) নামক ফলের মাছি (Fruit fly), নিউরোস্পোরা (*Neurospora*) নামের ছত্রাক, ধান, গম ইত্যাদি শস্য-উদ্ভিদ, মুরগি, শুয়ার, গরু, গিনিপিগ ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী নিয়া নানারকম প্রজনন পরীক্ষা করার ফলে, ইহাদের অনেক প্রকট ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণ জানা গিয়াছে। বিভিন্ন পরিবারে বংশপরম্পরায় বংশধরদের লক্ষ্য করিয়া মানুষের ক্ষেত্রেও এই-রকম অনেক প্রকট ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণ জানা সম্ভব হইয়াছে। নিচের তালিকায় কয়েকটি জীবের কতকগুলি প্রকট ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণের তালিকা দেওয়া হইল।

জীবের নাম	প্রকট লক্ষণ	প্রচ্ছন্ন লক্ষণ
ভুট্টা	হলুদ রঙের দানা	সাদা রঙের দানা
সুগন্ধী মটর	লম্বা পরাগরেণু	গোল পরাগরেণু
ড্রসোফিলা (*Drosophila*)	ডোরা কাটা দেহ	কালো রঙের দেহ
	সাধারণ ডানা	ক্ষয়প্রাপ্ত (Vestigeal) ডানা
বিড়াল	খাটো লোম	লম্বা লোম
ঘোড়া	কালো রঙ	বাদামী রঙ
ভেড়া	সাদা লোম	কালো লোম
শুয়ার	জোড়া খুর	সাধারণ খুর
গিনিপিগ (Guineapig)	কালো	সাদা
মানুষ	চোখের সাধারণ রঙ	চোখের অ্যালবিনো (Albino) বা ফ্যাকাশে লাল (Pink) রঙ
	কোঁকড়ানো চুল	খাড়া চুল
	কালো রঙের চুল	হালকা রঙের চুল
	সাধারণ রঙের চামড়া	সাদা বা অ্যালবিনো চামড়া

মেণ্ডেলের সূত্রের বর্তমান ব্যাখ্যা (Present-day explanation of Mendel's laws)

বিভিন্ন লক্ষণের জন্য দায়ী উপাদানগুলি নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমেরনির্দিষ্ট অংশে থাকে। এইগুলিকে **জিন (Genes)** বলে। সচরাচর একটি জিন একটি লক্ষণের জন্য দায়ী। এইভাবে, জীবের যে সমস্ত লক্ষণ বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকটি এক-একটি জিনের উপর নির্ভর করে। ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। কাজেই, একজোড়া বিকল্প লক্ষণের জন্য দায়ী জিন দুইটিও জোড়া হিসাবে থাকে। গ্যামেট সৃষ্টির সময় ক্রোমোজোম দুইটি পৃথক হইয়া যায়। সুতরাং, গ্যামেটে জিন দুইটিও আলাদা হইয়া যায়। সেইজন্য, গ্যামেটে এক-একটি লক্ষণের জন্য দায়ী একটি করিয়া জিন থাকে। নিষেকের ফলে ক্রোমোজোম তথা জিন দুইটি জাইগোটে আবার মিলিত হয়।

যদিও যৌন জনন-কারী সমস্ত জীবের ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের সূত্রগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য, তবু এই সূত্রগুলি সামগ্রিকভাবে বংশগতি ব্যাখ্যা করিতে পারে না; অর্থাৎ, মেণ্ডেলের সূত্রগুলির অনেক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই সূত্রগুলি আজও অচল নয়। বস্তুতঃপক্ষে, মেণ্ডেলের সূত্রগুলিতেই বর্তমান সুপ্রজনন-বিদ্যার শুরু। সেইজন্য, মেণ্ডেলকে সুপ্রজনন-বিদ্যার জনক মানা হয়।

বিভিন্ন শস্য-উদ্ভিদ এবং গৃহপালিত প্রাণীর বংশগতির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হওয়ার ফলে, কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা উন্নতমানের অর্থাৎ বেশি ফলনশীল ও রোগাক্রমণ-প্রতিরোধকারী শস্য-উদ্ভিদ এবং বেশি দুধ-দেওয়া গাভী ইত্যাদি উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। মানুষের বংশগতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ফলে, এই সম্পর্কে মানব-মনের অনেক কুসংস্কার দূর হইয়াছে। বংশগতি সম্পর্কে জ্ঞান জীবের ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) এবং অভিব্যক্তির ব্যাখ্যায় সাহায্য করে।

———

6

অভিব্যক্তি
(Evolution)

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষের বেশি প্রজাতির প্রাণী এবং প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ শনাক্ত করা হইয়াছে। অনুমান করা যায়, এখনও অজ্ঞাত বিভিন্ন প্রজাতির জীবের সংখ্যাও কম নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় জগতের অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে কোনও-না-কোনও-ভাবে পারস্পরিক আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্র অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের অথবা লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের ; অর্থাৎ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় গোষ্ঠীভুক্ত জীবগুলি এক অথবা একাধিক পূর্বপুরুষ বা উদ্‌বংশীয় (Ancestor) হইতে বিভিন্ন ধারায়, যুগ যুগ ধরিয়া পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান জীবের সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞানীদের এই ধারণা কল্পনাপ্রসূত নয়—একাধিক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। **কোনও উদ্‌বংশীয় জীব হইতে জটিল ধারায় নূতন ধরনের জীবের উদ্ভব হয়, তাহাকে অভিব্যক্তি (Evolution) বা জীব-অভিব্যক্তি (Organic evolution) বলে।** অভিব্যক্তি একটি গতিশীল (Dynamic) প্রক্রিয়া ; কিন্তু ইহার গতি খুবই মন্থর। বহু বছর ধরিয়া ধীরে ধীরে জীবের অভিব্যক্তি ঘটে। ইহার ফলে সাধারণতঃ জটিলতা-বর্জিত জীব হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল জীবের সৃষ্টি হয়।

জীব-অভিব্যক্তির প্রমাণ (Evidences of organic evolution)

জীব-অভিব্যক্তির স্বপক্ষে এত বেশি যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ আছে যে, বর্তমান পরিচ্ছেদে তাহাদের সবগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আলোচনা করা হইল।

জীবাশ্ম হইতে প্রমাণ (Evidences from fossils)

বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত পাললিক শিলা(Sedimentary rocks)-র স্তর পাওয়া যায়, তাহাদের সবগুলিই একই সময়ে সৃষ্টি হয় নাই—বিভিন্ন

স্তর পৃথিবীর অতীত যুগের বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল। সেইজন্য, পাললিক শিলার এক-একটি স্তরকে এক-একটি ভূতত্ত্বীয় পর্যায়(Geological Periods)-রূপে চিহ্নিত করা হয়। এইরকম একাধিক ভূতত্ত্বীয় পর্যায়কে একত্রে একটি ভূতত্ত্বীয় যুগ (Geological era) ধরা হয়। নিচের তালিকায় বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় যুগ এবং উহাদের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায় ও উপ-পর্যায়(Epochs)-এর আনুমানিক বয়স* দেওয়া হইল।

যুগের নাম	পর্যায়ের নাম	উপপর্যায় বা ইপোক (Epochs)	বয়স
আর্কিওজ'য়িক (Archeozoic)			2,000,000,000+
প্যালিওজ'য়িক (Paleozoic)	(1) ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		500,000,000
	(2) অর্ডোভিসিয়ান (Ordoievian)		425,000,000
	(3) সিলুরিয়ান (Silurian)		360,000,000
	(4) ডিভোনিয়ান (Devonian)		325,000 000
	(5) কার্বোনিফেরাস (Carboniferous)		280,000,000
	(6) পারমিয়ান (Permian)		230,000,000
মেসোজ'য়িক Mesozoic)	(1) ট্রায়াসিক (Triassic)		205,000,000
	(2) জুরাসিক (Jurassic)		165,000,000
	(3) ক্রিটেসাস (Cretaceous)		135,000,000
সিনোজ'য়িক (Cenozoic)	(1) টার্-শিয়ারি (Tertiary)	(ক) প্যালিওসীন (Paleocene)	75,000,000
		(খ) ইওসীন (Eocene)	60,000,000
		(গ) অলিগোসীন (Ol gocene)	40,000,000
		(ঘ) মা'য়োসীন (Miocene)	30,000,000
		(ঙ) প্লিওসীন (Pliocene)	10,000,000
	(2) কোয়া-র্টার্নারি (Quarter-nary)	(ক) প্লিস্টোসীন (Pleisto-cene)	1,000 000
		(খ) সাম্প্রতিক (Recent)	10,000

অধিকাংশ পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তরে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহা-বশেষ অথবা দেহের ছাপ পাওয়া যায়। ইহাদের জীবাশ্ম (Fossils) বলে। সাধারণতঃ জীবের কঠিন অংশগুলি যেমন, উদ্ভিদের কোষ-প্রাকার, প্রাণীর

*তেজস্ক্রিয় (Radioactive) ইউরেনিয়াম (Uranium) ও কার্বনের সাহায্যে পাললিক শিলার বয়স নির্ধারণ করা হয়।

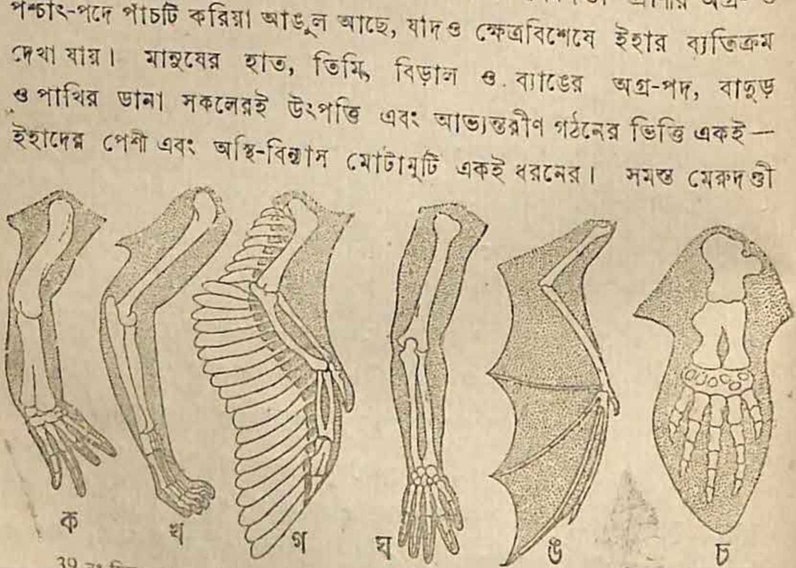
অস্থি, কৃত্তিক, আঁইশ ইত্যাদির আকৃতি জীবাশ্মে মোটামুটি অবিকৃত থাকে এবং ইহাদের সাহায্যে জীবাশ্মীভূত (Fossilised) জীবের দৈহিক গঠন এবং কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অনুমান করা যায়। দেহাবশেষ ছাড়াও পাললিক শিলায় পালক, ডানা, পত্র ইত্যাদির ছাপ পাওয়া যায়। পাললিক শিলার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের জীবের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত যে পরিমাণ জীবাশ্ম উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া জীব-জগতের অভিব্যক্তির মোটামুটি ধারণা করা যায়। যেমন—ডিপ্লোভার্টিব্রন (*Diplovertebron*), সেমুরিয়া (*Seymouria*) এবং আর্কিওপ্টেরিক্স (*Archeopteryx*)—এই তিনটি জীবাশ্মীভূত প্রাণীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ডিপ্লোভার্টিব্রনের দৈহিক গঠন অংশতঃ মৎস এবং অংশতঃ উভচরের মতো, সেমুরিয়ার মধ্যে উভচর ও সরীসৃপের মিলিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আবার, আর্কিওপ্টেরিক্স মূলতঃ পক্ষী হইলেও, ইহার অনেক বৈশিষ্ট্যই সরীসৃপের মতো। এই তিনটি প্রাণীর ক্ষেত্রে দুইটি ভিন্ন দলের প্রাণীর মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য থাকায়, অভিব্যক্তির ধারায় ইহাদের **অন্তর্বর্তী রূপ (Transitional forms)** হিসাবে গণ্য করা হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, মৎস্য ⟶ উভচর ⟶ সরীসৃপ ⟶ পক্ষী—এই নির্দিষ্ট ধারায় মেরুদণ্ডী প্রাণীর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

বর্তমান ঘোড়ার অভিব্যক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় জীবাশ্ম হইতে। **ইওহিপ্পাস** (*Eohippus*) নামক একধরনের পাঁচ আঙুল-যুক্ত চতুষ্পদী প্রাণীকে বর্তমান ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ধরা হয়। অভিব্যক্তির বিভিন্ন ধাপে উল্লিখিত উদ্বংশীয় প্রাণীর দৈহিক পরিবর্তন ঘটে; অগ্র-ও পশ্চাৎ-পদের আঙুলের সংখ্যা কমিতে থাকে এবং শেষে একটিমাত্র আঙুল খুরে পরিণত হয়। এই সম্পূর্ণ রূপান্তরের অন্তর্বর্তী রূপগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং টারশিয়ারি পর্যায়ের পাললিক শিলার—বিভিন্ন স্তরে উল্লিখিত অন্তর্বর্তী রূপের সমস্ত প্রাণীদের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। ফলে, ঘোড়ার অভিব্যক্তির প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

এ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত উদ্ভিদের জীবাশ্ম সংখ্যায় প্রাণীদের জীবাশ্ম হইতে কম। ফলে, জীবাশ্ম হইতে উদ্ভিদের অভিব্যক্তির সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। তবে আর্কিওপ্টেরিস (*Archeopteris*) নামক একধরনের ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদের গঠন অনেকটা ফার্ন ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মাঝামাঝি। কাজেই ইহা হইতে ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের অভিব্যক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান ও শারীরস্থানের প্রমাণ (Evidences from comparative morphology and anatomy)

বক, মটর, অতসী প্রভৃতি প্রজাপতিসম দলমণ্ডল-যুক্ত পুষ্পের গঠন একই রকম। অনুমান করা যায়, উহারা একই উদ্‌বংশীয়-জাত। সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে এবং মেরুদণ্ডটি একাধিক কশেরুকা (Vertebrae) দিয়া গঠিত। মৎস্য-জাতীয় প্রাণী ছাড়া অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্র- ও পশ্চাৎ-পদে পাঁচটি করিয়া আঙুল আছে, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মানুষের হাত, তিমি, বিড়াল ও ব্যাঙের অগ্র-পদ, বাদুড় ও পাখির ডানা সকলেরই উৎপত্তি এবং আভ্যন্তরীণ গঠনের ভিত্তি একই— ইহাদের পেশী এবং অস্থি-বিন্যাস মোটামুটি একই ধরনের। সমস্ত মেরুদণ্ডী



39 নং চিত্র—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অগ্র-পদের গঠনগত সাদৃশ্য: ক. ব্যাঙ; খ. বিড়াল; গ. পাখি; ঘ. মানুষ; ঙ. বাদুড়; চ. তিমি।

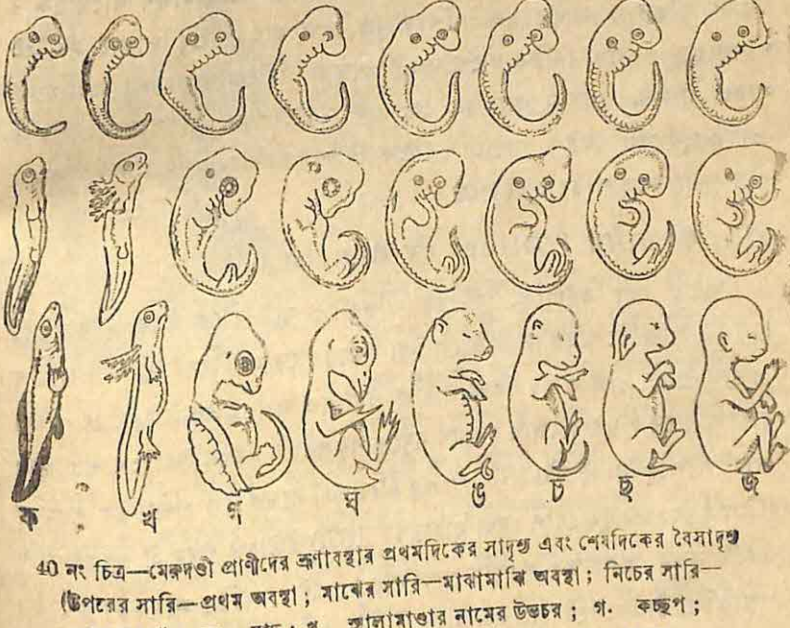
প্রাণীর পেশীবহুল হৃৎপিণ্ড অঙ্কদেশে, এবং ফাঁপা কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্র পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। এইভাবে দেখা যায়, সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহ এক সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত। সুতরাং, অনুমান করা যায়, ইহাদের অভিব্যক্তি এক সাধারণ সূত্রে গাঁথা।

তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্বের প্রমাণ (Evidences from comparative embryology)

প্রায় সমস্ত জীবের ভ্রূণ হইতে পূর্ণাঙ্গ জীবে রূপান্তরিত প্রাথমিক দশায় উদ্‌বংশীয়ের মতো দেখিতে একরকম অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। মস ও ফার্ণের লিঙ্গধর উদ্ভিদ (Gametophyte) গঠনের গোড়ার দিকে বহুকোষী সূত্রাকার

শেওলার মতো একধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহাকে প্রোটোনেমা (Protonema) বলে। এইজন্য, সূত্রাকার শেওলা হইতে মস ও ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে, এইরূপ মনে করা হয়। বাব্‌লা এবং বাব্‌লা-জাতীয় গাছের অপরিণত অবস্থায় একক পত্র থাকে। ক্রমশঃ ইহা যৌগপত্রে পরিণত হয়। একক পত্র-যুক্ত কোনও এক উদ্‌বংশীয় উদ্ভিদ হইতে বাব্‌লা-জাতীয় উদ্ভিদের উদ্ভব—ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের পরিস্ফুরণ হইতেও অভিব্যক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর জাইগোট ক্রমান্বয়ে ব্লাস্টুলা এবং গ্যাস্ট্রুলা নামের অবস্থার মধ্য দিয়া যায়। পরের অবস্থায় সকল ভ্রূণেই নার্ভ-তন্ত্র সৃষ্টি হয়। মৎস্য হইতে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণাবস্থার



40 নং চিত্র—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণাবস্থার প্রথমদিকের সাদৃশ্য এবং শেষদিকের বৈসাদৃশ্য (উপরের সারি—প্রথম অবস্থা ; মাঝের সারি—মাঝামাঝি অবস্থা ; নিচের সারি—শেষ অবস্থা) : ক. মাছ ; খ. স্যালামাণ্ডার নামের উভচর ; গ. কচ্ছপ ; ঘ. মুরগি ; ঙ. শুয়ার ; চ. গরু ; ছ. খরগোস ; জ. মানুষ।

প্রথমদিকে (40 নং চিত্র, উপরের সারি) ফুলকা-ছিদ্র (Gill-slits), দ্বি-কোষ্ঠ হৃৎপিণ্ড এবং অনেকগুলি অ্যাওর্টিক আর্চ (Aortic arches) থাকে। পূর্ণাঙ্গ মৎস্যে এইগুলি সব থাকিয়া যায়—ব্যাঙাচিরও ফুলকা থাকে, কিন্তু সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভ্রূণাবস্থার শেষের দিকে ফুলকা-ছিদ্র বিলুপ্ত হয়, অ্যাওর্টিক আর্চের সংখ্যা কমিয়া যায় এবং হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা তিনটি

(সরীসৃপের ক্ষেত্রে) এবং চারটি (পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে) হইয়া যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের ক্রমিক পরিস্ফুরণে এইরূপ সাদৃশ্য থাকায়, অনুমান করা হয় যে, সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী একই আদি উদ্‌বংশীয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভৌগোলিক বিস্তারণ হইতে প্রমাণ (Evidences from geographical distribution

দক্ষিণ আমেরিকার 965 কিলোমিটার পশ্চিমে গ্যালাপাগো দ্বীপপুঞ্জ (Galapagos Islands) সুদূর অতীতে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে ইহা ক্রমশঃ এই মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর খুব বেশি সাদৃশ্য দেখা যায়। শুধু তাহাই নয়, এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন দ্বীপে একই গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায়, অনুমান করা হয় যে, এই মহাদেশ ও দ্বীপপুঞ্জের উদ্ভিদ ও প্রাণীর পূর্বপুরুষ একই। মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, একই প্রজাতি ক্রমশঃ অন্য প্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ (Direct evidences)

আগে বলা হইয়াছে, জীবের অভিব্যক্তি ঘটে ধীরে ধীরে। কাজেই, কোনও ব্যক্তিবিশেষের জীবনকালে ইহা নজরে পড়ে না। সেইজন্য অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুবই কম। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্ততঃ একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর আগেও স্পারটিনা স্ট্রীকটা (*Spartina stricta*) নামক এক প্রজাতির শরগাছ (Cord grass) খুব বেশি দেখা যাইত। 1870 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ঐ অঞ্চলে আর একটি নূতন প্রজাতির শরগাছ দেখা যায়। এই প্রজাতির নামকরণ করা হয় 'স্পারটিনা টাউন্‌সেণ্ডী' (*Spartina townsendi*)। নূতন প্রজাতির মূল বেশি লম্বা হওয়ায়, ইহারা 'স্ট্রীকটা'-প্রজাতি অপেক্ষা জোয়ার-ভাটার টান বেশি প্রতিরোধ করিতে পারে। বেশ কয়েক বছর পর ঐ অঞ্চলে 'স্ট্রীকটা'-প্রজাতির উদ্ভিদের পরিবর্তে 'টাউন্‌সেণ্ডী'-প্রজাতির উদ্ভিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা যায়। বর্তমানে ঐ অঞ্চলে 'স্ট্রীকটা'-প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায় না বলিলেই চলে। কাজেই, এই উদাহরণটি জীব-অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে ধরা যায়।

অভিব্যক্তি কিভাবে ঘটে (How evolution takes place)

একটি প্রজাতি হইতে অন্য একটি প্রজাতির সৃষ্টি অভিব্যক্তির মূল কথা। 1809 খ্রীষ্টাব্দে অভিব্যক্তির সর্বপ্রথম অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞান-ভিত্তিক মতবাদ দেন জঁ। ব্যাপ্‌টিস্ট লামার্ক (Jean Baptiste Lamarck)। লামার্কের মতে, কোনও জীবের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিলে উহার দৈহিক পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। পুরাতন পরিবেশে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি প্রয়োজন অনুসারে বেশি ব্যবহৃত হইত, নূতন পরিবেশে সেই অঙ্গগুলির ব্যবহার না-ও হইতে পারে। নূতন পরিবেশে যে অঙ্গগুলি বেশি ব্যবহৃত হয়, সেইগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইতে থাকে এবং এই পরিবর্তন ও রূপান্তর বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে, যে অঙ্গগুলি বেশি ব্যবহৃত হয় না, সেগুলি ক্রমশঃ অকেজো হইয়া যায় এবং শেষে লুপ্ত হয়। লামার্কের মতে, জিরাফ-এর লম্বা গলার ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া হয় যে, জিরাফের উদ্‌বংশীয় হরিণ-জাতীয় তৃণভোজী প্রাণী। এইধরনের প্রাণী যে পরিবেশে বসবাস করিত, সেই পরিবেশে তৃণ ও বীরুৎ-জাতীয় উদ্ভিদের ক্রমশঃ ঘাট্‌তি ঘটায়, ইহারা অপেক্ষাকৃত উঁচু গাছের পাতা খাইতে শুরু করে। উঁচু গাছের ডালপালার নাগাল পাওয়ার জন্য, ক্রমশঃ ঐ হরিণ-জাতীয় প্রাণীর গলা এবং অগ্র-পদ দুইটি লম্বা হইতে থাকে। এইভাবে বর্তমান লম্বা-গলা জিরাফের উদ্ভব হইয়াছে। লামার্কের মতবাদের স্বপক্ষে প্রযুক্ত উদাহরণগুলি আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নয়। ইহার প্রধান কারণ, নানা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, কোনও একটি বা একাধিক জন্তুতে আহৃত (Acquired) কোনও গুণ বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয় না।



41 নং চিত্র—লামার্ক।

লামার্কের মতবাদের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে **চার্লস ডারুউইন (Charles Darwin)** এবং **অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russell Wallace)** পৃথক পৃথক গবেষণার ফলে অভিব্যক্তির নূতন মতবাদ দেন (1858 খ্রীষ্টাব্দে)। ডারুউইন প্রায় দশ বছর ধরিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে

বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারণ, স্বভাব এবং বসতির উপর গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলশ্রুতি—'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা **প্রজাতির উদ্ভব (Origin of species by natural selection)**'—নামক পুস্তক। ডারউইনের মতবাদকে **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection) বলা হয়। এই মতবাদই বর্তমান অভিব্যক্তিবাদের মূল ভিত্তি।



42 নং চিত্র—ডারউইন।

ডারউইনের মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নিচে আলোচনা করা হইল।

(ক) কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটিলে, যে-কোনও জীব একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অসংখ্য বংশধর উৎপন্ন করিতে পারে। ফলে, এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, যখন ঐ সীমিত স্থানে সমস্ত বংশধরদের ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় না।

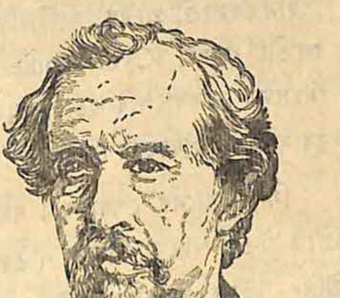
(খ) বলা বাহুল্য, তাহা হয় না। কারণ, সীমিত স্থানে প্রধানতঃ খাদ্যের জন্য উৎপন্ন বংশধরগুলিকে সংগ্রাম করিতে হয়। ইহাকে বলা হয় **জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence)**। জীবন-সংগ্রামের ফলে অল্প কিছু-সংখ্যক **যোগ্যতম (Fittest)** বংশধরমাত্র জীবিত থাকে এবং অধিকাংশ দুর্বল বংশধর লুপ্ত হইয়া যায়।

(গ) যে সমস্ত বংশধর জীবিত থাকে, তাহাদের মধ্যেও সকলে সমান হয় না; প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ, জনিতৃ-প্রজাতি হইতে উৎপন্ন 'ক' এবং 'খ' এই দুইটি বংশধরের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনও পার্থক্য দেখা না গেলেও, খুব সামান্য পার্থক্য থাকিবেই। এই পার্থক্যকে **পরিবৃত্তি (Variation)** বলে। পরিবৃত্তি যদি কোনও বংশধরকে ঐ পরিবেশে মানাইয়া চলিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে, তাহা হইলে উহাকে **অনুকূল পরিবৃত্তি (Favourable variation)** বলে। অনুকূল পরিবৃত্তি ক্রমশঃ বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। এইভাবে বেশ কয়েক জন্মের পর, পরিবৃত্তির আকার এত বড় হইয়া দাঁড়ায় যে, উদ্বংশীয় জীব এবং বংশধরের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি নজরে পড়ে। তখন ঐরকম বংশধরকে উদ্বংশীয়ের সমপ্রজাতিরূপে গণ্য না করিয়া নূতন প্রজাতিরূপে ধরা হয়। যে সমস্ত বংশধরের মধ্যে অনুকূল পরিবৃত্তির সৃষ্টি হয় না অথবা তুলনামূলকভাবে কম সৃষ্টি

হয়, সেইগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয় **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection)। প্রাকৃতিক নির্বাচন সাধারণতঃ চালনীর কাজ করে; অর্থাৎ, যোগ্যতম বংশধরদের ধরিয়া রাখে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন নিঃসন্দেহে অভিব্যক্তিতে প্রধান অংশ নেয়। কিন্তু সমস্ত অনুকূল পরিবৃত্তি বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়—ডারুউইনের এই ধারণা ভ্রান্ত। পরিবৃত্তি প্রধানতঃ দুই রকমের—(ক) **পরিবেশগত পরিবৃত্তি** (Variation due to environment) এবং (খ) **জিনগত পরিবৃত্তি** (Genetic variation)। প্রথম ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে একই প্রজাতির দুইটি জীবের মধ্যে পরিবৃত্তি দেখা যায়। যেমন—একই প্রজাতির দুইটি উদ্ভিদের একটি আলোকিত স্থানে এবং অন্যটি ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় উৎপন্ন হইলে, শেষোক্ত স্থানে উৎপন্ন উদ্ভিদটির পত্র অপেক্ষাকৃত সরু এবং কাণ্ড লম্বা হয়। ইহা পরিবেশগত পরিবৃত্তি। পরিবেশগত পরিবৃত্তি বংশপরম্পরায় দেখা যায় না। কারণ, ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় উৎপন্ন উদ্ভিদের বংশধরগুলিকে আলোকিত স্থানে রাখিলে পুনরায় সবল উদ্ভিদের মতো বৃদ্ধি পায়।

বংশগতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে, জীবের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়, সেইগুলি ক্রোমোজোমের অন্তর্গত জিনের উপর নির্ভর করে। কোনও পরিবৃত্তি জিনের পরিবর্তনের ফলে ঘটিলে, তাহাকে জিনগত পরিবৃত্তি বলা হয়। জিনগত পরিবৃত্তির অপর নাম **মিউটেশান** (Mutation)। মিউটেশান বংশধরের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং ইহা প্রজাতির অভিব্যক্তিতে উল্লেখযোগ্য অংশ নেয়। মিউটেশান সমস্ত জীবের মধ্যে কম-বেশি সবসময় ঘটে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে যে ধরনের মিউটেশান জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় যথাযথ সাহায্য করে, সেইগুলি কালক্রমে নূতন প্রজাতি গঠনেও অংশ গ্রহণ করে। ডারুউইন-রাসেলের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর, 1901 খ্রীষ্টাব্দে হিউগো ডি ভ্রিজ (Hugo De Vries) অভিব্যক্তির **মিউটেশান মতবাদ**



43 নং চিত্র—ডি ভ্রিজ।

(Mutation theory) প্রবর্তন করেন। অবশ্য, মিউটেশান সম্পর্কে ডি ফ্রিজের ধারণা এবং বর্তমান ধারণার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

অভিব্যক্তির ধারা (Course of evolution)

পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিভাবে প্রথম জীবনের সূত্রপাত ঘটে, তাহা জানা যায় নাই। তবে, সম্ভবতঃ কোনও অজৈব পদার্থ হইতে দৈবাৎ কোনওক্রমে প্রোটোপ্লাজ্‌ম সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্যাম্‌ব্রিয়ান পর্যায়ের আগে ভালভাবে সংরক্ষিত কোনও জীবাশ্ম পাওয়া যায় না। কাজেই, ঠিক কোন সময়ে জীবনের শুরু হয়, তাহাও অনুমান-সাপেক্ষ। তবে, নিশ্চতভাবে বলা যায়, জীবনের শুরু হইয়াছিল জলে (কারণ, একশ' কোটি বছর আগে স্থলের পরিবেশ জীবনধারণের অনুকূলে ছিল না)। এবং এককোষী, স্বভোজী জীব পৃথিবীর আদিমতম জীব। ক্যাম্‌ব্রিয়ান পর্যায়ে অল্প কিছুসংখ্যক শেওলা এবং বেশির ভাগ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে ট্রাইলোবাইট (Trilobites), ইউরিপ্‌টেরিড্‌স (Eurypterids) বা সামুদ্রিক বিছা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অর্ডওভিসিয়ান পর্যায়ে বিভিন্ন দলের অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়। এই পর্যায়ের শেষাশেষি প্রথম অস্ট্রাকোডার্‌ম্‌স (Ostracoderms) নামক চোয়াল-বিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানের ল্যাম্‌প্রে(Lampreys)-জাতীয় বৃত্তমুখী (Cyclostomes) প্রাণীরা ইহাদের উত্তরপুরুষ। অর্ডওভিসিয়ানের শেষাশেষি চোয়াল-যুক্ত মাছেদের আবির্ভাব ঘটে। এইসময়ে, খুব সম্ভব, নানাধরনের শেওলা-জাতীয় উদ্ভিদেরও আবির্ভাব হইয়াছিল।

সিল্যুরিয়ানের শেষাশেষি সময় হইতে ডিভোনিয়ানের সূচনায় উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় জগতে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। এইসময় শেওলা-জাতীয় উদ্ভিদ হইতে সাইলোফাইটেল্‌স (Psilophytales) নামক প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। ইহারা বর্তমান টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদের পূর্বপুরুষ। সাইলোফাইটেল্‌সের দেহ পত্রহীন এবং ইহাদের কাণ্ডে সুগঠিত কলাতন্ত্র, বিশেষতঃ সংবহন কলাতন্ত্র, দেখা যায় না। ক্রমশঃ এইধরনের উদ্ভিদ হইতে (অথবা শেওলা-জাতীয় উদ্ভিদ হইতে অন্য ধারায়) অন্য দুই ধরনের টেরিডোফাইটা লাইকোপড (Lycopods) এবং ফার্ণের উৎপত্তি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ কার্বোনিফেরাসে স্থলজ উদ্ভিদের মধ্যে উল্লিখিত দুই ধরনের উদ্ভিদের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহাদের জীবাশ্ম-ই বর্তমান পৃথিবীর কয়লার

উৎস। সেইজন্য, কার্বোনিফেরাস পর্যায়কে অঙ্গার-যুগ(Coal age)-রূপে
চিহ্নিত করা হয়। স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম স্থলজ
মেরুদণ্ডী প্রাণী উভচরের আবির্ভাব ঘটে। মৎস্য হইতে উভচর প্রাণীর
অভিব্যক্তির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থলে অভিযোজনের জন্য উভচরের
দেহে ফুলকার পরিবর্তে ফুসফুস এবং পাখনার বদলে পদের আবির্ভাব হয়।
কার্বোনিফেরাস পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ, বিশেষতঃ জল-ফড়িং (Dragon-
fly) এবং আরসোলা-জাতীয় পতঙ্গের প্রাধান্য দেখা যায়।

সম্ভবতঃ, পার্মিয়ান পর্যায়ে উভচর প্রাণী হইতে সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর
অভিব্যক্তি হয় এবং সমগ্র মেসোজ'য়িক যুগ, অর্থাৎ প্রায় দশ কোটি বছর
ধরিয়া সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যায়। সেইজন্য,
মেসোজ'য়িক যুগকে সরীসৃপের যুগ (Age of reptiles) বলে। তদানীন্তন
সরীসৃপদের মধ্যে ডিপ্‌লোডকাস (Diplodocus), ব্রাকিওসরাস (Brachio-
saurus), ট্রাকোডন (Trachodon), ব্রন্টোসরাস (Brontosaurus)
ইত্যাদি ডাইনোসর (Dinosaur) গোষ্ঠীর বৃহদাকার প্রাণী উল্লেখযোগ্য।
মেসোজ'য়িক যুগে সর্বপ্রথম সপুষ্পক উদ্ভিদের এবং মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি
পতঙ্গের উদ্ভব ঘটে।

মেসোজ'য়িক যুগের মাঝামাঝি সময়ে, সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণী হইতে দুইটি
ধারায়—একদিকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর এবং অন্যদিকে পক্ষীর উদ্ভব হয়। এই
সময় হইতে সপুষ্পক এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের প্রাধান্য দেখা যায়।

আনুমানিক মাত্র পনেরো লক্ষ বছর পূর্বে জীব-অভিব্যক্তির সর্বাপেক্ষা
উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মানুষের আবির্ভাব। 'বানর-জাতীয় প্রাণী মানুষের পূর্ব-
পুরুষ'—এই প্রবাদ অংশতঃ সত্য। যদিও বর্তমান চার ধরনের লেজ-বিহীন
বানর-জাতীয় প্রাণী-(ওরাংওটাং, গিবন, গোরিলা এবং শিম্পাঞ্জি)-র কোনটাই
মানুষের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ নয়; তবুও, অনুমান করা হয়, বানর-জাতীয় এক
উদ্‌বংশীয় হইতে বিভিন্ন ধারায় মানুষ এবং উল্লিখিত চার ধরনের প্রাণীর
অভিব্যক্তি ঘটে। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্যের প্রধান কারণ
তাহার অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের মস্তিষ্ক। উন্নততম মস্তিষ্কের অধিকারী
মানুষ তাই প্রগাঢ় স্মৃতিশক্তি, সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি এবং সঠিক ভাব-বিনিময়ের
একান্ত অধিকারী। মানুষের উদ্ভব-ই অভিব্যক্তির চরম পরিণতি নয়—
অভিব্যক্তি আজও চলিতেছে।

———

অভিযোজন
(Adaptation)

7

জীবেরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া থাকে ও বংশ-বৃদ্ধি করে। এই পরিবেশকে বসতি (**Habitat**) বলে। উটের স্বাভাবিক বসতি মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে। কিন্তু মাছের বসতি জলের মধ্যে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এইরকম দেখা যায়। যেমন—মরুভূমির বালুকাময় মাটি ফণিমনসা-জাতীয় গাছের স্বাভাবিক বসতি। আবার, পদ্মের বসতি জলে। বসতির পরিবর্তন হইলে জীব আদৌ বাঁচে না, কিংবা স্বাভাবিকভাবে বাঁচিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকার প্রধান উপাদানগুলি সব পরিবেশেই সমানভাবে পাওয়া যায় না। যেমন—আবহাওয়ার তারতম্য, খাদ্য ও জলের সহজপ্রাপ্যতা সব পরিবেশে সমান নয়। কাজেই, সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে পরিবেশ অনুযায়ী মানাইয়া চলিতে হয়। জীবের পক্ষে পরিবেশ অনুযায়ী এইরকম মানাইয়া চলার নাম **অভিযোজন** (Adaptation)। অভিযোজনের জন্য জীবের স্বভাবে ও দৈহিক গঠনে নানারকম পরিবর্তন ও রূপান্তর দেখা যায়। এই পরিবর্তন ও রূপান্তর পরিবেশের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবের ফলে হয়। নিচে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কয়েক ধরনের অভিযোজন সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptations of plants)

নিচের কয়েকটি অনুচ্ছেদে উদ্ভিদের কয়েক ধরনের অভিযোজন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

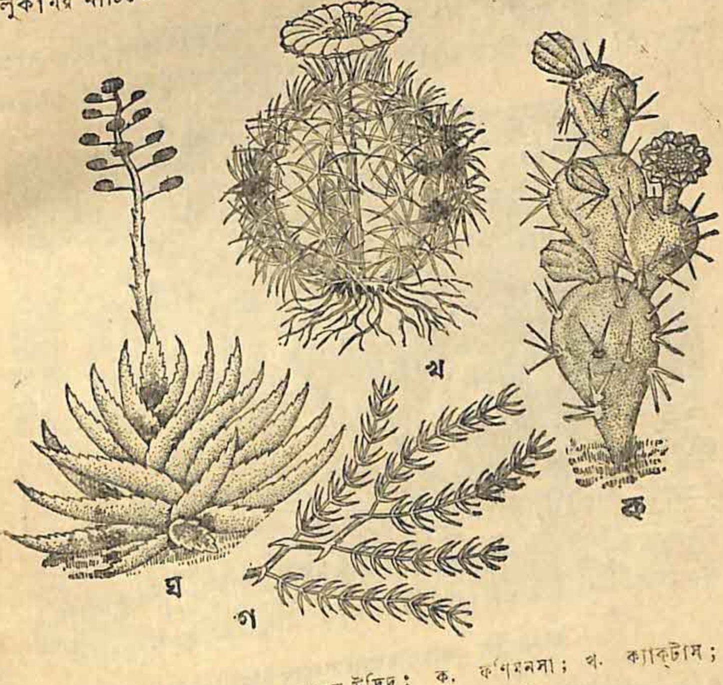
সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptations of mesophytes)

পুস্তকের প্রথম ভাগে আমগাছ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গাছ অন্যতম **সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ (Mesophytes)**। সাধারণ আবহাওয়ার উষ্ণতা ও আর্দ্রতায় এবং মাঝারি ধরনের জল-যুক্ত মাটিতে জন্মায় বলিয়া, ইহাদের এইরকম নামকরণ করা হইয়াছে। জাম, বট, শাল, সেগুন, জবা, ধুতুরা প্রভৃতি উদ্ভিদও এইধরনের। জীবন-ধারণের উপাদানগুলি পরিবেশ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় বলিয়া, সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদের

অভিযোজন তত প্রকট নয়। তবে, এই সমস্ত উদ্ভিদের মূল খুব লম্বা ও শাখা-প্রশাখা-যুক্ত; মূলে মূলত্র ও মূলরোম থাকে এবং মূলরোম দিয়া ইহারা মাটি হইতে জল শোষণ করে। ইহাদের কাণ্ড-ও সাধারণতঃ শক্ত, মূলের মতো শাখা-প্রশাখা-যুক্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাড়াভাবে থাকে। পত্রের আকার ও গঠন নানারকমের হইলেও, পত্র বেশ প্রসারিত। পত্রের উভয়-তলেই কম-বেশি পত্ররন্ধ্র থাক।

জাঙ্গল উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptations of xerophytes)

ফণিমনসা, তে-শিরা মনসা, উক্কা (*Yucca*), বাবলা, আকাশমণি, বুনো কুল, শিয়ালকাঁটা, রাংচিতা, শতমূলী, পাইন, দেওদার প্রভৃতি উদ্ভিদ মরুভূমির শুষ্ক বালুকাময় মাটিতে কিংবা পাহাড়-পর্বতের পাথুরে মাটিতে জন্মায়। ইহাদের



44 নং চিত্র—কয়েক রকম জাঙ্গল উদ্ভিদ: ক. ফণিমনসা; খ. ক্যাক্টাস; গ. শতমূলী (কাণ্ডের অংশ); ঘ. উক্কা।

জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes) বলে। স্থলজ উদ্ভিদ হইলেও, ইহাদের বিশেষ ধরনের অভিযোজন দেখা যায়। জাঙ্গল উদ্ভিদ যে পরিবেশে জন্মায়, সেখানকার প্রধান সমস্যা জল। ইহাদের মাটির অনেক নিচের স্তর হইতে জল শোষণ করিতে

হয়। সেইজন্য ইহাদের মূল খুব লম্বা। অনেক সময়, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, ইহারা সেই জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। জল-সঞ্চয়ের জন্য ইহাদের দেহে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা থাকে। শতমূলীর রসালো ও স্ফীত মূলে, ক্যাক্টাসের কাণ্ডে এবং নুনিয়া শাকের রসালো পত্রে এইভাবে জল সঞ্চিত থাকে। বাষ্পমোচনের ফলে দেহ হইতে যাহাতে বেশি জল বাহির হইয়া না যায়, সেইজন্য অধিকাংশ জাঙ্গল উদ্ভিদের পত্র **পত্রকণ্টক**(Spine)-এ রূপান্তরিত হয় এবং কাণ্ড চ্যাপ্টা, পুরু ও সবুজ রঙের হইয়া, পত্রের কাজ করে। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের পত্রের ত্বক্ কিউটিকূলের আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে এবং পত্রে নিবেশিত **পত্ররন্ধ্র (Sunken stomata)** দেখা যায়।

লবণাম্বু উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptations of halophytes)

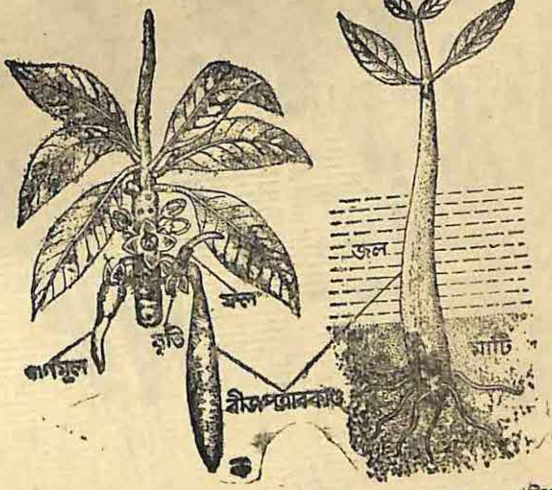
সুন্দরী, গরান, বানী প্রভৃতি যে সমস্ত উদ্ভিদ নদীর মোহনা কিংবা সমুদ্রের উপকূলবর্তী লোনা মাটিতে জন্মায়, তাহাদের **লবণাম্বু উদ্ভিদ (Halophytes)**



45 নং চিত্র—কয়েক ধরনের লবণাম্বু উদ্ভিদ।

বলে। ইহাদের অভিযোজন সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ অথবা জাঙ্গল উদ্ভিদ হইতে আলাদা। মাটিতে বেশি পরিমাণে লবণ থাকায়, অক্সিজেনের পরিমাণ কম। সেইজন্য ইহাদের মূলে বিশেষ ধরনের অভিযোজন দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইহাদের শাখামূল মাটির উপর খাড়াভাবে উঠিয়া আসে। সরু

সূচালো, গোঁজের মতো এই সমস্ত মূলের বায়ব অংশে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া মূলের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে এবং শ্বসনে সাহায্য করে। এই কারণে ইহাদের **শ্বাসমূল** (Pneumatophores) বলে। শ্বাসমূল ছাড়াও, অধিকাংশ লবণাম্বু উদ্ভিদে ঠেশমূল (Stilt root) দেখা যায়। কাণ্ডের নিচের দিকের পর্ব হইতে ঠেশমূল অস্থানিকভাবে উৎপন্ন হয় এবং তির্যকভাবে মাটিতে প্রবেশ করে। ঠেশমূলের জন্য জোয়ার-ভাটার টানে উদ্ভিদগুলি উপড়াইয়া যায় না। লবণাম্বু উদ্ভিদের পত্র সাধারণতঃ রসালো ও পুরু হয়। অধিকাংশ লবণাম্বু উদ্ভিদে আর একধরনের অভিযোজন দেখা যায়ঃ জনিতৃ-উদ্ভিদে লাগিয়া থাকা অবস্থাতেই ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। অঙ্কুরোদ্গমের সময় ভ্রূণমূল গদার মতো মোটা হইয়া বাড়িতে থাকে।



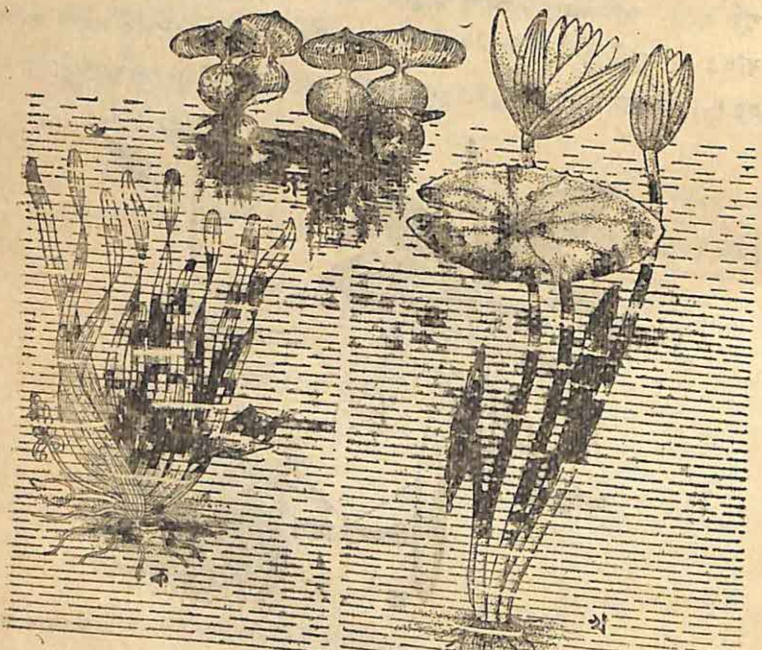
46 নং চিত্র—জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম : ক. জনিতৃ-উদ্ভিদে থাকার সময় ; খ. মাটিতে পড়ার পর।

শেষে, মোটা ভ্রূণমূলের ভারে ফলটি জনিতৃ-উদ্ভিদ হইতে খসিয়া পড়ে এবং খাড়াভাবে কাদায় গাঁথিয়া যায়। এইধরনের অঙ্কুরোদ্গমকে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম** (Viviparous germination) বলে। জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমের ফলে অযথা বীজের অপচয় হয় না।

জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptations of aquatic plants)

জলে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায়, তাহাদের জলজ উদ্ভিদ (Aquatic plants) বলা হয়। ইহাদের অভিযোজন স্থলজ উদ্ভিদ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। জলে

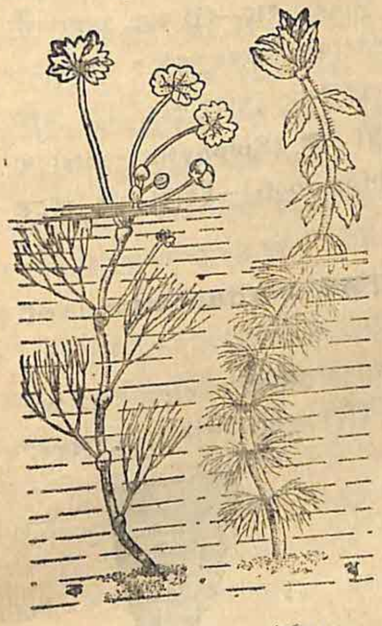
নিমজ্জিত অংশের সব অঙ্গ দিয়া জল শোষিত হয় বলিয়া, জলজ উদ্ভিদের মূল তেমন বড় হয় না। অনেক জলজ উদ্ভিদের মূলে মূলরোম থাকে না। কচুরিপানা, খুদিপানা ইত্যাদি ভাসমান উদ্ভিদের মূলে মূলত্র থাকে না; তবে, ইহার পরিবর্তে মূলজেব দেখা যায়। ঝাঁঝিতে আদৌ মূল হয় না। জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড শক্ত হয় না। ইহা সাধারণতঃ কন্দে পরিবর্তিত হয়। কাণ্ডে ও পত্রে প্রচুর পরিমাণে বায়ু-গহ্বর (Air cavity) থাকে। সেইজন্য এই অঙ্গগুলি স্পঞ্জের মতো নরম। বায়ু-গহ্বরের মধ্যে যে বায়ু থাকে, উহা একদিকে



47 নং চিত্র—কয়েক রকম জলজ উদ্ভিদ: ক. পাতাশেওলা; খ. শালুক; গ. কচুরিপানা।

যেমন উদ্ভিদকে প্লবতা (Buoyancy) দান করে, অর্থাৎ ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি উদ্ভিদের শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষের কাজে লাগে। পাতাশেওলা, পাতাঝাঁঝি প্রভৃতি উদ্ভিদের সমগ্র দেহ জলের ভিতর ডুবিয়া থাকে। ইহাদের পত্র সাধারণতঃ সরু ও ফিতার মতো লম্বা, অথবা কাটা-কাটা হয়। এইরকম পত্রে পত্ররন্ধ্র অথবা কিউটিকল-এর আবরণ থাকে না। পদ্ম, শালুক প্রভৃতি আংশিক জল-নিমগ্ন উদ্ভিদের পত্র বেশ বড়। এই পত্রে শুধু উপরের তলে কিউটিকল-এর আবরণ ও প্রচুর পরিমাণে পত্ররন্ধ্র

থাকে। কচুরিপানার বায়ুপূর্ণ পত্রবৃন্ত বেলুনের মতো ফুলিয়া থাকে। ইহা জলে ভাসমান উদ্ভিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিযোজন।



48 নং চিত্র—উভয়চর উদ্ভিদ :
ক. পালিক ; লিম্নোফাইলা।

পালিক ও লিম্নোফাইলা (*Limnophyla*) প্রভৃতি সমস্ত উদ্ভিদ জলের কিনারায় জন্মায়, তাহাদের উভয়চর উদ্ভিদ (**Amphibious plants**) বলা হয়। ইহাদের অনেকেরই দেহের অর্ধেক অংশ জলে ডুবিয়া থাকে এবং অবশিষ্ট অংশ জলের উপরে (অর্থাৎ বায়ুতে) থাকে। সেইজন্য, ইহাদের দুই রকমের পত্র দেখা যায়—জলে-ডোবা পত্রগুলি সরু সরু এবং জলের উপরের পত্রগুলি সাধারণ পত্রের মতো বড়।

পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptations of epiphytes)



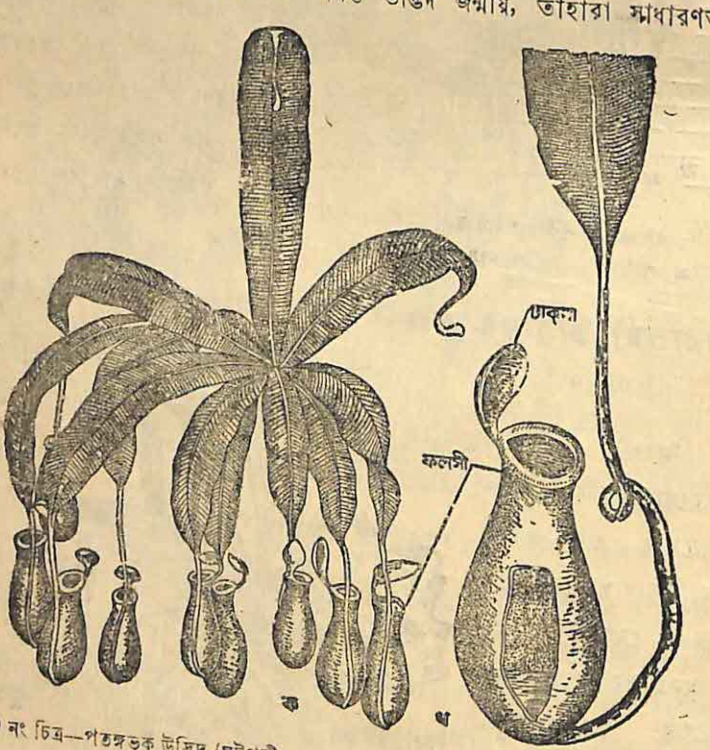
49 নং চিত্র—পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ।

নিরক্ষীয় বৃষ্টিস্নাত অরণ্যে প্রতিটি উদ্ভিদকে আলোর জন্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্য, এই-ধরনের অরণ্যে বড় বড় বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় ছোট ছোট বীরুৎ-শ্রেণীর অর্কিড (Orchids) দেখা যায়। ইহাদের **পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ** (**Epiphytes**) বলে। এইভাবে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ

সহজেই আলোক পায়। ইহারা, অবশ্য, আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের খাদ্যে অংশ গ্রহণ করে না। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদে দুই রকমের মূল দেখা যায়—(1) সরু দৃঢ়সংলগ্নী মূল (Clinging roots)—ইহারা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের বল্কলকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং সেখানে সঞ্চিত ময়লা হইতে খাদ্যোপাদান শোষণ করে, (2) মোটা এবং বায়ুতে ঝুলিয়া থাকা **পরাশ্রয়ী মূল** (Epiphytic roots) বা **বায়ব শোষক মূল** (Aerial absorbing roots)—ইহারা বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptations of insectivorous plants)

স্যাঁতসেঁতে মাটিতে অনেক সময় নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যোপাদান কম থাকায়, এইরকম মাটিতে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায়, তাহারা সাধারণতঃ



50 নং চিত্র—পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (ঘটপত্রী) : ক. কয়েকটি কলসী ; খ. একটি কলসী (কিছু অংশ কাটা, বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে)।

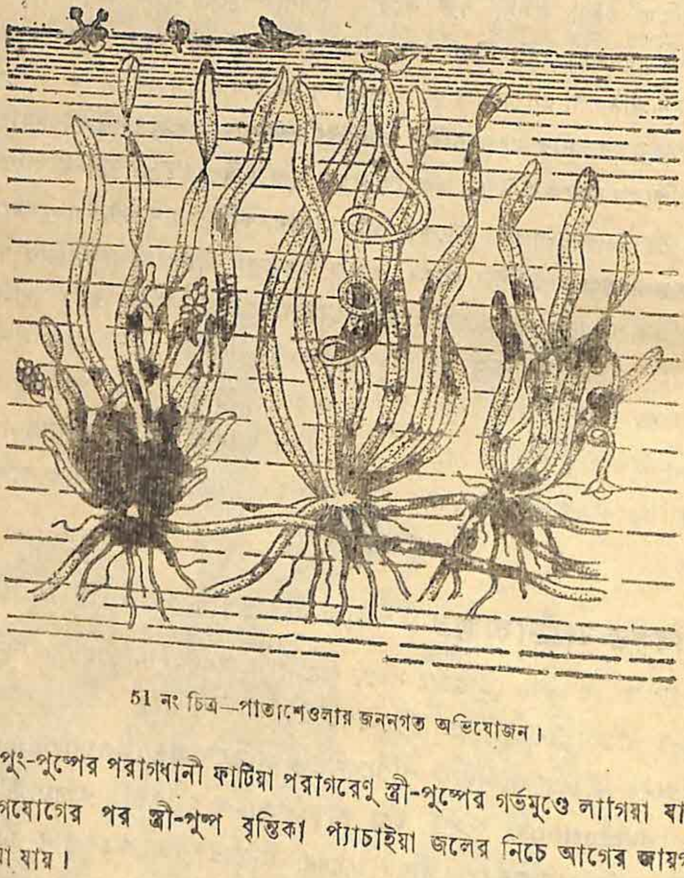
বিশেষ পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করে। এইধরনের উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি উদ্ভিদ ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের দেহ হইতে সরাসরি

প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য শোষণ করে। ইহাদের পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (Insectivorous plants) বলা হয়। ঘটপত্রী, সূর্যশিশির, পাতাঝাঁঝি প্রভৃতি উদ্ভিদ এইধরনের। পতঙ্গ ধরার জন্য, পরিবেশ অনুযায়ী, ইহাদের দেহে নানাধরনের অভিযোজন দেখা যায়। যেমন— ঘটপত্রী উদ্ভিদের পত্রের ফলক রূপান্তরিত হইয়া কলসী সৃষ্টি করে। কলসীর মুখে একটি ঢাকনা থাকে। ফলকের অগ্রভাগ পরিবর্তিত হইয়া এই ঢাকনার সৃষ্টি হয়। কলসীর মুখে একরকম আঠালো রস ক্ষরিত হয়। কীট-পতঙ্গ কলসীর মুখের উপর বসিলে, পিছ্‌লাইয়া কলসীর মধ্যে চলিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ ঢাকনাও বন্ধ হইয়া যায়। সূর্যশিশিরের ফলকের উপরে এবং কিনারায় সূক্ষ্ম কর্ষিকা (Tentacles) থাকে। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ ফলকের উপর বসিলে, কর্ষিকাগুলি গুটাইয়া পতঙ্গকে ফলকের মাঝখানে চাপিয়া ধরে। জলজ পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ পাতাঝাঁঝির সরু সরু খণ্ডিত পত্র-ফলকের কয়েকটি ছোট ছোট থলিতে পরিবর্তিত হয়। থলির অগ্রভাগে একটি ফাঁদি-দুয়ার (Trap door) থাকে। ছোট ছোট জলজ কীট-পতঙ্গ ফাঁদি-দুয়ার ঠেলিয়া থলির ভিতরে প্রবেশ করিলে, ফাঁদি-দুয়ার আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যায়; ফলে, পতঙ্গ আর বাহির হইতে পারে না। ইহার পর থলির মধ্যস্থ উৎসেচক কীট-পতঙ্গের দেহস্থ প্রোটীন পরিপাক করিয়া ফেলে।

জননগত অভিযোজন (Reproductive adaptations)

উপরে যে সমস্ত উদ্ভিদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, তাহাদের বিভিন্ন ধরনের অভিযোজন প্রধানতঃ পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সৃষ্ট। সেইজন্য, এইধরনের অভিযোজনগুলিকে **পরিবেশগত অভিযোজন** (**Environmental adaptations**) বলে। ইহা ছাড়া, আরও কতকগুলি কারণে উদ্ভিদে নানারকম অভিযোজন দেখা যায়। যেমন, জননের জন্য কতকগুলি উদ্ভিদে বিশেষ ধরনের অভিযোজন দেখা যায়। এইধরনের অভিযোজনকে **জননগত অভিযোজন** (**Reproductive adaptations**) বলে। পাতাশেওলা নামক জলজ উদ্ভিদের জননগত অভিযোজন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পাতাশেওলায় পুং ও স্ত্রী-পুষ্প পৃথক পৃথক উদ্ভিদে জন্মায়। ছোট ছোট পুং-পুষ্পগুলি স্প্যাডিক্স (Spadix) নামক বিশেষ ধরনের পুষ্পবিন্যাসের উপর সাজানো থাকে। স্ত্রী-পুষ্পগুলি লম্বা ও প্যাচানো বৃন্তিকা-যুক্ত। পুং-পুষ্প পুষ্পবিন্যাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলের উপরে উঠিয়া আসে এবং পুষ্পপুট বিস্তার করিয়া

ভাসিতে থাকে। স্ত্রী-পুষ্প পরিণত হইলে, বৃন্তিকার প্যাঁচ আল্‌গা হইয়া জলের উপরিতলের সংস্পর্শে আসে। স্ত্রী-পুষ্প সামান্য তৈলাক্ত হওয়ায়, জলের উপরিতলের পৃষ্ঠ-টানের পরিবর্তন হয়। ফলে, স্ত্রী-পুষ্পের নিকটে জলের তল অল্প অবনত হয়। ঐ স্থানে কয়েকটি পুং-পুষ্প আসিয়া জমা হয়। ইহার



51 নং চিত্র—পাতাশেওলায় জননগত অভিযোজন।

পর পুং-পুষ্পের পরাগধানী ফাটিয়া পরাগরেণু স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে লাগিয়া যায়। পরাগযোগের পর স্ত্রী-পুষ্প বৃন্তিকা প্যাঁচাইয়া জলের নিচে আগের জায়গায় চলিয়া যায়।

বিশিষ্ট অভিযোজন (Special adaptations)

অনেক উদ্ভিদের আত্মরক্ষার জন্য দেহে শাখাকণ্টক, পত্রকণ্টক প্রভৃতি ছাড়াও বিশেষ ধরনের অভিযোজন দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে **অনুকৃতি (Mimicry)** এবং সহকৃতি (Myrmecophily) উল্লেখযোগ্য। শত্রুকে প্রতারণা দ্বারা আত্মরক্ষা করার জন্য, আপাতদৃষ্টিতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ অনেক উদ্ভিদে কোনও কোনও অঙ্গের আকৃতি ও রঙ ভয়াবহ প্রাণী অথবা অখাদ্য জড়বস্তুর মতো হয়।

এই ধরনের অভিযোজনকে অনুকৃতি বলে। মেঘালয়ের শিলং এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং অঞ্চলে কচু-জাতীয় সর্প-উদ্ভিদ (*Arisoema*) অনুকৃতির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ইহার পুষ্পবিন্যাসের সবুজাভ চমসা (Spathe) ডোরা-কাটা অথবা ফুটকি-যুক্ত এবং দেখিতে অনেকটা গোক্ষুর সাপের ফণার মতো। বাতাসে দোদুল্যমান চমসাকে সাপের ফণা মনে করিয়া, প্রাণীরা ভয়ে পলাইয়া যায়। একধরনের গোল-আলু দেখিতে যেন মাটির ঢেলা; কাজেই, শাকাশী প্রাণীরা ইহাকে লক্ষ্য করে না।



52 নং চিত্র—সহকৃতি (সর্প-উদ্ভিদ)।

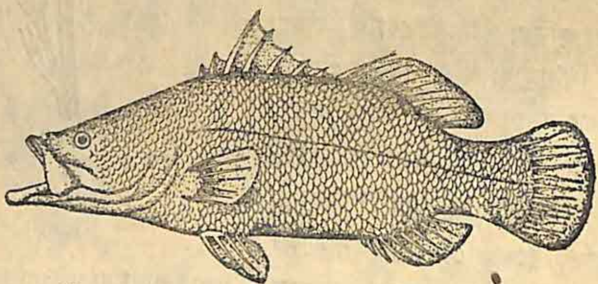
আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি গাছে একধরনের লাল পিঁপড়া বাস করে। ইহারা ছোট ছোট শাখার পাতাগুলিকে একসঙ্গে জুড়িয়া বাসা তৈয়ারি করিয়া থাকে। পিঁপড়ারা আক্রমণকারী প্রাণীকে দলবদ্ধভাবে দংশন করে। দংশনের জ্বালার ভয়ে শত্রু স্বভাবতঃই পলাইয়া যায়। নিশ্চিত আশ্রয়ের বিনিময়ে পিঁপড়ারা আশ্রয়দাতা বৃক্ষের দেহরক্ষী সৈনিকের মতো কাজ করে। আশ্রয়দানের বিনিময়ে পিঁপড়ার সাহায্যে এইরূপ আত্মরক্ষার উপায়কে সহকৃতি বলে। দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের বাব্‌লা-জাতীয় গাছে আরও উন্নতধরনের সহকৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই গাছের পত্রকণ্টক ফাঁপা এবং পত্রকে একধরনের খাদ্যবস্তু জমা হয়। পিঁপড়ারা এই খাদ্য খায় এবং পত্রকণ্টকের মধ্যে বাস করে।

প্রাণীর অভিযোজন (Adaptations of animals)

প্রাণীরাও জল এবং স্থলের নানা পরিবেশে বাস করে। পাখি, বাদুড় এবং নানাধরনের পতঙ্গ বায়ু-মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে উড়িতে পারে। বিভিন্ন পরিবেশ ও বসতি অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে নানারকমের অভিযোজন দেখা যায়। পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় প্রাণীদের প্রধান কয়েক রকম অভিযোজন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

জলচারী অভিযোজন (Aquatic adaptations)

ষষ্ঠ শ্রেণীতে মাছের বাহ্য-গঠন বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মাছের দেহ পটলের মতো (53 নং চিত্র)। দেহের এইরকম আকৃতি হওয়ার জন্য, ইহা সহজে জলের বাধা অতিক্রম করিয়া, জলের মধ্যে সাঁতার দিতে পারে। অতএব, মাছের এইরকম দেহাকৃতি জলে থাকার ও সাঁতার দেওয়ার উপযোগী। সেইজন্য, ইহা অন্যতম **জলচারী অভিযোজন** (Aquatic adaptations)। মাছ একান্তভাবে জলচারী প্রাণী। মুহূর্তের জন্যও ইহারা জলের বাহিরে আসে না। এমনকি, জলের বাহিরে আসিলে ইহারা মরিয়া যায়। সেইজন্য, মাছের কেবল দেহের আকৃতিই নয়, দেহের বিভিন্ন অংশের গঠন এবং সমস্ত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া জলে বাস করার সম্পূর্ণ উপযোগী। জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য মাছের ফুলকা থাকে। দেহের শেষভাগ পাশাপাশি আন্দোলিত করিয়া, ইহারা জলের মধ্যে আগাইয়া চলে। বক্ষ-পাখ্না এবং

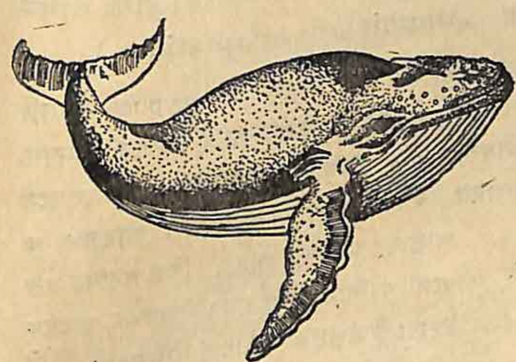


53 নং চিত্র—জলচারী প্রাণী(ভেট্‌কি মাছ)-র দেহের গঠন।

শ্রোণী-পাখ্না জলের কোনও নির্দিষ্ট তলে স্থির হইয়া ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। রুই ইত্যাদি মাছের দেহে পট্‌কা (Swim bladder) থাকে। পট্‌কা-ও জলে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে।

মাছ ছাড়া আরও অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণী জলে বাস করে। শুশুক, তিমি, সিন্ধু-গাভী (Sea-cow) প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী আমৃত্যু জলে বাস করে। অবশ্য, ফুস্‌ফুসের সাহায্যে বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে বলিয়া, শ্বাসত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য ইহাদের মাঝে মাঝে জলের উপরিতলে ভাসিয়া উঠিতে হয়। ইহাদের ফুস্‌ফুস্ খুব বড়। সেইজন্য, একবার প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার পর ইহারা অনেকক্ষণ জলের নিচে থাকিতে পারে। জলে সাঁতার দেওয়ার সুবিধার জন্য, এই সমস্ত প্রাণীর দেহ পটলের মতো হয়। ইহাদের অগ্র-পদের

আঙ্গুলগুলি চর্ম দ্বারা একসঙ্গে জোড়া (54 নং চিত্র)। এইরকম অগ্র-পদ সাঁতারে দাঁড়ের মতো সাহায্য করে। ইহাদের পশ্চাৎ-পদ নাই; লেজের শেষভাগে একটি অনুভূমিক "পুচ্ছ-পাখ্না"র মতো গঠন থাকে। দেহের এই অংশ কতকটা হালের মতো কাজ করে। ইহারা দেহের এই অংশকে উপর-নিচের দিকে আন্দোলিত করিয়া জলের মধ্যে অগ্রসর হয়। ইহাদের কর্ণছত্র থাকে

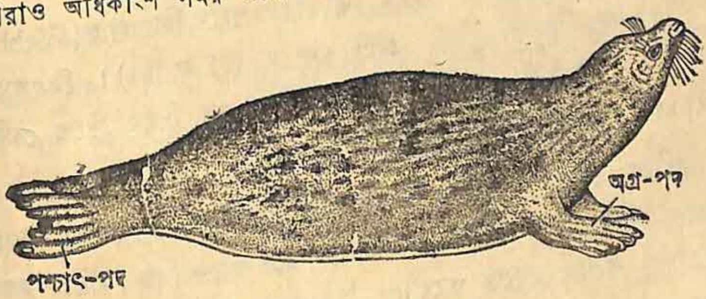


54 নং চিত্র—জলচারী প্রাণী তিমির দেহের গঠন।



55 নং চিত্র—পেঙ্গুইনের দেহের গঠন।

না। ইহার ফলে জলের বাধা কম হয়। এই সমস্ত প্রাণী জলেই বাচ্চা প্রসব করে এবং জন্মের কিছুক্ষণ পর হইতেই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিতে আরম্ভ করে। সীল (Seal), সিন্ধু-ঘোটক (Walrus) ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও অধিকাংশ সময় জলে বাস করে, তবে মাঝে মাঝে জল ছাড়িয়া



56 নং চিত্র—সীলের দেহের গঠন।

উপরে উঠে। ইহাদেরও কর্ণছত্র নাই, তবে পশ্চাৎ-পদ আছে। কিন্তু পশ্চাৎ-পদ দুইটির আঙুলগুলি (56 নং চিত্র), একসঙ্গে চর্মাবৃত হইয়া দেহের শেষ অংশের দুই পাশে এমনভাবে থাকে, যাহাতে ইহারা কতকটা হালের মতো কাজ

করে। পেঙ্গুইন পাখি (55 নং চিত্র)-ও অধিকাংশ সময় জলে থাকে। ইহাদের দেহ পটলের মতো; পশ্চাৎ-পদ দুইটি হাঁসের পায়ের মতো লিপ্তপাদ (Webbed feet), ডানা দুইটি পরিবর্তিত হইয়া দাঁড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারা, অবশ্য, স্থলে ডিম পাড়ে। সমুদ্রের কচ্ছপও একমাত্র ডিম পাড়ার জন্য ডাঙায় উঠা ছাড়া অন্যান্য সময় জলেই কাটায়। ইহাদেরও অগ্র-পদ ও পশ্চাৎ-পদ দাঁড়ের মতো।

উভয়চর অভিযোজন (Amphibious adaptations)

জলহস্তী (*Hippopotamus*), ভোঁদড়, হংসচঞ্চু (Platypus) ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী, হাঁস, পানকৌড়ি, পানডুবি ইত্যাদি পাখি এবং ঢোঁড়া সাপ, কুমির, কচ্ছপ ইত্যাদি সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণী সমান স্বচ্ছন্দে জলে এবং স্থলে থাকিতে পারে। ইহারা প্রধানতঃ খাদ্যের জন্য এবং অংশতঃ আত্মরক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য জলে যায়; কিন্তু জননের জন্য স্থলে আসিতে বাধ্য হয়। অতএব, স্বভাবে ইহারা **উভয়চর** (Amphibious)।



57 নং চিত্র—লিপ্তপাদ :
ক. হাঁস ; খ. ব্যাঙ।

সেইজন্য, ইহাদের দেহে কিছু কিছু জলচারী অভিযোজন দেখা যায়। যেমন, হংসচঞ্চু, ভোঁদড় এবং হাঁস (57 নং চিত্র-ক) ইত্যাদি প্রাণীর পদের আঙ্গুল পরস্পর পাতলা চর্ম দিয়া যুক্ত।

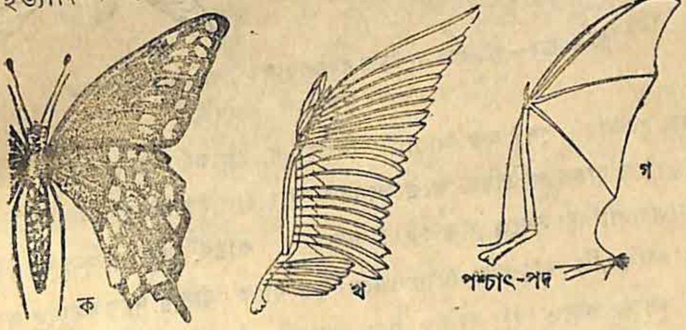
এইধরনের পদকে **লিপ্তপাদ** (Webbed feet) বলা হয় (57 নং চিত্র)। লিপ্তপাদের সাহায্যে ইহারা জল পিছন দিকে ঠেলিয়া দিয়া সামনের দিকে আগাইয়া চলে।

কুমিরের লেজ পাশাপাশি, এবং ভোঁদড়ের লেজ উপর-নিচে চাপা। ইহারা লেজকে যথাক্রমে পাশাপাশি এবং উপর-নিচে আন্দোলিত করিয়া জলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে পারে। কুমির এবং জলহস্তীর নাসারন্ধ্র ও চোখ এমন যে, দেহের বাকি সব অংশ জলে ডুবিয়া থাকিলেও, নাসারন্ধ্র এবং চোখ জলের উপরে থাকে। উপরন্তু, ইহারা জলের মধ্যে এবং জলের উপরে সমান স্বচ্ছন্দে দেখিতে পায়।

ব্যাঙেরাও স্বভাবে উভয়চর। কোলা ব্যাঙ লিপ্তপাদ(57 নং চিত্র-খ)-এর সাহায্যে জলে সাঁতার দেয়, স্থলেও লাফাইয়া চলে। কুনো ব্যাঙ অধিকাংশ সময় স্থলেই থাকে, কিন্তু জননের জন্য ইহাকে এবং অন্যান্য অধিকাংশ উভচর (Amphibia) প্রাণীকে জলে যাইতে হয়। কারণ, ইহারা জলে ডিম পাড়ে এবং জলেই ব্যাঙাচি সৃষ্টি হয়। লিপ্তপাদ-ই ইহাদের প্রধান অভিযোজন।

উড়ার অভিযোজন (Flying adaptations)

সপ্তম শ্রেণীতে আরসোলা, প্রজাপতি, মথ, মাছি, মশা ইত্যাদি পতঙ্গ, নানাধরনের পাখি এবং বাদুড় ও চামচিকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসমস্ত প্রাণীরা সকলেই উড়িতে পটু। বলা বাহুল্য, ইহারা সবসময়ের জন্য উড়ে না—খাদ্য, আশ্রয় ইত্যাদির জন্য ইহাদের সকলকেই মাটি, জল, গাছের ডাল ইত্যাদি কিছু-না-কিছুর উপর নামিয়া আসিতে হয়। সেইজন্য, **উড়ার**



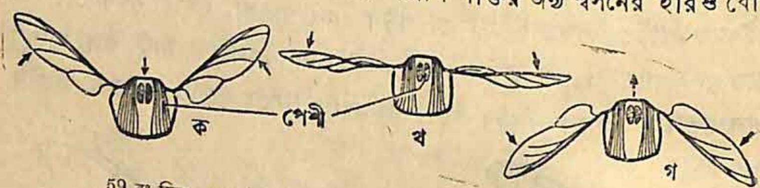
58 নং চিত্র—উড়ার অঙ্গ (ডানা) : ক. পতঙ্গ (প্রজাপতি) ; খ. পাখি ; গ. চামচিকা।

অভিযোজন (Flying adaptations) ছাড়া ইহাদের অন্যান্য অভিযোজনও হয়। এই অনুচ্ছেদে কেবল উড়ার অভিযোজন সম্বন্ধে বলা হইল। উড়ার জন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন **উড়ার অঙ্গ** (Organs of flight)।

অধিকাংশ পতঙ্গের বক্ষের দুই পাশ হইতে দুই জোড়া পাতলা ডানা উৎপন্ন হয় (58 নং চিত্র-ক)। পতঙ্গ ডানা দুই জোড়া ক্রমান্বয়ে উপর-নিচে আন্দোলিত করিয়া উড়িয়া থাকে (59 নং চিত্র)। পাখিদের অগ্র-পদ দুইটি রূপান্তরিত হইয়া ডানা (58 নং চিত্র-খ) সৃষ্টি হয়। বাদুড় ও চামচিকার অগ্র-পদও ডানায় রূপান্তরিত হয় (58 নং চিত্র-গ)। ইহাদের অগ্র-পদের আঙুলগুলি পরস্পর পাতলা চামড়া দ্বারা যুক্ত হইয়া ডানা সৃষ্টি হয়। ডানা-ই বাদুড় এবং পাখিদের উড়ার অঙ্গ। সাফল্যের সঙ্গে উড়ার জন্য দেহের ওজনও ন্যূনতম

হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য, কোনও পতঙ্গ বেশি বড় হয় না; বাদুড় এবং চামচিকারাও আকারে ছোট; পাখিরাও খুব বেশি বড় হয় না। উটপাখি (Ostrich), এমু (Emu) ইত্যাদি বড় বড় পাখি উড়িতে পারে না।

পাখিদের অস্থির মধ্যে অনেক বায়ু-গহ্বর থাকে। সেইজন্য ইহাদের অস্থি খুব হাল্কা। এইভাবে পাখিদের দৈহিক ওজন অনেক কম হয়। পাখি (60 নং চিত্র-গ) এবং বাদুড় (58 নং চিত্র-গ) ডানা উপর-নিচে সঞ্চালন করিয়া উড়িয়া থাকে। ইহাদের ডানা-সঞ্চালনকারী পেশীগুলি প্রধানতঃ বক্ষে অবস্থিত। বাদুড়ের, ও বিশেষ করিয়া পাখিদের, এই পেশীগুলি খুবই পুষ্ট হয়। তীব্রবেগে উড়ার জন্য বেশি শক্তির প্রয়োজন। বেশি শক্তির জন্য শ্বসনের হারও বেশি

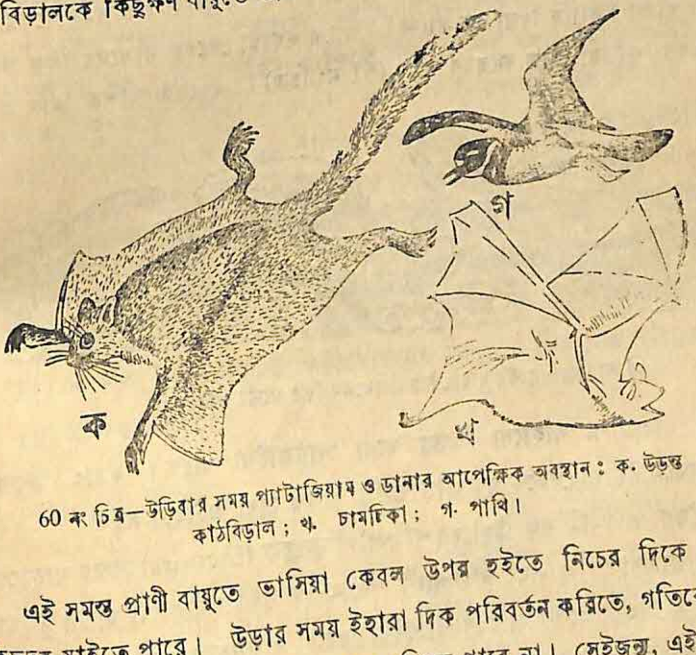


59 নং চিত্র—ক. হইতে গ. উড়ার সময় পতঙ্গের ডানার ক্রমিক অবস্থান (বক্ষের প্রস্থচ্ছেদে)।

হওয়া দরকার। সেই জন্য আবার বেশি করিয়া শ্বাসকর্ম করা প্রয়োজন। জোরে দৌড়াইলে মানুষ অতিরিক্ত অক্সিজেনের অভাবে হাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু তীব্রবেগে উড়িলেও পাখিরা সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। কারণ, ইহাদের ফুস্ফুস্ দুইটির সঙ্গে কতকগুলি বায়ু-থলি (Air sacs) যুক্ত থাকে। উড়ার সময় ফুস্ফুসে গৃহীত বায়ু ফুস্ফুস্ হইতে বায়ু-থলিতে এবং বায়ু-থলি হইতে ফুস্ফুসে—এইভাবে বায়ু চলাচল করে। উড়িবার সময় পাখিদের শ্বাসকর্ম এইভাবে চলিতে থাকে। ফলে, ইহাদের অক্সিজেনের অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না। বায়ু-থলিগুলি পাখিকে বায়ুতে ভাসিয়া থাকিতেও সাহায্য করে। পতঙ্গ, বাদুড় এবং পাখিদের উড়া ইহাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ, উড়িবার সময় ইহারা ইচ্ছামতো দিক পরিবর্তন করিতে, গতিবেগ হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে ও অনুভূমিক তলে চলিতে পারে এবং একবারে অনেক দূর পর্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। এইরকম উড়াকে **প্রকৃত উড়া** (True flight) বা **সক্রিয় উড়া** (Active flight) বলা হয়।

উড়ুক্কু মাছ, উড়ন্ত গিরগিটি এবং উড়ন্ত কাঠবিড়ালও উড়িতে পারে। তবে, ইহাদের ক্ষেত্রে উড়ার অভিযোজন পাখিদের মতো তেমন প্রকট নয়। সেইজন্য; ইহারা পাখিদের মতো উড়িতেও পারে না। উড়ুক্কু মাছের বক্ষ-পাখনা দুইটি খুবই বড় এবং উড়িবার অঙ্গ। উড়িবার সময় এই মাছ লাফ

দিয়া জল হইতে উপরে (বায়ুতে) উঠিয়া আসে এবং বক্ষপাখ্‌না দুইটি বিস্তার করিয়া দেয়। বড় বক্ষ-পাখ্‌না দুইটি এই মাছকে সাময়িকভাবে বায়ুতে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে ইহা, অবশ্য, শীঘ্রই আবার জলের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। উড়ন্ত গিরগিটির উড়িবার সময় দেহখণ্ডের দুই পাশে দুইটি অর্ধ-চক্রাকার পর্দার মতো অংশ সৃষ্টি হয়। এই পর্দা দুইটি গিরগিটিকে সাময়িকভাবে বায়ুতে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। উড়ন্ত কাঠবিড়ালেরও দেহের দুই পাশে **প্যাটাজিয়াম** (Patagium) নামক দুইটি পর্দা থাকে। উড়িবার সময় এই পর্দা দুইটি বিস্তৃত হইয়া (60 নং চিত্র-ক) কাঠবিড়ালকে কিছুক্ষণ বায়ুতে ভাসাইয়া রাখে।



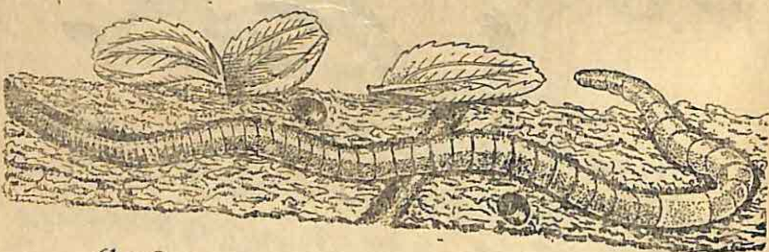
60 নং চিত্র—উড়িবার সময় প্যাটাজিয়াম ও ডানার আপেক্ষিক অবস্থান: ক. উড়ন্ত কাঠবিড়াল; খ. চামচিকা; গ. পাখি।

এই সমস্ত প্রাণী বায়ুতে ভাসিয়া কেবল উপর হইতে নিচের দিকে অল্প কিছুদূর যাইতে পারে। উড়ার সময় ইহারা দিক পরিবর্তন করিতে, গতিবেগের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে অথবা অনুভূমিক তলে চলিতে পারে না। সেইজন্য, এইরকম উড়াকে **নিষ্ক্রিয়ভাবে উড়া** (Passive flight) বা গ্লাইডিং (Gliding) বলা হয়।

গর্তবাসের অভিযোজন (Burrowing adaptations)

কেঁচো, ইদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণী মাটির নিচে গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। সেইজন্য ইহাদের দেহে মাটি খুঁড়িয়া গর্ত করা এবং গর্তের মধ্যে বাস করিবার জন্য বিশেষ অভিযোজন দেখা যায়। কেঁচো সাধারণতঃ ভিজা

মাটিতে গর্ত করে। ইহা উপরের নরম মাটির কোনও সূক্ষ্ম ফাঁকে দেহের সরু অগ্র-প্রান্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, গলবিল-অঞ্চল স্ফীত করে; ফলে, মাটির কণাগুলি সরিয়া যায়। মাটির অপেক্ষাকৃত গভীর স্তরে পৌছিয়া কেঁচো মাটি গিলিতে আরম্ভ করে। গেলা-মাটি অবশেষে কেঁচোর পায়ু দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং গর্তের মুখের কাছে "কেঁচো-মাটি", বা বিষ্ঠাকুণ্ডলী (Earthworm castings) হিসাবে জমা হয়। এইভাবে কেঁচো গর্ত করে। কেঁচোর গর্তের উপরের অংশ সাধারণতঃ অনুভূমিক অথবা তির্যক্ এবং শেষ অংশ প্যাঁচানো। কেঁচোর গর্ত মাটির নিচে দুই মিটার বা তাহারও বেশি গভীর স্তর পর্যন্ত যাইতে পারে। ইহারা দিনের বেলায় গর্তের উপরের অংশে থাকে। এই সময় গর্তের মুখ পচা পাতা ইত্যাদি দিয়া বন্ধ থাকে। রাত্রে ইহারা দেহের সামনের কিছু অংশ বাহির করিয়া খাদ্য অন্বেষণ করে (61 নং চিত্র)। দেহের বেশির ভাগ অংশ



61 নং চিত্র—গর্তের মধ্যে কেঁচো, সামনের দিক গর্তের বাহিরে।

সিটা Seta)-র সাহায্যে গর্তের মধ্যে আট্‌কাইয়া থাকে। হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে ইহারা দেহকে খুব তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে গুটাইয়া লয়।

ইদুর ও গিনিপিগ উহাদের শক্তিশালী কৃন্তক (Incisors) দন্তের সাহায্যে মাটি কাটিয়া ফেলে এবং শক্তিশালী পশ্চাৎ-পদ দুইটির সাহায্যে মাটির টুক্‌রা-গুলিকে ঠেলিয়া গর্তের বাহিরে পাঠাইয়া দেয়। খাদ্যান্বেষণ, জনন ইত্যাদি সময় ছাড়া অন্যান্য সময় ইহারা সচরাচর গর্তের মধ্যে থাকে। মোল (Mole) নামক ছুঁচা-জাতীয় প্রাণীর দেহে গর্ত খোঁড়া এবং গর্তে বাস করার অভিযোজনগুলি খুবই প্রকট। ইহাদের অগ্র-পদ এবং পশ্চাৎ-পদ বেঁটে, কিন্তু খুব শক্তিশালী, এবং বড় বড় নখর-যুক্ত। এইগুলির সাহায্যে ইহারা গর্ত খোঁড়ে। জীবনের অধিকাংশ সময়েই ইহারা গর্তেই বাস করে। পটলের মতো দেহ, ছোট লেজ, সরু তুণ্ড (Snout)—এই সমস্তই গর্তে বাস করার অভিযোজন। প্রয়োজন নাই বলিয়া, ইহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ। ইহাদের কর্ণছত্রও নাই।

মরুবাসের অভিযোজন (Desert adaptations)

এই পরিচ্ছেদের প্রথমে মরুভূমিতে বসবাসকারী উটের কথা বলা হইয়াছে। মরুভূমির চরম জলবায়ুতে বসবাসের উপযোগী প্রাণীদের দেহে কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের অভিযোজন দেখা যায়। এই অভিযোজন উটের ক্ষেত্রে খুবই প্রকট। স্বল্প ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ, রাতের কন্-কনে ঠাণ্ডা, বাতাসে জলীয় বাষ্পের অভাব, গাছপালার স্বল্পতা এবং বালু-ঝড় বালুকাময় মরুভূমির বিশেষত্ব। উট, উটপাখি, স্যাণ্ড-পাপি (Sand pupy), ক্যাঙারু-ইঁদুর (Kangaroc-Rat), কয়েক ধরনের গিরগিটি-জাতীয় প্রাণী ও সাপ, কিছু মাকড়সা ও পতঙ্গ মরু-অঞ্চলে পাওয়া যায়। উট একাদিক্রমে বেশ কয়েকদিন জল পান না করিয়া থাকিতে পারে। এই সময়ে ইহাদের দেহ-কোষ হইতে জল রক্তে চলিয়া আসে।* এইরকম নিরুদনের ফলে উট খুব রোগা হইয়া যায়; কিন্তু আবার জল পান করিতে পারিলে খুব শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠে। বালির উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে চলার জন্য উটের পায়ের তলায় নরম গদির মতো অংশ থাকে। ইহারা কপাটিকার সাহায্যে নাসারন্ধ্র বন্ধ করিতে পারে। কাজেই, ঝড়ের সময় উটের নাসারন্ধ্রে বালি প্রবেশ করিতে পারে না।

অতএব, দেখা যাইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে যতই প্রতিকূল হউক না কেন, প্রত্যেক জীব উহার নির্দিষ্ট অভিযোজনের সাহায্যে নিজ নিজ পরিবেশে সুষ্ঠু-ভাবে বাঁচিয়া থাকে।

———

* অনেকের ধারণা যে, উট পাকস্থলীর প্রাকারে অবস্থিত জল-কোষ (Water cells) নামক ছোট ছোট কুঠুরীতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। কিন্তু ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। আরও অনেকে মনে করেন যে উটের পিঠে সঞ্চিত মেদকলার জারণের ফলে উৎপন্ন জল হইতে উটের জলের চাহিদা মেটে, ইহাও কিন্তু ভ্রান্ত।

কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আবর্ত (Carbon, Nitrogen and Oxygen Cycle) 8

জীবের দেহ প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়া গঠিত। প্রোটোপ্লাজ্‌ম আবার বহু মৌলিক পদার্থ মিলিয়া তৈয়ারী। জীব-দেহ তৈয়ারির কাজে যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ লাগে, তাহারা সবই জীবের পরিবেশ হইতে আসে। কিন্তু জীবদেহ সৃষ্টির প্রয়োজনে যদি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ ক্রমাগত পরিবেশ হইতে গৃহীত হইত, তবে খুব শীঘ্রই পরিবেশে এইসব মৌলিক পদার্থের অভাব দেখা দিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। কারণ, জীবের জীবিতকালে অথবা ইহার মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত মৌলিক পদার্থ শেষ পর্যন্ত আবার পরিবেশেই ফিরিয়া আসে।

এইভাবে, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ পরিবেশ ও জীব-দেহের মধ্যে বার বার আবর্তিত হওয়ায়, পরিবেশে মৌলিক পদার্থগুলির পরিমাণের সমতা বজায় থাকে। কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন—এই তিনটি মৌলিক পদার্থ পরিবেশ ও জীব-দেহের মধ্যে কিভাবে আবর্তিত হয়, তাহা এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

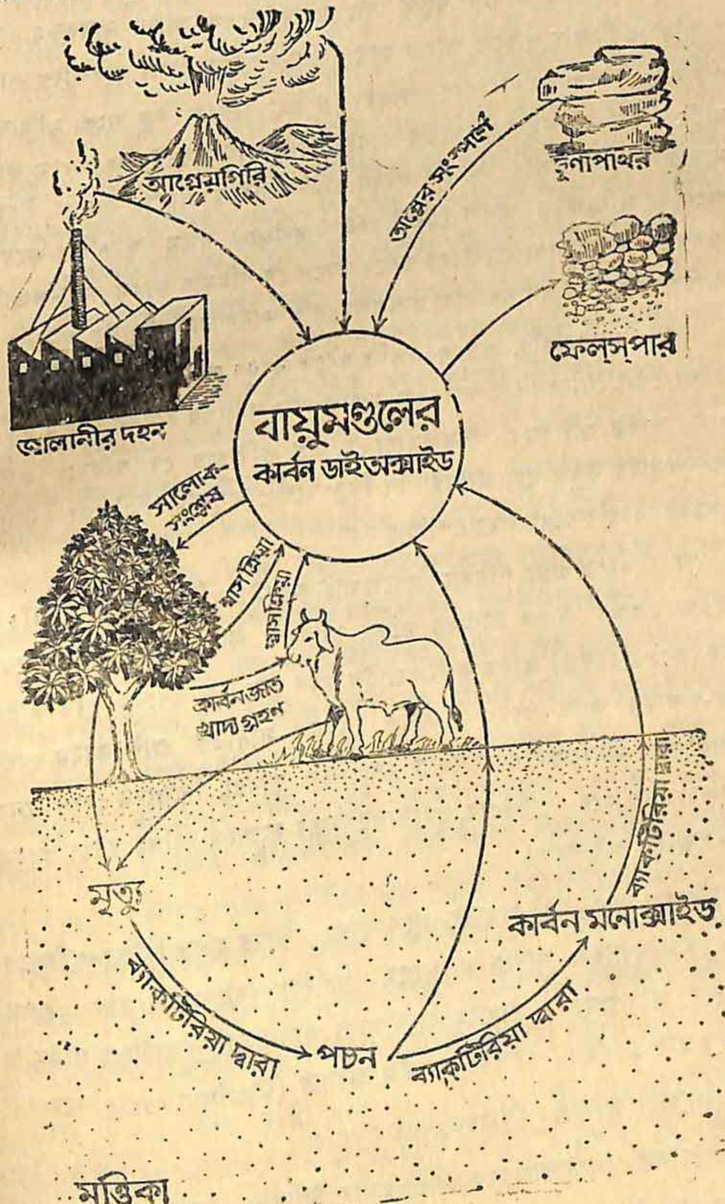
কার্বন আবর্ত (Carbon cycle)

কার্বন সমস্ত জৈব পদার্থের প্রধান উপাদান। বায়ুমণ্ডলে কার্বন সাধারণতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হিসাবে থাকে। স্বভোজী উদ্ভিদ সরাসরি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণি-রাজ্যের খাদ্যের উৎস উদ্ভিদ-রাজ্য। প্রাণীরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করিয়াই পুষ্টিসাধন করে।

বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা মাত্র 0·03 ভাগ; অর্থাৎ, বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় খুবই নগণ্য। ওজন হিসাবে, বায়ুমণ্ডলের প্রায় 2×10^{15} কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। ইহার মধ্যে প্রতি বছর প্রায় 6×10^{13} কিলোগ্রাম, অর্থাৎ, সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের $\frac{1}{30}$ অংশ স্থলজ উদ্ভিদেরাই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে। স্বভাবতই মনে হয়, কিভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বজায় থাকে? নিচে ইহা আলোচিত হইল।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস (Sources of carbon dioxide)— পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসগুলি হইতে বায়ুমণ্ডলে ইহা জমা হয়।

(ক) জীবের শ্বসনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হয়। শ্বসনের ফলে দিনে স্বভোজী উদ্ভিদের দেহ হইতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হয়, তাহার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই সালোকসংশ্লেষে ব্যয়িত হয়। কিন্তু রাতে সালোক-



62 নং চিত্র—কার্বন আবর্ত।

সংশ্লেষ বন্ধ থাকায়, শ্বসনে উৎপন্ন সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে বাহির হইয়া যায়। পরভোজী উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের দিনরাত শ্বসনের ফলেও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে।

(খ) উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের দেহ মাটির নানরকম ছত্রাক ও জীবাণুর ক্রিয়ায় পচিতে আরম্ভ করে। পচন-ক্রিয়ার ফলে অধিকাংশ কার্বন, কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসাবে বাহির হয় এবং উহার কিছু অংশ মৃত্তিকা বা মাটিতে মিশিয়া থাকে। মাটির জীবাণু কার্বন ডাই-অক্সাইডকে প্রথমে কার্বন মনোক্সাইড এবং পরে আবার কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত করে। ইহাকে অনেকে **মৃত্তিকার শ্বসন** (Soil respiration) নামে অভিহিত করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য প্রাণীদের শ্বসনের ফলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হয়, মাটির শ্বসনের ফলে তদপেক্ষা বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়।

(গ) আগ্নেয়গিরি, প্রস্রবণ প্রভৃতি হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হয়। কয়লা, তৈল, গ্যাসোলিন, কাঠ এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থের দহনের ফলেও কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভূত হয়, তাহার বেশ কিছু অংশ ফেল্‌স্পার (Felspar) নামক খনিজের বিচূর্ণীকরণের সময় শোষিত হয়।

(ঘ) সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত অথবা অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। স্থলজ উদ্ভিদের মতো, সামুদ্রিক উদ্ভিদ-ও সালোকসংশ্লেষের সময় (জলে দ্রবীভূত) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং শ্বসনের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কোনও কোনও সামুদ্রিক প্রাণী কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নানারকম কার্বোনেটে রূপান্তরিত করিয়া, নিজেদের দেহ-গঠনের কাজে ব্যবহার করে। আবার, চুনাপাথর অম্লের সংস্পর্শে বিশ্লিষ্ট হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি করে।

উদ্ভিদেরা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া আসে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীব-জগতের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সবসময়ে রক্ষিত হয়। ইহাকেই **কার্বন আবর্ত** (**Carbon cycle**) বলে।

নাইট্রোজেন আবর্ত (Nitrogen cycle)

নাইট্রোজেন প্রোটোপ্লাজ্‌মের একটি প্রধান উপাদান বায়ুমণ্ডলে শতকরা 78 ভাগ নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও, উদ্ভিদকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন মাটি

হইতে নিতে হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন রকম লবণ থাকে। উদ্ভিদ এই লবণ সরাসরি গ্রহণ করে। আবার, কতকগুলি নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ মাটিতে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। জীবাণু, ছত্রাক প্রভৃতির ক্রিয়াশীলতার ফলে এই যৌগগুলি উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য লবণে রূপান্তরিত হয়। তখন উদ্ভিদ উহাদের গ্রহণ করিতে পারে।

প্রত্যেক বছর মাটি হইতে নাইট্রোজেন যৌগ নানা উপায়ে ক্ষয়িত এবং অপসারিত হইতেছে। যেমন—

(ক) **বৃষ্টি দ্বারা নিঃসরণ** (By leaching action of rain)—মাটির নাইট্রোজেন-জাত যৌগগুলি সেচ ও বৃষ্টির জলে মাটির অনেক নিচে চলিয়া যায়। যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি, সেই অঞ্চলে নিঃসরণের পরিমাণও বেশি।

(খ) **চাষ-আবাদের দ্বারা** (By removal of crops)—উদ্ভিদ মাটির নাইট্রোজেন যৌগ গ্রহণ করিয়া খাদ্যের সংস্থান করে। ফলে, প্রত্যেক বছরই ফসল তুলিবার পর মাটি হইতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন যৌগ অপসারিত হইয়া যায়।

(গ) **গ্যাসরূপে ক্ষয়** (Loss in gaseous form)—এক শ্রেণীর জীবাণুর শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়ার ফলে মাটির নাইট্রেট ক্রমে নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু-চলাচল ও জল-নিকাশনের অভাবে এই উপায়ে নাইট্রোজেন যৌগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

স্বভাবতঃই মনে হয়, ক্রমাগত নাইট্রোজেন যৌগ ক্ষয়ের ফলে এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন মাটিতে নাইট্রোজেন যৌগের পরিমাণ একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সবসময়ে বায়ুর নাইট্রোজেন মাটিতে যৌগ হিসাবে জমা হইতে থাকে। সঞ্চিত নাইট্রোজেন যৌগ আবার উদ্ভিদের এবং পরোক্ষভাবে প্রাণীদেরও প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ উপায়ে উদ্ভিদ এবং প্রাণি-দেহের নাইট্রোজেন যৌগ আবার মাটিতে ফিরিয়া আসে। এইভাবে জীব-দেহ ও পরিবেশের মধ্যে নাইট্রোজেনের যাতায়াতকে **নাইট্রোজেন আবর্ত** (Nitrogen cycle) বলে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে মাটিতে নাইট্রোজেন জমা হয়।

(ক) **বৃষ্টির জল দ্বারা** (By rain water)—বিদ্যুৎ-ক্ষরণের ফলে বায়ুর নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইড গঠন করে।

$$N_2+O_2=2NO$$

নাইট্রিক অক্সাইড আবার অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হইয়া, নাইট্রোজেন পারক্সাইডে পরিণত হয়।

$$2NO+O_2=2NO_2$$

নাইট্রোজেনের পারক্সাইড শেষ পর্যায়ে বৃষ্টির জলে অথবা বায়ুর জলীয় বাষ্পে দ্রবীভূত হইয়া, নাইট্রাস অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং মাটিতে আসিয়া পড়ে।

$$2NO_2+H_2O=HNO_2+HNO_3$$

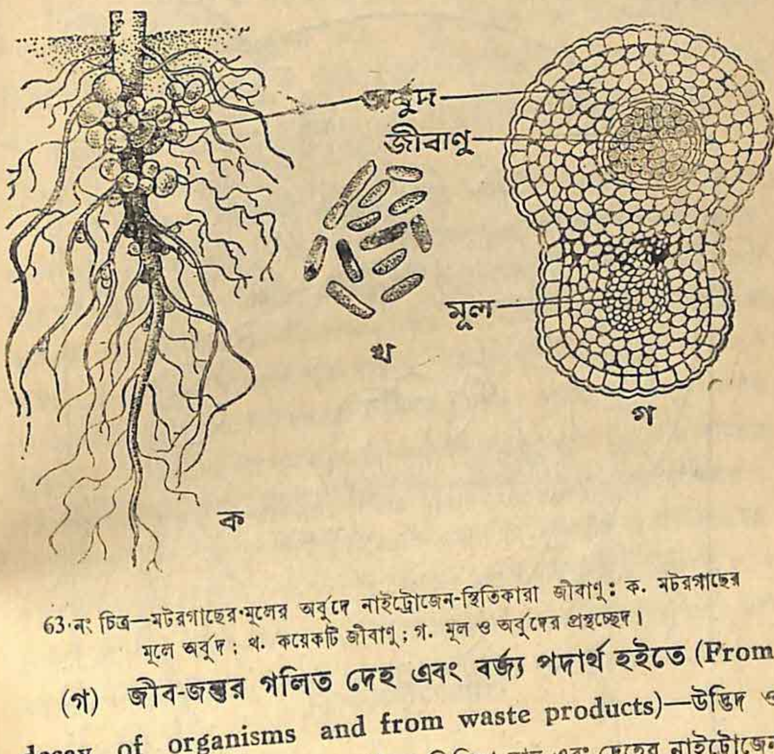
মাটিতে এই অ্যাসিড দুইটি ক্যাল্‌শিয়াম অথবা পটাশিয়াম লবণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, যথাক্রমে ক্যাল্‌শিয়াম অথবা পটাশিয়াম নাইট্রাইট ও নাইট্রেট গঠন করে। উদ্ভিদ তখন মূলের সাহায্যে এই লবণ গ্রহণ করে। এইভাবে বছরে একর-প্রতি সাধারণতঃ আড়াই কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন মাটিতে জমা হয়।

নাইট্রাস এবং নাইট্রিক অ্যাসিড ছাড়া, বিদ্যুৎ-ক্ষরণের ফলে অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়া-ও উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পড়ে। উদ্ভিদ উহা সরাসরি (অথবা অ্যামোনিয়া জীবাণু দ্বারা জারিত হইয়া নাইট্রেটে পরিণত হইলে) গ্রহণ করে।

(খ) **নাইট্রোজেন-স্থিতি দ্বারা** (By fixation of nitrogen)—মাটির অসংখ্য জীবাণুর মধ্যে কতকগুলি জীবাণু বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে মাটিতে ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতিকে **নাইট্রোজেন-স্থিতিকরণ** (Fixation of nitrogen), এবং জীবাণুগুলিকে **নাইট্রোজেন-স্থিতিকারী জীবাণু** (Nitrogen fixing bacteria) বলা হয়। নাইট্রোজেন-স্থিতিকারী জীবাণুগুলি অ্যাজোটো-ব্যাক্‌টার (*Azotobacter*) এবং ক্লস্‌ট্রিডিয়াম (*Clostridium*)—এই দুই ধরনের। ইহারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া, তাহাকে দেহের মধ্যে নাইট্রোজেন যৌগে রূপান্তরিত করে। মৃত্যুর পর এই সমস্ত জীবাণুর দেহ-জাত নাইট্রোজেন যৌগ মাটিতেই থাকিয়া যায়। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে, অ্যাজোটোব্যাক্‌টার-জাতীয় জীবাণুগুলি বছরে একর-প্রতি 10 হইতে 20 কিলোগ্রাম পর্যন্ত নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ করিতে পারে।

মটর, ছোলা, ধঞ্চে ইত্যাদি গাছের মূলে যে অর্বুদ থাকে, আর একধরনের জীবাণু তাহার মধ্যে থাকে এবং বায়ুর নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন যৌগে রূপান্তরিত করে। দেখা গিয়াছে, এইসব উদ্ভিদ বছরে একর-প্রতি প্রায় 45 হইতে 110 কিলোগ্রাম পর্যন্ত নাইট্রোজেন এইভাবে বায়ু হইতে গ্রহণ

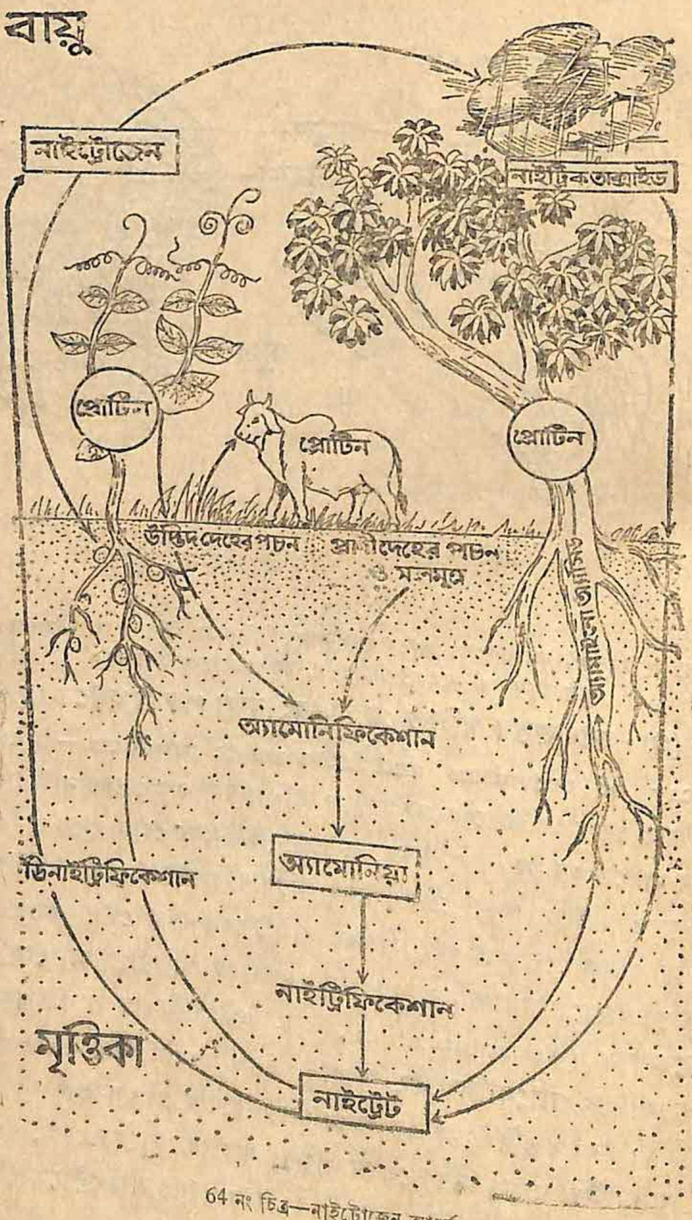
করিয়া, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। জীবাণু ছাড়া, ডায়াটম (Diatom) এবং কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের শেওলা সরাসরি বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে।



63·নং চিত্র—মটরগাছের মূলের অর্বুদে নাইট্রোজেন-স্থিতিকারী জীবাণু: ক. মটরগাছের মূলে অর্বুদ; খ. কয়েকটি জীবাণু; গ. মূল ও অর্বুদের প্রস্থচ্ছেদ।

(গ) জীব-জন্তুর গলিত দেহ এবং বর্জ্য পদার্থ হইতে (From decay of organisms and from waste products)—উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মৃত্যুর পর উহাদের দেহ মাটিতে মিশিয়া যায় এবং দেহের নাইট্রোজেন যৌগ মাটিতে যুক্ত হয়। প্রাণীদের মল-মূত্রে নাইট্রোজেন যৌগ থাকে। ফলে, মল-মূত্রও মাটিতে নাইট্রোজেন যৌগের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর গলিত দেহ এবং বর্জ্য পদার্থের নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ কতকগুলি জীবাণুর সাহায্যে অ্যামোনিয়ায় পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **অ্যামোনিফিকেশান** (Ammonification), এবং এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জীবাণুগুলিকে **অ্যামোনিফাইং জীবাণু** (Ammonifying bacteria) বলা হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ এই অ্যামোনিয়া সরাসরি গ্রহণ করে। অ্যামোনিয়া আবার কয়েক শ্রেণীর জীবাণুর সাহায্যে জারিত হইয়া প্রথমে নাইট্রাইট এবং পরে নাইট্রেটে পরিণত হয়। প্রথম পর্যায়ে **নাইট্রোসোমো-**

নাস (*Nitrosomonas*) এবং **নাইট্রোসোককৃকাস** (*Nitrosococcus*) নামক দুই ধরনের জীবাণু অংশ গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে **নাইট্রোব্যাক্টার**(*Nitrobacter*)-জাতীয় জীবাণু অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই তিন



64 নং চিত্র—নাইট্রোজেন আবর্ত।

ধরনের জীবাণুকে একসঙ্গে **নাইট্রিফাইং জীবাণু** (Nitrifying bacteria) বলা হয়।

মাটির এক শ্রেণীর জীবাণু নাইট্রেটকে প্রথমে অ্যামোনিয়ায় এবং শেষে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে পরিণত করে। নাইট্রোজেন গ্যাস আবার বায়ুতে মিশিয়া যায়। এই পদ্ধতিকে **ডিনাইট্রিফিকেশন** (Denitrification), এবং জীবাণুগুলিকে **ডিনাইট্রিফাইং জীবাণু** (Denitrifying bacteria) বলা হয়।

উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি ছাড়া আরও কয়েকভাবে মাটিতে নাইট্রোজেন যৌগ যুক্ত হয়। কতকগুলি পতঙ্গভুক উদ্ভিদ কীট-পতঙ্গের দেহ হইতে নাইট্রোজেন যৌগ গ্রহণ করে। উদ্ভিদের মৃত্যুর পর এই নাইট্রোজেন যৌগ মাটিতে মিশিয়া যায়। নাইট্রোজেন-ঘটিত সার-প্রয়োগের ফলেও মাটিতে নাইট্রোজেন যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এই ভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন মাটিতে জমা হয়। মাটির নাইট্রোজেন যৌগ উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশের পর ক্রমে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং প্রোটীনে পরিণত হয়। শাকাশী প্রাণীরা সরাসরি উদ্ভিদ-দেহ হইতে প্রোটীন পাইয়া থাকে; মাংসাশী প্রাণীরা অন্যান্য প্রাণীদের দেহ হইতে প্রোটীন পায়। জীব-দেহের মৃত্যু ও পচনের পর উহাদের দেহের প্রোটীন অবশেষে নাইট্রেটে পরিণত হয়। নাইট্রেট আবার আগে বর্ণিত উপায়ে নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিবর্তিত হয়। উহা আবার বায়ুতে ফিরিয়া যায়। এইভাবে পরিবেশে নাইট্রোজেনের পরিমাণের সমতা রক্ষিত হয়।

অক্সিজেন আবর্ত (Oxygen cycle)

জীবেরা সবাত শ্বসনের সময় বায়ুমণ্ডল হইতে গ্যাসীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে। জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীরা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়া সবাত শ্বসন করে। অতএব, জীবের সবাত শ্বসনের ফলে পরিবেশ হইতে অক্সিজেন কমিয়া যায়। সবাত শ্বসনে গৃহীত অক্সিজেন (শ্বসনের সময়) জারণের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল হিসাবে আবার পরিবেশে ফিরিয়া আসে। সবুজ উদ্ভিদেরা সালোকসংশ্লেষের সময় আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল হইতে গ্লুকোজ প্রস্তুত করে। এই সময়ে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। নির্গত অক্সিজেন গ্যাস আবার পরিবেশে ফিরিয়া আসে। এইভাবে, জীব-দেহ এবং পরিবেশের মধ্যে

আবর্তনের মাধ্যমে সবসময়ে অক্সিজেনের পরিমাণের সমতা রক্ষা পায়। ইহাই **অক্সিজেন আবর্ত (Oxygen cycle)**।



65 নং চিত্র—অক্সিজেন আবর্ত

অক্সিজেন আবর্তের তত্ত্ব অনুসরণ করিয়াই অ্যাকুয়ারিয়াম (Aquarium)-এ মাছের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ জলজ উদ্ভিদ-ও লাগানো হয় এবং কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা হয়। সবুজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়া আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ করে। ইহার ফলে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, তাহা নিয়া মাছ শ্বসন করে। মাছের শ্বসনে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড আবার উদ্ভিদের শ্বসনের কাজে লাগে। কাজেই, অ্যাকুয়ারিয়ামের বাহির হইতে অক্সিজেনের সরবরাহ না পাইলেও, মাছ বাঁচিয়া থাকে।

বাস্তব্য-তন্ত্র ও সংরক্ষণ
(Ecosystem and Conservation)

9

ছোট-বড় সব জীবেরই জীবনযাত্রার পদ্ধতি নির্দিষ্ট। জীবের জীবনযাত্রার পদ্ধতি অংশতঃ উহার গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের উপর, এবং অংশতঃ উহা যে পরিবেশে বাস করে, তাহার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন জীব নানারকম পরিবেশে কিভাবে নিজেদের মানাইয়া নেয়, তাহা সপ্তম পরিচ্ছেদে, অভিযোজন-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কোনও জীবই একান্তভাবে একাকী বাঁচিতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে, কোনও জীবকে স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, উহাকে একদিকে পরিবেশের অন্যান্য জীবের সঙ্গে, অপরদিকে জল, বায়ু, মাটি, সূর্যালোক ইত্যাদি পরিবেশের ভৌত উপাদানগুলির সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীব ও উহার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়, তাহাকে **বাস্তব্য-বিদ্যা (Ecology)** বলে। এই পরিচ্ছেদে বাস্তব্য-তন্ত্র (Ecosystem) নামের বাস্তব্য-বিদ্যার কার্যগত একক, এবং উহার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ (Conservation)-এর বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইল।

বাস্তব্য-তন্ত্র (Ecosystem)

পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত উপাদান*, অর্থাৎ সূর্যালোক, উষ্ণতা, জল, মাটি, চাপ ইত্যাদির তারতম্যের জন্য, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা জন্মাইতে দেখা যায়। যেমন, শুষ্ক মরু-অঞ্চলে যে ধরনের গাছপালা দেখা যায়, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে সেইরকম গাছপালা জন্মায় না। আবার, কোনও অঞ্চলে কি কি ধরনের প্রাণীর দেখা মিলিবে, তাহা নির্ভর করে ঐ অঞ্চলে কিরকম গাছপালা জন্মায় তাহার উপর। যেমন, মরুভূমির কাঁটাঝোপ ও ক্যাকটাস-জাতীয় গাছপালা-অঞ্চলে যে সব প্রাণী দেখা যায়, তাহাদের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মানো মস, ফার্ন, কচু ইত্যাদির ঝোপে পাওয়া যায় না। এইরকম হওয়ার কারণ, কোনও পরিবেশে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের (প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ) সুনির্দিষ্ট

* পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আলোচনা করা হইয়াছে।

সম্পর্ক আছে। এইরকম কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে সামগ্রিকভাবে **জীব-সম্প্রদায়** (Biotic community) বলা হয়। উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলের জীব-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

কোনও জীব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক নানাধরনের—কোনও সম্পর্ক সহযোগিতার, কোনওটি বা প্রতিযোগিতার। অবশ্য, জীব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জীবের মধ্যে যে প্রধান সম্পর্ক দেখা যায়, তাহা খাদ্য-খাদকের। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, জীব-সম্প্রদায়ের জীবগুলিকে তিনটি দলে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(ক) উৎপাদক (Producers), (খ) খাদক (Consumers) এবং (গ) পচনকারী (Decomposers)।

উৎপাদক (Producers)—জীব-সম্প্রদায়ের সবুজ স্বভোজী (Autotropic) উদ্ভিদরাই এই দলের অন্তর্গত। ইহারা পরিবেশ হইতে খাদ্যের অজৈব রসদ (অর্থাৎ জল, খনিজ লবণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড) সংগ্রহ করিয়া, ঐ রসদগুলি হইতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় ও সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জৈব খাদ্য প্রস্তুত করে। এইভাবে, সৌরশক্তি উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়। অতএব, সবুজ উদ্ভিদরা জীব-সম্প্রদায়ের খাদ্যের উৎপাদক।

খাদক (Consumers) প্রাণীমাত্রেই পরভোজী (Heterotropic)—অর্থাৎ খাদ্যের জন্য পরনির্ভর। অতএব, সবুজ স্বভোজী উদ্ভিদ যেমন জীব-সম্প্রদায়ের খাদ্যের উৎপাদক, তেমনি প্রাণিরা ঐ জীব সম্প্রদায়ের খাদক। বিভিন্ন ধরনের তৃণভোজী (Graminivorous), শস্যভোজী (Granivorous) এবং শাকাশী (Herbivorous) প্রাণী সরাসরি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ অথবা উহাদের বিভিন্ন অংশ খায়। ইহাদের **প্রথম সারির খাদক** (First order consumers) বা **প্রাথমিক খাদক** (Primary consumers) বলে। হরিণ, বানর, ইঁদুর, খরগোস ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী, চড়াই, পায়রা ইত্যাদি পাখি ব্যাঙাচি, এবং প্রজাপতি ইত্যাদি পতঙ্গ এই শ্রেণীর খাদক। আবার, ছুঁচো, চামচিকা ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী, শালিক, দোয়েল ইত্যাদি পাখি, ব্যাঙ ইত্যাদি মাঝারি আকৃতির প্রাণী, এবং মাকড়সা ও কয়েক ধরনের পতঙ্গ—ইহারা সকলেই মাংসাশী। যে সমস্ত পতঙ্গ উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদ-জাত খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে, এইসব মাংসাশী প্রাণীরা তাহাদের খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। সেইজন্য, ইহাদের **দ্বিতীয় সারির খাদক** (Second order con-

sumers) বা গৌণ খাদক (Secondary consumers) বলে। বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, শিয়াল ইত্যাদি বড় আকারের মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী, এবং ঈগল প্রভৃতি বড় মাংসাশী পাখিরা দ্বিতীয় সারির খাদকদের খাইয়া জীবন-ধারণ করে। সেইজন্য, ইহারা **তৃতীয় সারির খাদক** (Third order consumers) নামে পরিচিত।

পচনকারী (Decomposers)—জীবাণু, ছত্রাক এবং কয়েক ধরনের এককোষী প্রাণী ইত্যাদি পরভোজী জীব খাদকের দেহ নিঃসৃত মল-মূত্র এবং উৎপাদক ও খাদকের মৃতদেহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল যৌগে পরিণত করে।

সূর্যই সমস্ত শক্তির উৎস। সূর্যের শক্তি ধরা পড়ে উৎপাদকের উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে। প্রথম সারির খাদক উৎপাদককে খাওয়ায়, ঐ শক্তি প্রথম সারির খাদকের দেহে পরিবাহিত হয়। প্রথম সারির খাদকের শ্বসন, রেচন ইত্যাদি বিপাকীয় ক্রিয়ার সময় ঐ শক্তির বেশকিছু অংশ পরিবেশে চলিয়া যায়। অতএব, দ্বিতীয় সারির খাদক যখন প্রথম সারির খাদককে খায়, তখন দ্বিতীয় সারির খাদকের দেহে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি পরিবাহিত হয়। দ্বিতীয় সারির খাদকের বিপাকের ফলে আরও কিছু পরিমাণ শক্তি পরিবেশে চলিয়া যায়। অতএব, তৃতীয় সারির খাদকের দেহে আরও কম পরিমাণ শক্তি পরিবাহিত হয়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, উৎপাদকের দেহ হইতে তৃতীয় সারি খাদকের দেহে পৌছাইতে শক্তির পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যায়। জীব-সম্প্রদায়ের খাদ্য-খাদকের এইরকম সম্পর্ককে **খাদ্য-শৃঙ্খল** (Food chain) বলা হয়। উৎপাদক, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির খাদক—ইহারা প্রত্যেকেই যেন খাদ্য শৃঙ্খলের এক-একটি আংটা—দ্বিতীয় সারির খাদক প্রথম সারির খাদককে খায়, কিন্তু ইহা আবার তৃতীয় সারির খাদকের খাদ্য। উপরে বর্ণিত উপায়ে শক্তি প্রবাহিত হওয়া বা হস্তান্তরিত হওয়াই খাদ্য-শৃঙ্খলের মূল উদ্দেশ্য।

পুকুরের জীব-সম্প্রদায়ে একটি সংক্ষিপ্ত খাদ্য-শৃঙ্খল —

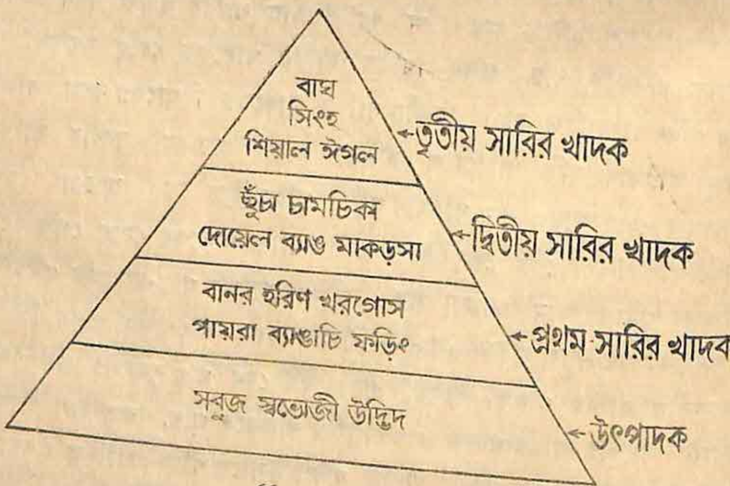
এককোষী শেওলা→এককোষী প্রাণী→ছোট চিংড়ি-জাতীয় প্রাণী→জলজ মাংসাশী পতঙ্গ→মাছ।

বনের জীব-সম্প্রদায়ে একটি খাদ্য-শৃঙ্খল—

উদ্ভিদ→তৃণভোজী পতঙ্গ→পতঙ্গভোজী পাখি→ঈগল।

কিন্তু খাদ্য-শৃঙ্খলমাত্রেই এত সহজ এবং সরল নয়। বরঞ্চ, অধিকাংশ খাদ্য-শৃঙ্খলই জটিল এবং শাখান্বিত। যেমন—বনের জীব-সম্প্রদায়ে উপরোক্ত খাদ্য-শৃঙ্খলে কেবল যে তৃণভোজী পতঙ্গেরা উদ্ভিদ খায় তাহাই নয়, ইঁদুর ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীরাও উদ্ভিদ খায়। আবার, তৃণভোজী পতঙ্গেরা কয়েক ধরনের মাংসাশী পতঙ্গের খাদ্য হইতে পারে, তেমনিভাবে ইঁদুরেরা বনবিড়ালের খাদ্য হইতে পারে। ইহা ছাড়া, কোনও জীব-সম্প্রদায়ে এইরকম অনেকগুলি খাদ্য-শৃঙ্খল থাকিতে পারে। কোনও জীব-সম্প্রদায়ে যে সমস্ত খাদ্য-শৃঙ্খল দেখা যায়, তাহারা মিলিতভাবে একটি **খাদ্য-জালক (Food web)** বা **খাদ্য-চক্র (Food cycle)** সৃষ্টি করে।

খাদ্য-জালকে উৎপাদক (যেমন ঘাস)-এর সংখ্যা বেশি, কিন্তু আয়তন ছোট; প্রথম সারির খাদকের আয়তন অপেক্ষাকৃত বেশি, কিন্তু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। দ্বিতীয় সারির খাদকের আয়তন আরও বেশি, সংখ্যা আরও কম। তৃতীয় সারির খাদক (যেমন বাঘ)-এর আয়তন সবচেয়ে বেশি, সংখ্যা সবচেয়ে কম।

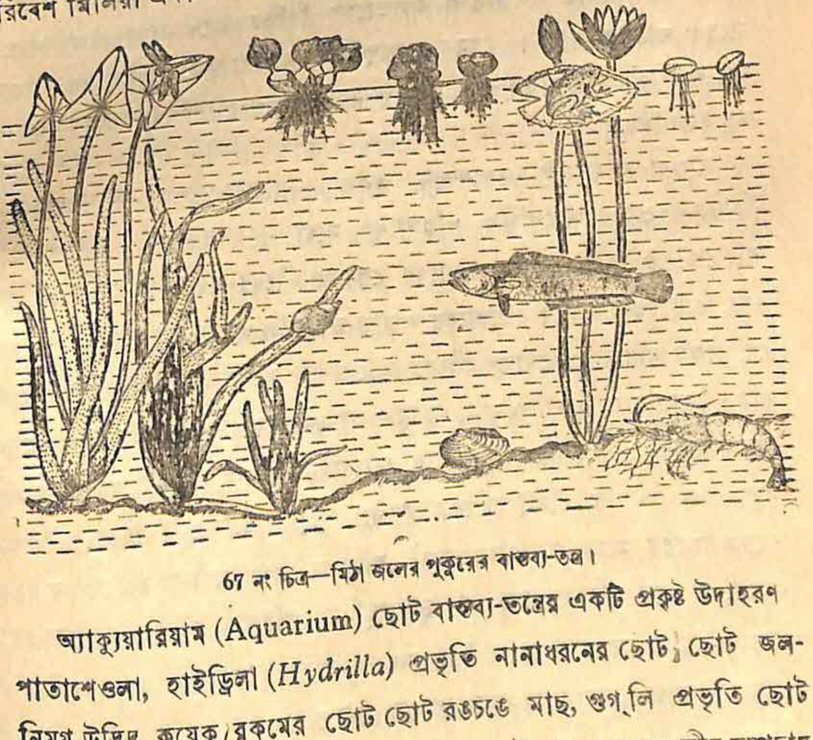


66 নং চিত্র—জীব-পিরামিড

অতএব দেখা যাইতেছে, খাদ্য-শৃঙ্খল তথা খাদ্য-জালকে উৎপাদক হইতে তৃতীয় সারির খাদক পর্যন্ত পৌঁছাইতে ক্রমেই (ক) স্থৈতিক শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায়, (খ) আয়তন বাড়িয়া যায় এবং সংখ্যা কমিয়া যায়। জীব-সম্প্রদায়ের খাদ্য-জালকের এই ধারণাকে **এল্টন (Elton)**-এর মত অনুসারে, **সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of numbers)** বলা হয়। ইহা **জীব-পিরামিড (Biotic pyramid)** নামেও পরিচিত।

খাদ্য-শৃঙ্খল জীব-পিরামিডের একটি ছোট অবিচ্ছেদ্য অংশ। পচনকারীরা যদিও ঠিক এই পিরামিডের অংশ নয়, তবু ইহারা জীব-পিরামিডের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ, আগে বলা হইয়াছে, ইহারা উৎপাদক ও খাদকের মৃতদেহ এবং খাদকের মল-মূত্র ইত্যাদিকে বিশ্লেষিত করে। এইভাবে উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত সরল যৌগপদার্থ ও মৌলিক পদার্থ পরিবেশের মাটিতে, জলে অথবা বায়ুতে ফিরিয়া যায়। ঐগুলি হইতে উৎপাদক আবার খাদ্য প্রস্তুত করে।

সুতরাং, জীব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, শুধু তাহাই নয় ; জীব-সম্প্রদায় আবার পরিবেশের ভৌত উপাদানগুলির সঙ্গেও নিগূঢ় সম্পর্ক-যুক্ত। এইরকম, কোনও স্থানের জীব-সম্প্রদায় এবং ঐ স্থানের ভৌত পরিবেশ মিলিয়া একটি নির্দিষ্ট বাস্তব্য-তন্ত্র (Ecosystem) তৈয়ারি হয়।



67 নং চিত্র—মিঠা জলের পুকুরের বাস্তব্য-তন্ত্র।

অ্যাকুয়ারিয়াম (Aquarium) ছোট বাস্তব্য-তন্ত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাতাশেওলা, হাইড্রিলা (*Hydrilla*) প্রভৃতি নানাধরনের ছোট ছোট জল-নিমগ্ন উদ্ভিদ, কয়েক রকমের ছোট ছোট রঙচঙে মাছ, গুগ্‌লি প্রভৃতি ছোট জাতের শামুক এবং কিছু জীবাণু ইত্যাদি নিয়া এই বাস্তব্য-তন্ত্রের জীব-সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। আবার, অ্যাকুয়ারিয়ামের নিচের স্তরে ছোট ছোট নুড়ি, বালি, কৃত্রিম আলো এবং জল—এইগুলি দিয়া ভৌত পরিবেশ গঠিত হয়। কৃত্রিম আলো পরিবেশের উষ্ণতা বজায় রাখে এবং জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে। সালোকসংশ্লেষে নির্গত অক্সিজেন মাছ, গুগ্‌লি ইত্যাদি

প্রাণীর শ্বসনের কাজে লাগে। শ্বসনের ফলে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড তেমনি জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে লাগে। আবার, জলজ উদ্ভিদের কচি পাতা মাছের খাদ্য। জলজ উদ্ভিদের পাতা এবং মাছের বিষ্ঠা (জীবাণুর সাহায্যে) পচনের ফলে এই জৈব পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত সরল যৌগ গঠন করে, জলজ উদ্ভিদ সেইগুলির সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে শুধু তাহাই নয়, বালি ও নুড়ি জলজ উদ্ভিদের সুষ্ঠু বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এইভাবে, অ্যাকুয়ারিয়ামের জীব-সম্প্রদায় ও ভৌত পরিবেশের পারস্পরিক লেন-দেনের মাধ্যমে এই বাস্তব্য-তন্ত্রের সমতা রক্ষিত হয়।

মিঠা জলের পুকুরের বাস্তব্য-তন্ত্র 67 নং চিত্র) যেন অ্যাকুয়ারিয়ামের বাস্তব্য-তন্ত্রের বৃহত্তর সংস্করণ। জীব-সম্প্রদায় এবং ভৌত পরিবেশের তারতম্য অনুসারে, পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের বিভিন্ন অংশে নানাধরনের বাস্তব্য-তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন—তৃণভূমির বাস্তব্য-তন্ত্র, মরুভূমির বাস্তব্য-তন্ত্র, জলা জায়গার বাস্তব্য-তন্ত্র, বেলাভূমির বাস্তব্য-তন্ত্র, গভীর সমুদ্রের বাস্তব্য-তন্ত্র ইত্যাদি।

বাস্তব্য-তন্ত্রমাত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। বাস্তব্য-তন্ত্রের জীব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্যদের আপেক্ষিক পরিমাণের মধ্যে সবসময় সমতা রক্ষিত হয়। যদি কোনও কারণে জীব-সম্প্রদায়ের কোনও জীবের সংখ্যা খুব বেশি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে জীব-সম্প্রদায়ের অন্যান্য জীবগুলি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, শীঘ্রই আবার প্রথমোক্ত জীবের আপেক্ষিক সংখ্যা প্রয়োজনমতো কমিয়া যায়। ধরা যাক, কোনও বনে, কোনও কারণে বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি যেসব বড় মাংসাশী প্রাণী হরিণ মারিয়া খায়, তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গেল। ফলে, মৃত্যু কম হওয়ায়, শীঘ্রই হরিণের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু, কয়েক বছরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই হরিণের সংখ্যা কমিয়া যাইতে বাধ্য। কারণ, ঐ বনে হরিণের খাদ্য ও চারণভূমির পরিমাণ সীমিত। অতএব, বাড়তি খাদ্যের সরবরাহ না পাইয়া, অনেক হরিণ খাদ্যাভাবে মারা যাইবে। এইভাবে সমস্ত বাস্তব্য-তন্ত্রে সমতা রক্ষার চেষ্টা চলে।

সংরক্ষণ (Conservation)

বাস্তব্য-তন্ত্রের সমতা স্বভাবতঃই হাজার হাজার বছর ধরিয়া নির্বিবাদে রক্ষিত হয়। কোনও কারণে এই সমতা অল্পমাত্রায় বিকৃত হইলে, কিছু সময় লাগিলেও, অবশেষে ঐ সমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আগ্নেয়গিরির

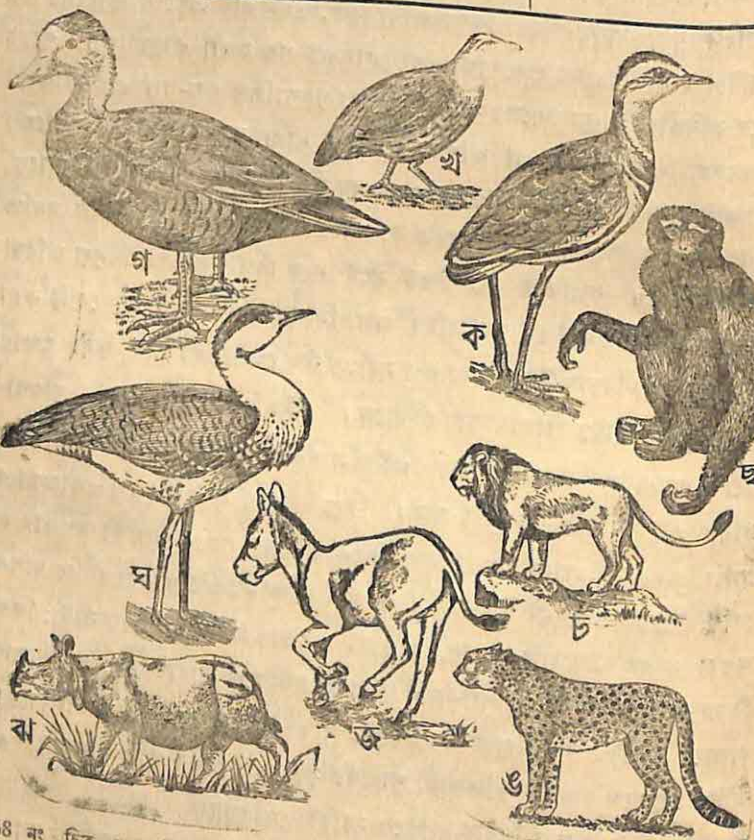
অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, প্রবল বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাস্তব্য-তন্ত্রের সমতা একেবারে বিনষ্ট হয়। এইরকম ঘটিলে, ঐ বাস্তব্য-তন্ত্রের জীব-সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যায়।

সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of conservation)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া, গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সভ্যতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর তাগিদে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের বাস্তব্য-তন্ত্রের সমতা বার বার মাত্রাতিরিক্ত বিঘ্নিত করিয়াছে। সভ্যতার আদিম যুগে মানুষ যখন শিকারজীবী ছিল, তখন খাদ্য এবং আচ্ছাদনের জন্য নির্বিচারে নানাধরনের তৃণভোজী এবং লোমযুক্ত পশু হত্যা করিয়াছে। পরের যুগে কৃষিজীবী মানুষ ফসলের ক্ষতিকারী এবং গৃহপালিত পশু-পাখির হত্যাকারী পশুদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়া উহাদের সংখ্যা অনেক কমাইয়া দিয়াছে। কিন্তু, সরাসরি হত্যা দ্বারা মানুষ বন্য পশুদের যত না ক্ষতি করিতে পারিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিগুণ ক্ষতি করিয়াছে পশু-পাখিদের স্বাভাবিক বসতি ধ্বংস করিয়া। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল বিলুপ্ত করিয়া নগরের পত্তন হইয়াছে, জলাজমির জল নিষ্কাশন করিয়া চাষোপযোগী করা হইয়াছে, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নদীতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, ফসল রক্ষার নামে যথেচ্ছ কীটঘ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। এইগুলি সবই সরাসরি বাস্তব্য-তন্ত্রের সমতা ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। এইগুলি সবই করা হইয়াছে মানুষের নিজস্ব সুবিধা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু ইহাদের সবগুলিই যে একান্তভাবে সুফল প্রসব করিয়াছে তাহা নয়, অনেকক্ষেত্রে উপকার অপেক্ষা অপকার ই বেশি হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে। বিস্তীর্ণ বনভূমি বিনষ্ট করিয়া বসতি স্থাপন অথবা কৃষির উপযোগী করায়, মানুষের উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহার ফলে যে কেবল বন্য পশু-পাখি নিরাশ্রয় হইয়াছে তাহাই নয়, গাছপালার অভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া মরুভূমির মতো অবস্থার সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। কীটঘ্ন প্রয়োগে ফসলের ক্ষতিকারী পতঙ্গের মৃত্যুতে ফসলের ক্ষতি বন্ধ হইলেও, ঐ একই কীটঘ্ন অনেক নিরীহ প্রাণীকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

মানুষের দ্বারা নির্বিচারে হত্যা এবং বসতি বিনাশের ফলে সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কয়েক ধরনের প্রাণী একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরের পৃষ্ঠায় এইরকম কয়েকটি বিলুপ্ত পাখি, উহাদের কোথায় পাওয়া যাইত, এবং উহারা সম্ভবতঃ কোন সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা দেওয়া হইল।

নাম	অতীত বিস্তারণ	সম্ভাব্য বিলুপ্তির কাল
ডোডো (Dodo)	মরিশাস দ্বীপ	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ
যাত্রী পায়রা (Passenger Pigeon	উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চল	1900 খ্রীষ্টাব্দ
গোলাপী-মাথা হাঁস (Pink-headed Duck)	বর্তমান ভারত ও বাংলাদেশ	1945 খ্রীষ্টাব্দ
জার্ডনের কোর্সার (Jerdon's Courser)	বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ	1900 খ্রীষ্টাব্দ
পাহাড়ী বটের (Mountain Quail)	মুসোরী ও নৈনিতাল অঞ্চল	16খ্রীষ্টা



68 নং চিত্র—কয়েকটি বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী: ক. জার্ডনের কোর্সার ; খ. পাহাড়ী বটের ; গ. গোলাপী-মাথা হাঁস ; ঘ. ভারতীয় বড় বাস্টার্ড : ঙ. চিতা ; চ. এশিয়ার সিংহ : ছ. উল্লুক ; জ. এশিয়ার বুনো গাধা ; ঝ. এশিয়ার এক-শৃঙ্গ গণ্ডার [ক. হইতে গ. বিলুপ্ত, ঘ., ছ., জ. ও ঝ. বিলুপ্তপ্রায়, ঙ. ভারতে বিলুপ্ত, আফ্রিকায় বিলুপ্তপ্রায়, চ. ভারতে বিলুপ্তপ্রায়]।

কয়েক ধরনের প্রাণী অতীত যুগে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া বাস করিত। কিন্তু কই কারণে উহারা অধিকাংশ অঞ্চল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে ; বাকি সীমিত অঞ্চলে ইহারা বিলুপ্তির পথে। এশিয়ার দ্বি-শৃঙ্গ গণ্ডার (Asiatic Two-horned Rhinoceros) আগে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেও পাওয়া যাইত। কিন্তু অনেকদিন যাবৎ ইহারা ভারত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইহারা বর্মায় কোনমতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। চিতা (Hunting Leopard) আগে ভারতে এবং আফ্রিকায় পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন ইহারা ভারত হইতে বিলুপ্ত এবং আফ্রিকায় ইহাদের সংখ্যা অত্যধিকভাবে কমিয়া গিয়াছে। নিচে বিলুপ্তির সম্মুখীন আরও কয়েকটি প্রাণীর নাম এবং উহারা কোথায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তাহা দেওয়া হইল।

নাম	বিস্তারণ
স্ফেনোডন (*Shpenodon*)	নিউজীল্যাণ্ড
ভারতীয় বড় বাস্টার্ড (Great Indian Bustard)	ভারত ও পাকিস্তান
সাদা-ডানা হাঁস (Whitewinged Wood Duck)	ভারত, বর্মা, মালয়, সুণ্ডা দ্বীপ
হুপিং সারস (Hooping Crane)	উত্তর আমেরিকা
বল্ড্ ঈগল (Bald Eagle)	ঐ
শিখাযুক্ত আইবিস (Crested Ibis)	জাপান
এশিয়ার সিংহ (Asiatic Lion)	গুজরাটের গির অরণ্য
বাঘ (Tiger)	এশিয়ার প্রায় সর্বত্র
মেরু ভালুক (Polar Bear)	উত্তর মেরু-অঞ্চল
বড় পাণ্ডা (Giant Panda)	চীনের পশ্চিম অঞ্চল
সিন্ধু-ঘোটক (Walrus)	উত্তর মেরু-অঞ্চল
ওরাং-ওটাং (Orang-utan)	বোর্ণিও, সুমাত্রা
উল্লুক (Whitebrowed Gibbon)	ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল
সাদা গণ্ডার (White Rhinoceros)	আফ্রিকার পূর্ব অঞ্চল
এশিয়ার এক-শৃঙ্গ গণ্ডার (Asiatic One-horned Rhinoceros)	ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ও নেপাল
এশিয়ার বুনো গাধা (Asiatic Wild Ass)	ভারতের কচ্ছ ও লাদাক অঞ্চল
বুনো ঘোড়া (Wild Horse)	মঙ্গোলিয়া
নীল তিমি (Blue Whale)	সকল মহাসাগর

বিগত কয়েক দশক যাবৎ মানুষ ক্রমেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের দ্বারা নিজ পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইতে থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিজেরই অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে।

সেইজন্য, ইদানীং প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources) সংরক্ষণের জোর তাগিদ উঠিয়াছে।

কেবল নিজেদের ভোগের জন্যই নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও যাহাতে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্যও সংরক্ষণের প্রয়োজন। নিতান্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছাড়াও, সংরক্ষণের অন্য প্রয়োজনীয়তাও আছে—বনের পশু-পাখি ও গাছপালা অবলোকন অবসর বিনোদনের অন্যতম উপকরণ।

কি কি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন (What needs conservation)

জল, বায়ু, সৌরশক্তি, খনিজ, মাটি, বন্য প্রাণী এবং বনের গাছপালা—এইগুলি সবই প্রাকৃতিক সম্পদ। সৌরশক্তি, বায়ু, সমুদ্রের লোনা জল—এইগুলি প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ (Inexhaustible resources)। ইহাদের প্রকৃত ক্ষয় অথবা অপচয় খুব একটা ঘটে না—পরিবেশে সবসময় এইগুলির পরিমাণের সমতা বজায় থাকে। কিন্তু মিঠা জল, মাটি, বনের গাছপালা এবং বন্য প্রাণী ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ (Exhaustible resources)। কারণ, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এইগুলির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। অতএব, প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

সংরক্ষণ কি (What is conservation)

ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলির ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নয়, এবং তাহা সম্ভবও নয়। বাস্তব্য-বিদ্যার জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে, সুষ্ঠুভাবে এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক সম্পদের সুচিন্তিত ব্যবহার করা, সবরকম অপচয় বন্ধ করা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে **সম্পদের পুনরাবর্তন** (Recyclization of resources) করা সংরক্ষণের মূল কথা।

জল সংরক্ষণ (Conservation of water)

বন্যার সময় যে কেবল মিঠা জলের অপচয় হয়, তাহাই নয় ; ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের গবাদি পশু, শস্য এবং ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়। বর্তমানে বন্যা প্রতিরোধ ও মিঠা জলের অপচয় বন্ধ করা এবং উন্নতধরনের সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজনে নদীতে বাঁধ নির্মাণ করিয়া এবং স্থানে স্থানে জলাশয় খনন করিয়া, বন্যার অতিরিক্ত জল এবং বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখা হয়। পরে, প্রয়োজনের সময় এই সঞ্চিত জল চাষবাসের কাজে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে মিঠা জলের সংরক্ষণ করা হয়।

মাটী সংরক্ষণ (Conservation of soil)

প্রায় 18 সেন্টিমিটার পুরু মাটির উপরের স্তরে উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান অর্থাৎ খনিজ লবণ ও জল থাকে এবং মাটিতেই উদ্ভিদ আটকাইয়া থাকে। কাজেই, গাছপালার সংরক্ষণের প্রয়োজনে, মিঠা জলের মতো, মাটির এই উপরের স্তরেরও সংরক্ষণ প্রয়োজন। ভূমিক্ষয় (Erosion) এবং উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস (Depletion —এই দুই উপায়ে মাটির উপরের স্তর বিনষ্ট হয়।

জল-প্রপাত, জল-প্রবাহ, এবং প্রবল বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে ভূমিক্ষয় হয়। ইহা ছাড়া বন-জঙ্গল কাটিয়া ফেলা, যথেচ্ছ চাষ-আবাদ ও গোচারণের ফলেও ভূমিক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। একই জমিতে বছরের পর বছর একই ফসল ফলানোর ফলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়।

কৃষি বিজ্ঞানীরা মাটি সংরক্ষণের বিজ্ঞান-সম্মত নানা উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রধানতঃ কাশ, দূর্বাঘাস, নানাধরনের গুল্ম এবং কয়েক রকম বৃক্ষ ইত্যাদি মৃত্তিকা ধারক (soil binding) উদ্ভিদ রোপণ করিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। ঢালু জমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে মৃত্তিকা-ধারক উদ্ভিদ রোপণ করিয়া এইভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করা হয়। বৃক্ষ রোপণের দ্বারা নূতন বনভূমি সৃষ্টি করিয়াও ভূমিক্ষয় বন্ধ করা হয়। শস্য-পর্যায় (Rotation of crop)-এর দ্বারা (অর্থাৎ একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল পর্যায়ক্রমে ফলাইয়া), এবং জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া মাটির উৎপাদিকা-শক্তি বজায় রাখা হয়।

বন সংরক্ষণ (Conservation of forest)

বনের অর্থনৈতিক মূল্য অপরিসীম। বনের কয়েক রকমের বৃক্ষ হইতে আসবাব-পত্র প্রস্তুতের উপযোগী কাঠ, এবং অন্য কয়েক ধরনের বৃক্ষ ও বাঁশ হইতে রেয়ন (Rayon), কাগজ, তারপিন (Turpentines), রজন (Resins) এবং রঙ ইত্যাদি প্রস্তুতের কাঁচ মাল পাওয়া যায়। নানাধরনের বন্য প্রাণীর আবাসস্থল বন। বনাঞ্চলে ভূমিক্ষয় এবং বন্যা প্রতিহত হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বন-বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থায় বন সংরক্ষণ করা হয়। (1) গাছ কাটার সময় চারা গাছগুলির ক্ষতি এড়াইয়া চলা, (2) গাছ কাটিয়া ফেলার পর উহাদের কর্তিত প্রান্ত হইতে উদ্ভূত ফেঁকড়াগুলিকে নিয়মিত ছাঁটিয়া ফেলা, (3) কাষ্ঠল লতা-জাতীয় আরোহী উদ্ভিদগুলিকে নিয়মিত কাটিয়া ফেলা, (4) ঘেঁষাঘেঁষি জন্মানো চারাগাছের কিছু

কিছু উপ্‌ড়াইয়া ফেলা, (5) রোগাক্রমণ এবং অগ্নিতে বিনষ্ট বনভূমিতে নূতন করিয়া বৃক্ষ রোপণ করা, (6) বর্ধিষ্ণু গাছগুলিকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করা, (7) কেবল পরিণত গাছ কাটা, (8) নানারকম উদ্ভিদ-রোগের দমন করা, (9) বনে আগুন লাগার ভয় দূর করা ইত্যাদি উপায়ে বন সংরক্ষণ করা যায়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (Conservation of wildlife)

বনই যে সমস্ত প্রাণীর স্বাভাবিক বসতি, তাহাদের সকলকেই মিলিতভাবে **বন্যপ্রাণী (Wildlife)** বলা হয়। অবশ্য, বনের যে সমস্ত প্রাণী বড় আকৃতি, দৈহিক সৌন্দর্য ইত্যাদি কোনও কারণে সহজেই দৃষ্টি-আকর্ষী, সচরাচর তাহাদের বন্যপ্রাণী বলে। নদী, হ্রদ, সমুদ্র ইতাদির জলে যে সব প্রাণীর স্বাভাবিক বসতি (যেমন—কুমির, কচ্ছপ, মাছ, শুক্তি ইত্যাদি), তাহাদেরও বন্যপ্রাণী বলা যায়।

ইদানীং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জোরালো প্রচেষ্টা চলিতেছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয় দুইভাবে—প্রথমতঃ, প্রাণি-হত্যা বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ; দ্বিতীয়তঃ, প্রাণীদের স্বাভাবিক বসতি অবিকৃত রাখিয়া অথবা ক্ষতিগ্রস্ত বসতির পুনর্বিন্যাস করিয়া।

ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষৎ (Indian Board of Wildlife) ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়ে পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই পর্ষদের পরামর্শ অনুযায়ী, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বন-বিভাগ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন। 1972 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত **বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন [Wildlife (Protection) Act]** নামের আইনের বলে বন্যপ্রাণীর যথেচ্ছ হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই আইনে, যে সমস্ত প্রাণী বিলুপ্তির পথে, তাহাদের হত্যা করা একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে। যেসব বন্যপ্রাণীর সংখ্যা আগের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে, অথচ যাহাদের অবস্থা উপরোক্ত প্রাণীদের মতো ততটা আশঙ্কাজনক নয়, তাহাদের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রয়োজনে উপযুক্ত অধিকারীর লিখিত অনুমতিক্রমে সীমিত-সংখ্যক প্রাণী হত্যা করা চলে। কিন্তু প্রজনন ঋতু (Breediing season)-তে এই সমস্ত প্রাণী এবং আরও অনেক প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ।

নির্দিষ্ট অঞ্চলের বনকে **সংরক্ষিত বন (Reserve Forest), অভয়ারণ্য (Sanctuary)** অথবা **জাতীয় বনভূমি (National Park)** ঘোষণা করিয়া বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক বসতি (যতদূর সম্ভব) অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হয়।

রাজ্য সরকারের বন-বিভাগের নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনও বনকে সংরক্ষিত বন বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এইরকম বনে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে গবেষণা এবং ঐরকম কোনও বিশিষ্ট প্রয়োজনে, বন-বিভাগের লিখিত অনুমতির সাহায্যে, নির্দিষ্ট ঋতুতে সীমিত-সংখ্যক প্রাণী হত্যা করা চলে। যে সমস্ত বনে কিছু কিছু বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী পাওয়া যায়, রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সেইরকম বনকে অভয়ারণ্য নির্ধারণ করা হয়। অভয়ারণ্যে প্রাণি-হত্যা, মাছ ধরা, কাঠ কাটা ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ। জাতীয় বনভূমি মোটামুটি অভয়ারণ্যের মতো। তবে ইহা আয়তনে অনেক বড়, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। নিচের তালিকায় ভারতের কয়েকটি জাতীয় বনভূমি এবং অভয়ারণ্যের নাম, অবস্থান এবং উহাদের কোন্‌টিতে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ বন্যপ্রাণী পাওয়া যায়, তাহা দেওয়া হইল।

নাম	অবস্থান	উল্লেখযোগ্য প্রাণী
জাতীয় বনভূমি (National Park):		
করবেট	উত্তর প্রদেশ	বাঘ, চিতাবাগ, হাতি, ভালুক, হরিণ ইত্যাদি
হাজারিবাগ	বিহার	বাঘ, চিতাবাগ, ভালুক, হাতি হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি
কান্‌হা	মধ্যপ্রদেশ	বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ, ভারতীয় বাইসন ইত্যাদি
অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary):		
চাপ্‌রামারি গরুমারা	পশ্চিমবঙ্গ	গণ্ডার, বাঘ, হাতি, হরিণ, ভারতীয় বাইসন ইত্যাদি
জল্‌দাপাড়া		
মহানদী	ঐ	বাঘ, হাতি, ভারতীয় বাইসন ইত্যাদি
কাজিরাঙা	আসাম	গণ্ডার, বাঘ, বুনো মহিষ, হাতি ইত্যাদি
গির	গুজরাট	সিংহ, নীলগাই, বুনো শূয়ার ইত্যাদি
দাচিগাম	কাশ্মীর	বারাশিঙ্গা, কস্তুরিমৃগ, ভালুক ইত্যাদি
পেরিয়ার	কেরালা	বাঘ, হাতি, ভারতীয় বাইসন, বুনো কুকুর ইত্যাদি

অনেক সামুদ্রিক প্রাণী (যেমন তিমি) এবং পরিযায়ী পাখিরা (Migratory birds) এক দেশের আওতা ছাড়িয়া অন্য দেশের আওতায় চলিয়া যায়। এই সমস্ত প্রাণীদের, এবং অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের

সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সঙ্ঘ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) নামের আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং অর্থ সাহায্য দিয়া থাকেন। এই সংস্থার ব্যাঘ্র প্রকল্প (Tiger Project) নামের প্রকল্পে বাঘকে বিলুপ্তি হইতে রক্ষা করার জন্য 1972 খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাঘ মারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের অঙ্গীকার করা অন্যতম নাগরিক দায়িত্ব বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

10

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা
(Practical Experience)

পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে জীবনের নানা ধর্ম সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই পরিচ্ছেদে এইরকম কয়েকটি পরীক্ষা বর্ণনা করা হইল।

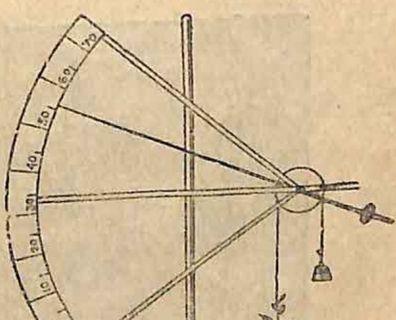
উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরীক্ষা (Experiments to show growth in plants)

চতুর্থ পরিচ্ছেদে উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। নিচে উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলের বৃদ্ধি প্রদর্শনের জন্য দুইটি পরীক্ষা বর্ণনা করা হইল।

কাণ্ডের বৃদ্ধি প্রদর্শনের পরীক্ষা (Experiments to show growth of stem)

উপকরণ (Requirements)—আর্ক ইণ্ডিকেটর (Arc indicator) নামক যন্ত্র, টবসমেত সতেজ চারা-গাছ, ওজন, টোন সুতা।

আর্ক ইণ্ডিকেটর যন্ত্রের বর্ণনা (Description of Arc indicator)—একটি বৃত্তের একের চার ভাগ নিয়া এই যন্ত্রের প্রধান অংশ আর্কটি গঠিত। আর্কের দেহটি অংশাঙ্কিত ; ইহার কেন্দ্রে একটি কপিকল (pulley) লাগানো থাকে। একটি নির্দেশক (pointer) কপিকল হইতে আর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কপিকল ঘুরিতে থাকিলে, নির্দেশক আর্কের গায়ে উঠা-নামা করিতে পারে।



69 নং চিত্র—আর্ক ইণ্ডিকেটর-এর সাহায্যে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির পরীক্ষা।

পরীক্ষা (Experiment)—একটি শক্ত টোন সুতা ইণ্ডিকেটর-এর কপিকলের মধ্য দিয়া দুই পাশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। সুতার এক প্রান্ত

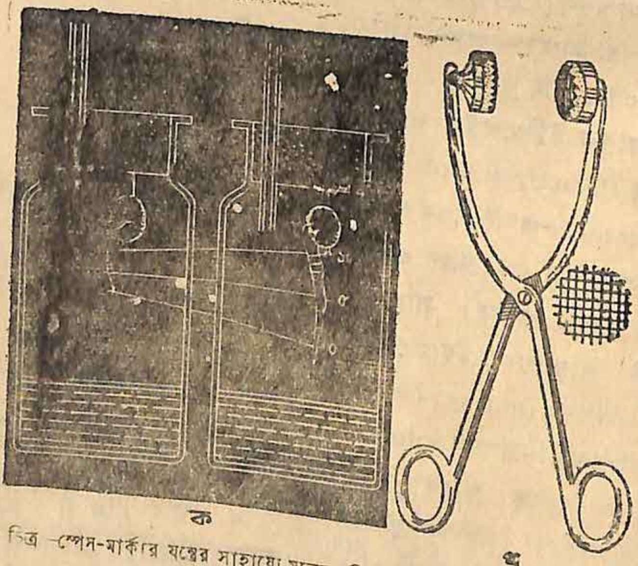
চারাগাছের ডগায় বাঁধিয়া, অন্য প্রান্তটি উপযুক্ত ওজনের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইল (এমন ওজন ঠিক করিতে হয়, যাহাতে ওজনের ভারে চারাগাছের ডগা ছিঁড়িয়া না যায়, অথচ সুতাটি টান-টান থাকে)। আর্কের গায়ে নির্দেশকের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া, ঐ অবস্থায় প্রায় বারো ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া হইল।

নিরীক্ষা (Observation)—বারো ঘণ্টা পরে দেখা গেল, নির্দেশক আগের স্থান হইতে বেশ কিছুটা উঠিয়া গিয়াছে। কতটা উপরে উঠিয়াছে, তাহা আর্কের গায়ে লিখিত পরিমাপ হইতে বোঝা গেল।

সিদ্ধান্ত Inference)—কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে ওজনের দিকের সুতা নামিতে থাকে এবং নির্দেশকটি উপরে উঠিতে থাকে। নির্দেশকের অবস্থানের পার্থক্য হইতে উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিমাপ সহজে নির্ণয় করা যায়।

মূলের বৃদ্ধি প্রদর্শনের পরীক্ষা (Experiment to show growth of root)

স্পেস-মার্কার (Space-marker) নামক যন্ত্রের, সাহায্যে মূলের বৃদ্ধি নির্ণয় করা যায়।



70 নং চিত্র—স্পেস-মার্কার যন্ত্রের সাহায্যে মূলের বৃদ্ধি প্রদর্শনের পরীক্ষা : ক. মূলের বৃদ্ধি (বাঁয়ে প্রাথমিক. এবং ডাইনে পরের অবস্থা) : খ. স্পেস-মার্কার যন্ত্র (বাঁয়ে) এবং উহার চাকৃতিকে বর্গাকার উঁচু-নিচু দাগ (ডাইনে)।

যন্ত্রের বর্ণনা—স্পেস-মার্কার যন্ত্রটি কাঁচির মতো। ইহার হাতল দুইটির বিপরীত দিকে দুই প্রান্তে দুইটি চাকৃতি থাকে। চাকৃতি দুইটিতে ছক-কাগজের

মতো বর্গাকার উঁচু-নিচু দাগ-কাটা থাকে। চাক্‌তিটির উপর কালো কালি মাখাইয়া, হাতলে চাপ দিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের অঙ্গ চিহ্নিত করা হয়।

উপকরণ (Requirements)—বড় মুখ-যুক্ত একটি বোতল, ছিদ্র-যুক্ত একটি রবারের ছিপি, অঙ্কুরিত বীন-বীজ, ছোট কাচের নল এবং স্পেস-মার্কার যন্ত্র।

পরীক্ষা (Experiment)—অঙ্কুরিত বীন-বীজের মূলের অগ্রভাগের কয়েক মিলিমিটার উপরে স্পেস-মার্কারের সাহায্যে দাগ দেওয়া হইল। ইহার পর বীন-বীজটিকে একটি পিনের সাহায্যে ছিপির নিচের দিকে আট্‌কাইয়া দেওয়া হইল। বোতলে অল্প জল নিয়া, বীজসহ ছিপিটির সাহায্যে বোতলটি ভালভাবে বন্ধ করা হইল। ইহাতে বীন-বীজটি বোতলের ভিতরে ছিপির ঠিক নিচে ঝুলিয়া থাকে। ছোট কাচের নলটি ছিপির ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করানো হইল; ইহাতে বোতলের মধ্যে বায়ু-চলাচল অব্যাহত থাকে। এই অবস্থায় কয়েকদিন রাখিয়া দেওয়া হইল।

নিরীক্ষা (Observation)—কয়েকদিন পরে দেখা গেল, মূলের দাগগুলি পরস্পর দূরে সরিয়া গিয়াছে।

সিদ্ধান্ত (Inference)—মূলের বৃদ্ধির ফলেই দাগগুলি দূরে সরিয়া গিয়াছে।

আলোকবৃত্তি প্রদর্শনের পরীক্ষা (Experiment to show phototropism)*

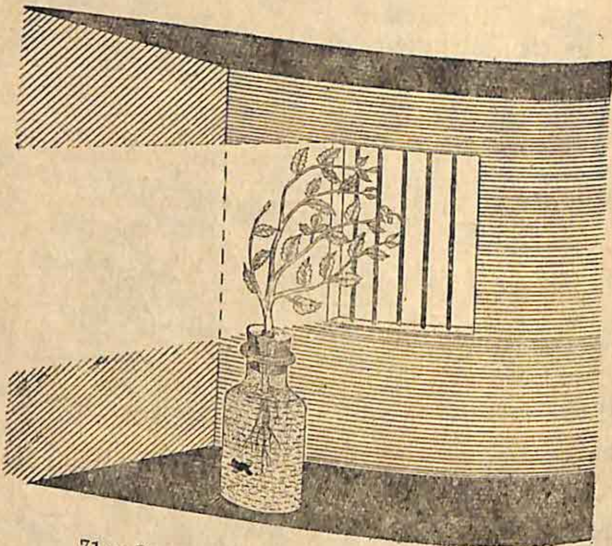
উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণতঃ আলোক-অনুকূলবর্তী অর্থাৎ আলোর গতিপথের দিকে ধাবিত হয়। নিচের পরীক্ষার সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা যায়।

উপকরণ (Requirements)—(1) দুইটি ছিদ্র-যুক্ত একটি রবারের ছিপি, বাঁকানো কাচনল, একটি বড় বোতল, কলের অথবা কূয়ার জল এবং একটি সতেজ চারাগাছ; অথবা (2) টবে জন্মানো একটি চারাগাছ।

পরীক্ষা (Experiment)—বোতলটিকে কলের অথবা কূয়ার জল দিয়া প্রায় ভর্তি করিয়া, ছিপির সাহায্যে মুখটি ভালভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এখন ছিপির একটি ছিদ্র দিয়া চারাগাছটি এমনভাবে প্রবেশ করানো হইল, যাহাতে কেবল উহার মূল অংশ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। ছিপির অন্য ছিদ্র দিয়া বাঁকানো কাচনলটি প্রবেশ করানো হইল। ইহাতে বোতলের

* আলোকবৃত্তি ও অভিকর্ষবৃত্তি সম্বন্ধে নবম শ্রেণীতে আলোচনা করা হইয়াছে।

মধ্যে বায়ু-চলাচল অব্যাহত থাকে। কোনও অন্ধকার ঘরের একটিমাত্র জানালা খুলিয়া, বোতল সমেত অথবা টবে জন্মানো চারাগাছটিকে কয়েকদিন জানালার ধারে রাখিয়া দেওয়া হইল।



71 নং চিত্র—কাণ্ডের আলোকবৃত্তি প্রদর্শনের পরীক্ষা

নিরীক্ষা (Observation)—চার-পাঁচ দিন পরে দেখা গেল, চারাগাছের কাণ্ড জানালার দিকে ঝুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার মূল স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সিদ্ধান্ত (Inference)—উপরের পরীক্ষা দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদের কাণ্ড আলোর গতিপথের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই কাণ্ড আলোক-অনুকূলবর্তী অঙ্গ।

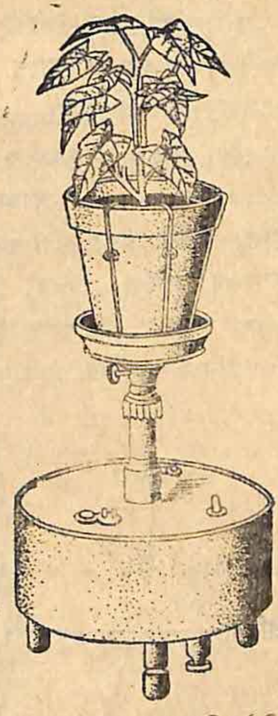
অভিকর্ষবৃত্তি প্রদর্শনের পরীক্ষা (Experiment to show geotropism)

উপকরণ (Requirements)—ক্লাইনোস্টাট (Clinostat) নামক যন্ত্র, টবসমেত একটি চারাগাছ।

ক্লাইনোস্টাট যন্ত্রের বর্ণনা—ক্লাইনোস্টাট যন্ত্র একটি লম্বা দণ্ড এবং উহার উপর অবস্থিত একটি বৃত্তাকার চাকতি নিয়া গঠিত। যন্ত্রটিকে উল্লম্ব অথবা অনুভূমিক ভাবে রাখা যায়। দণ্ডের বিপরীত প্রান্তে একটি ঘটিকা যন্ত্র থাকে। ঘটিকা-যন্ত্রটি চালু করিলে দণ্ডটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘণ্টায় এক হইতে চার বার ঘুরিতে পারে; ফলে দণ্ডের উপরের চাকতিটিও ঘুরিতে পারে।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা (**Experiment and observation**)—টবসমেত চারাগাছটি চাকতির উপর রাখিয়া, উহাকে একটি শিকলের সাহায্যে চাকতির সঙ্গে আঁটিয়া দেওয়া হইল। দণ্ডটিকে অনুভূমিকভাবে রাখিয়া ঘটিকা-যন্ত্রটি চালু করা হইল। দুইদিন এই অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে গাছটিকে ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাড়িতে দেখা গেল। পরে যন্ত্রটি বন্ধ করিয়া, আবার গাছটিকে ঐ অবস্থায় দুইদিন রাখিয়া দেওয়া হইল। দেখা গেল, চারাগাছের কাণ্ডটি দণ্ডের সঙ্গে সমকোণে বাঁকিয়া গিয়াছে।

সিদ্ধান্ত (**Inference**)—ঘটিকা-যন্ত্রটি যখন ঘুরিতেছিল, তখন অভিকর্ষক বল চারাগাছের সব জায়গায় সমানভাবে কার্যকরী হওয়ায়, গাছটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাড়িয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায়, যন্ত্রটি বন্ধ করার পর, কাণ্ড প্রতিকূল-অভিকর্ষী হওয়ায়, উহা সমকোণে বাড়ে ; অর্থাৎ, উপরের দিকে বাঁকিয়া যায়।



72 নং চিত্র—কাণ্ডের অভিকর্ষবৃত্তির পরীক্ষা (চারাগাছসহ ক্লাইনোস্টাট যন্ত্র)।

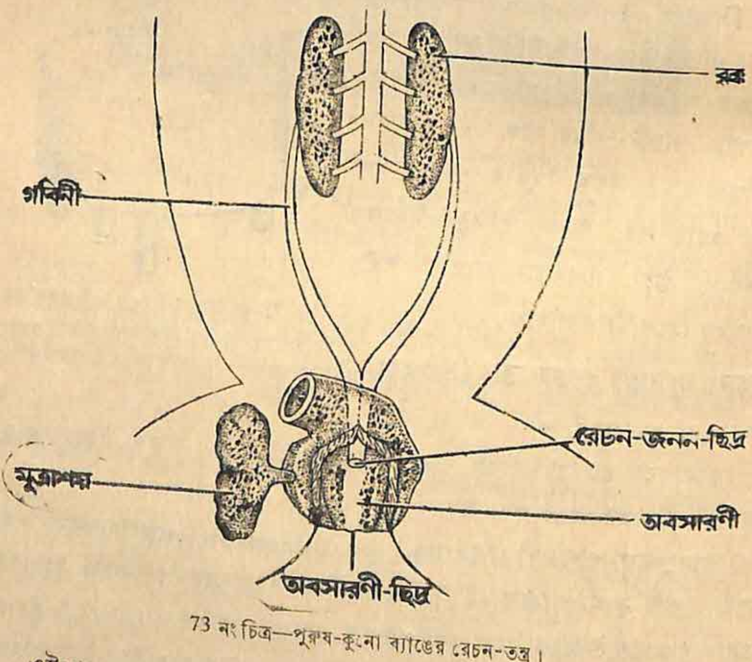
কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্র (Excretory system of toad)*

কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্র ব্যবচ্ছেদ (Dissection) করিয়া, ইহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

ব্যবচ্ছেদ-প্রণালী (**Method of dissection**)—ক্লোরোফরম্ দিয়া মারা একটি কুনো ব্যাঙকে ট্রে (Tray)-র উপর এমনভাবে রাখা হইল, যাহাতে উহার অঙ্কদেশ উপরের দিকে এবং পৃষ্ঠদেশ নিচের দিকে থাকে। এখন উহার অগ্র-পদ ও পশ্চাৎ-পদ চারটি আল্‌পিনের সাহায্যে ট্রে-র সঙ্গে টান-টান করিয়া আটকানো হইল। ইহার পর পরিমাণমতো জল দিয়া ট্রে পূর্ণ করিয়া বড় চিমটা ও বড় কাঁচির সাহায্যে অঙ্কীয় মধ্যরেখার চর্মে একটি ছোট ছিদ্র করা হইল এবং

* কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্র, জনন-তন্ত্র, হৃৎপিণ্ড এবং অ্যাওর্টিক আর্চের বিবরণ অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যনির্ঘণ্টের অন্তর্গত।

ছিদ্রের মধ্যে বড় কাঁচির ভোঁতা দিকটি প্রবেশ করাইয়া, সমগ্র দেহের অঙ্কীয় মধ্যরেখা-বরাবর চর্মকে লম্বালম্বি কাটিয়া ফেলা হইল। একই পদ্ধতিতে অগ্র-পদ ও পশ্চাৎ-পদের চর্ম কাটা হইল। এখন চর্মের কাটা অংশগুলি পেশী হইতে ছাড়াইয়া, দেহের দুই পাশে টান-টান করিয়া আল্‌পিনের সাহায্যে ট্রে-র সঙ্গে আট্‌কাইয়া দেওয়া হইল। পেশী-স্তরের অঙ্কীয় মধ্যরেখা-বরাবর একটি কালো দাগ দেখা গেল। প্রকৃতপক্ষে অ্যান্টিরিয়র অ্যাব্‌ডোমিনাল শিরা (Anterior abdominal vein)-র অবস্থান উহা নির্দেশ করে। আগের মতো, কাঁচির ভোঁতা দিকটি দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঐ কালো দাগের দুই পাশ বরাবর পেশী-স্তর কাটিয়া ফেলিয়া, শিরাটিকে সাবধানে কাটা পেশী হইতে ছাড়াইয়া নেওয়া হইল। ঐ পেশীর টুকরা দূর করার পর পেশী-স্তর দুইটিকেও চর্মের মতো টান-টান করিয়া ট্রে-র সঙ্গে আট্‌কাইয়া দেওয়া হইল।

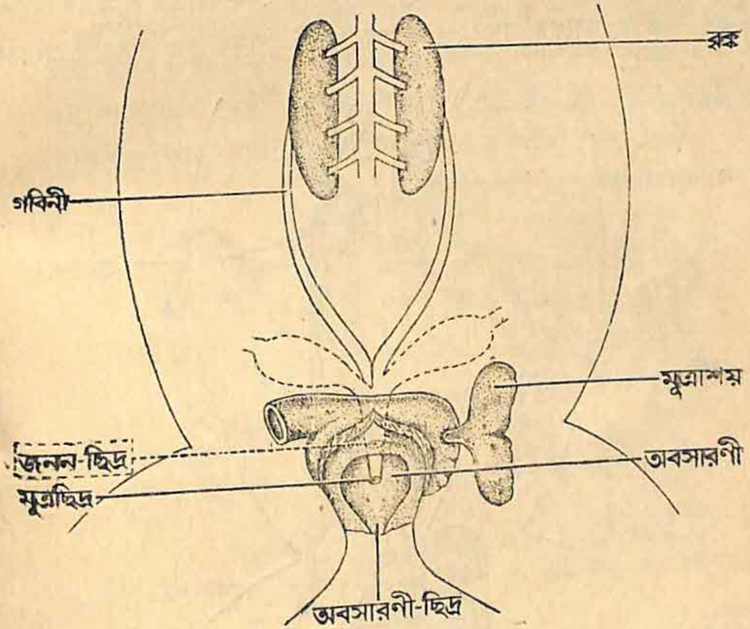


73 নং চিত্র—পুরুষ-কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্র।

এইভাবে দেহ-গহ্বর উন্মুক্ত করার পর বৃক্ক, গবিনী মূত্রাশয় এবং অবসারণী ছাড়া অন্যান্য অবাঞ্ছিত অঙ্গ কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল। বৃক্কের উপরের প্রান্তে যুক্ত মেদপুঞ্জ সাবধানে তুলিয়া ফেলা হইল। পুরুষ-ব্যাঙের ক্ষেত্রে বৃক্কের অঙ্কতলে অবস্থিত বিডার্‌স অর্‌গান (Bidder's organs) এবং শুক্রাশয় একইভাবে বাদ

দেওয়া হইল। ইহার পর, অবসারণী-ছিদ্রের মধ্য দিয়া বড় কাঁচির ভোঁতা দিক প্রবেশ করাইয়া, শ্রোণীচক্রকে কাটিয়া দুই ভাগ করা হইল। এখন একটি আল্‌-পিনের মাথার দিক দিয়া অনুসন্ধান করিয়া অবসারণীর মধ্যে অবস্থিত রেচন-জনন-ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করা হইল।

স্ত্রী-ব্যাঙের ক্ষেত্রে একইভাবে, ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালীসহ অন্যান্য অবাঞ্ছিত অঙ্গ কাটিয়া বাদ দেওয়ার পর, একই পদ্ধতিতে শ্রোণীচক্র কাটিয়া ফেলিয়া,



74 নং চিত্র—স্ত্রী-কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্র।

অবসারণীর মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, দুইটি ছিদ্র পাওয়া গেল। ইহাদের মধ্যে অগ্র-প্রান্তের দিকে অবস্থিত ছিদ্রটি জনন-ছিদ্র, অন্যটি মূত্র-ছিদ্র।

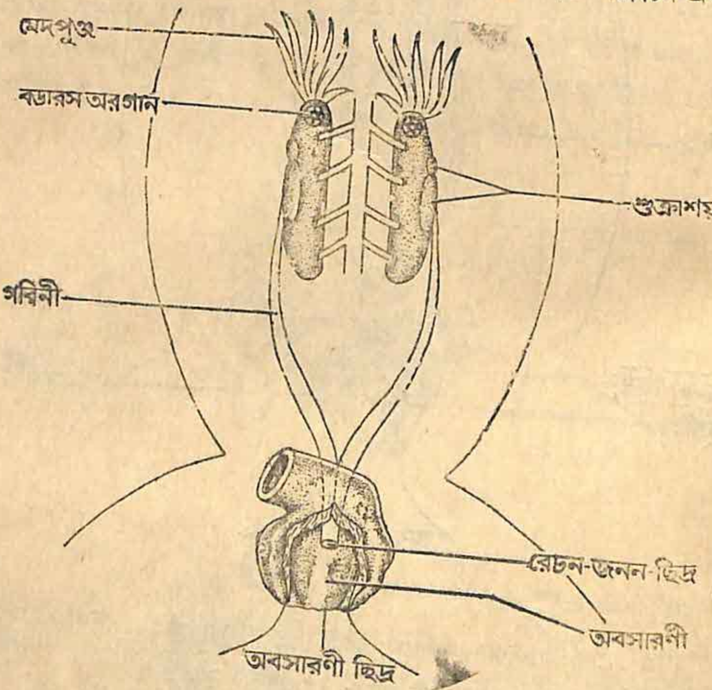
পুরুষ-কুনো ব্যাঙের জনন-তন্ত্র (Reproductive system of male toad)

পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে দেহ-গহ্বর উন্মুক্ত করার পর বৃক্ক, শুক্রাশয়, বিডার্স অর্গান, মেদপুঞ্জ, গবিনী এবং অবসারণী ছাড়া অন্যান্য অবাঞ্ছিত অঙ্গ কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল। আগের মতো উপায়ে শ্রোণীচক্রকে কাটিয়া দুইভাগে ভাগ করিয়া, অবসারণীর মধ্যে রেচন-জনন ছিদ্রটি খুঁজিয়া বাহির করা হইল (75 নং চিত্র)।

বৃক্ক জনন-তন্ত্রের অংশ না হইলেও, ইহার সঙ্গে শুক্রাশয় আট্‌কাইয়া থাকে বলিয়া, উহা বাদ দেওয়া হইল না। বিডার্‌স অর্‌গান কাজবিহীন। ইহা ক্ষয়-প্রাপ্ত ডিম্বাশয়। মেদপুঞ্জ জননে পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ধারণা।

কুনোব্যাঙের হৃৎপিণ্ড ও অ্যাওর্টিক আর্‌চ (Heart and aortic arches of toad)

আগের মতো দেহ-গহ্বর উন্মুক্ত করার পর, দেহ-গহ্বরের সামনের অংশে, বক্ষের অঙ্কীয় ভাগের মধ্যরেখা-বরাবর একটি শাঙ্কব বস্তু সঙ্কোচন-প্রসারণ



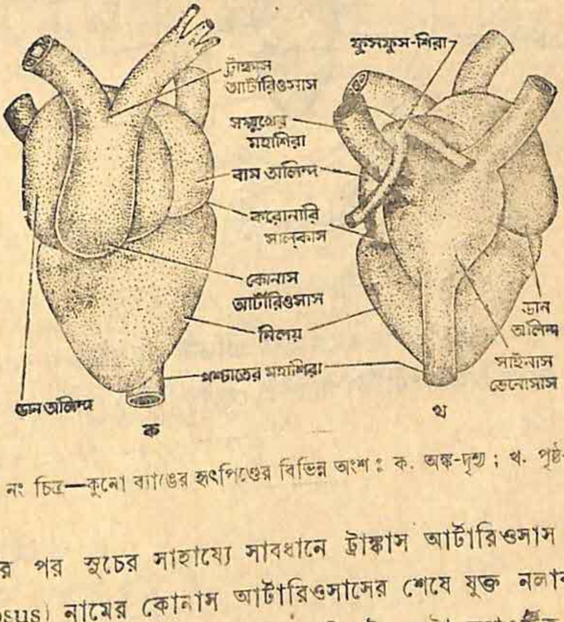
75 নং চিত্র—পুরুষ-কুনো ব্যাঙের জনন-তন্ত্র।

করিতে দেখা গেল—ইহাই ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডটি হৃদ্ধরা ঝিল্লী নামক পর্দা দিয়া আবৃত থাকে। ছোট কাঁচি ও চিমটার সাহায্যে খুব সাবধানে এই পর্দাটি কাটিয়া ফেলা হইল।

কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড মোটামুটি শাঙ্কব। ইহার শীর্ষদেশ দেহের পিছনের প্রান্তের দিকে থাকে। পাঁচটি প্রকোষ্ঠ দিয়া ইহা গঠিত। কিন্তু অঙ্ক-দৃশ্যে অথবা পৃষ্ঠ-দৃশ্যে এককালে মাত্র চারটি প্রকোষ্ঠের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়

(76 নং চিত্র)। অঙ্ক-দৃশ্যে নলাকার কোনাস আর্টারিওসাস (Conus arteriosus), উহার পিছন দিকে পাশাপাশি অবস্থিত ডানদিকে ছোট বাম অলিন্দ (Left auricle), বাঁদিকে বড় দক্ষিণ (বা ডান) অলিন্দ (Right auricle) এবং এই তিনটি প্রকোষ্ঠের নিচের দিকে যুক্ত শাঙ্কব ও বাদামী রঙের নিলয় (Ventricle) দেখা গেল। অলিন্দ দুইটির মধ্যবর্তী অংশে একটি খাঁজ, এবং অলিন্দ দুইটি ও নিলয়ের সংযোগস্থলে একটি বড় খাঁজ দেখা গেল।

হৃৎপিণ্ডটি সাবধানে উল্টাইয়া দিলে, পৃষ্ঠ-দৃশ্যে একটি ত্রিকোণাকার থলির মতো অংশ দেখা গেল। ইহার নাম সাইনাস ভেনোসাস (Sinus venosus)। এই প্রকোষ্ঠের তিন কোণার সঙ্গে তিনটি মহাশিরা যুক্ত, আবার বাম অলিন্দের গহ্বরের সঙ্গে ফুসফুস-শিরা দুইটি যুক্ত থাকিতে দেখা গেল।

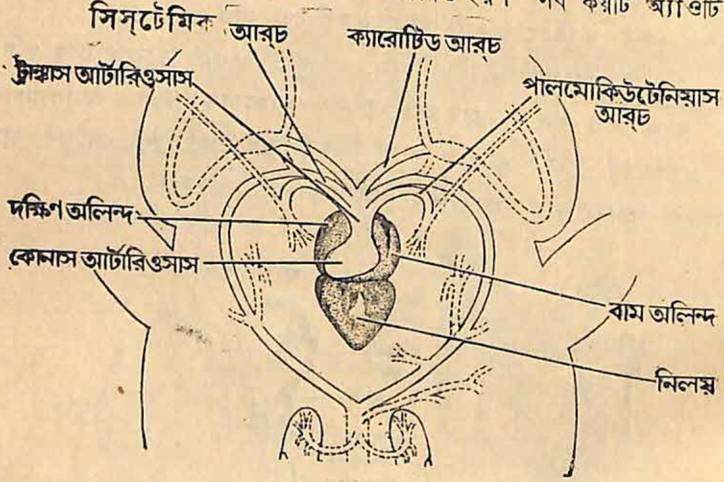


76 নং চিত্র—কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ : ক. অঙ্ক-দৃশ্য ; খ. পৃষ্ঠ-দৃশ্য।

ইহার পর সুচের সাহায্যে সাবধানে ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস (Truncus arteriosus) নামের কোনাস আর্টারিওসাসের শেষে যুক্ত নলাকার অংশের পর্দার মতো আবরণকে কাটিয়া ফেলিলে, তিনটি মোটা অ্যাওর্টিক আর্চ দেখা গেল। ইহাদের মধ্যে যেটি অগ্রভাগের দিকে অবস্থিত, তাহার নাম **ক্যারোটিড আর্চ** (Carotid arch)। ইহা দেহের সামনের দিকে গিয়াছে দেখা গেল। মাঝের আর্চটির নাম **সিস্টেমিক আর্চ** (Systemic arch)। আর্চ তিনটির মধ্যে এইটিই সবচেয়ে লম্বা। প্রতি পাশের সিস্টেমিক আর্চ প্রথমে দেহের পরিধির দিকে চলিয়া যায়, কিন্তু পরে গ্রাসনালীর পাশ দিয়া বাঁকিয়া গ্রাসনালীর পৃষ্ঠভাগে চলিয়া যায় এবং সেখানে অন্য পাশের

সিস্টেমিক আর্চের সঙ্গে মিলিত হইয়া পৃষ্ঠ্য মহাধমনী (Dorsal aorta) নামের মোটা ধমনী সৃষ্টি করে।

পিছনের দিকে অবস্থিত তৃতীয় অ্যাওর্টিক আর্চের নাম **পাল্‌মো-কিউটেনিয়াস আর্চ (Pulmo-cutaneous arch)**। ইহা সবচেয়ে ছোট অ্যাওর্টিক আর্চ। ইহা ফুস্ফুসের দিকে ধাবিত হয়। সব কয়টি অ্যাওর্টিক



77 নং চিত্র—কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড ও অ্যাওর্টিক আর্চ।

আর্চ যুগ্ম অর্থাৎ জোড়া হিসাবে থাকে এবং প্রতিটি অ্যাওর্টিক আর্চের নানা অংশ হইতে অনেকগুলি ধমনী উৎপন্ন হইয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে (77 নং চিত্র)।

অনুশীলনী

[দশম শ্রেণী]

প্রথম পরিচ্ছেদ :

1. নার্ভ-তন্ত্র কাহাকে বলে? নার্ভ-তন্ত্রের কাজ কি?

2. নিউরোনের গঠন ও কাজ বল। কত রকমের নিউরোনের কথা জান? তাহাদের প্রত্যেকের বিষয়ে কিছু লেখ। প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কন কর।

3. নার্ভ ও নিউরোনের সম্পর্ক বুঝাইয়া বল।

4. অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান পার্থক্য কি কি?

5. স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্রের সঙ্গে প্রান্তস্থ ও কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রের সম্পর্ক কিরকম, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বল।

6. প্যারাসিম্প্যাথেটিক ও সিম্প্যাথেটিক তন্ত্রের কাজের ধারা যে পরস্পর বিপরীত, তাহা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি চিত্র অঙ্কন কর।

7. প্রাতবর্ত ক্রিয়া কি? একটি সরল ও একটি জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ দাও।

8. জ্ঞানেন্দ্রিয় কাহাকে বলে? মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টি ও কি কি? কোনও একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

9. মেরুদণ্ডী প্রাণীর কান কি কাজ করে? মাছের কি কান আছে? ইহারা কি শুনিতে পায়?

10. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) উদ্দীপক; (খ) নিউরোন; (গ) নার্ভ; (ঘ) সাইন্যাপ্‌স; (ঙ) প্রতিবর্ত ক্রিয়া; (চ) উপযোজন; (ছ) একনেত্রদৃষ্টি ও দ্বিনেত্রদৃষ্টি; (জ) ভারসাম্য-রক্ষা; (ঝ) স্বাদ-কোরক।

11. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে 'হ্যাঁ', ও যেটি ভুল তার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) উদ্ভিদ-দেহে নার্ভ-তন্ত্র নাই বলিয়া ইহারা উত্তেজনায় সাড়া দেয় না।

(খ) আরসোলা ও ব্যাঙের মস্তিষ্কের গঠনে মিলের থেকে অমিলই বেশি।

(গ) মাছের কান নাই, ইহাদের কানের প্রয়োজনও নাই।

(ঘ) সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর করোটিক নার্ভের সংখ্যা দশ জোড়া।

(ঙ) আইভান পাভ্‌লভ প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ-তন্ত্র আবিষ্কার করেন।

(চ) কান না থাকিলে আমরা শুনিতে পাইতাম না, কিন্তু আর কোনও অসুবিধা হইত না।

(ছ) ব্যাঙ চোখের উপযোজন করিতে পারে।

(জ) শিঙি মাছের গায়ে স্বাদ-কোরক থাকে

(ঝ) বিড়ালের গুম্ফ স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

1. হর্মোন কাহাদের বলে? ইহারা কি ধরনের কাজ করে? হর্মোন, ভাইটামিন এবং খনিজ পদার্থের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি? থাকিলে, উহা কি রকম?

2. উদ্ভিদ-দেহে পাওয়া যায়, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ হর্মোনের নাম লেখ। এই হর্মোন কি কি কাজ করে, তাহা লেখ।

3. অক্সিন যে সব সময় নিচের দিকে পরিবাহিত হয় এবং ইহার অভাবে যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না, ইহা প্রমাণের জন্য একটি পরীক্ষার বিবরণ দাও।

4. উদ্ভিদ-হর্মোনগুলি কিভাবে মানুষের উপকারে লাগানো যায়, সে সম্বন্ধে কিছু লেখ।

5. পতঙ্গের নির্মোচন ও রূপান্তর কিভাবে হর্মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা সংক্ষেপে লেখ।

6. মানুষের যে কোনও একটি গুরুত্বপূর্ণ হর্মোনের নাম লেখ। ইহা কোথায় উৎপন্ন হয়? ইহার স্বাভাবিক কাজ কি? ইহা বেশি পরিমাণে ক্ষরিত হইলে কি হয়? কম ক্ষরিত হইলেই বা কি হয়?

7. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) অক্সিন ; (খ) জিব্রালিন ; (গ) সাইটোকাইনিন ; (ঘ) একডাইজোন ; (ঙ) থাইরক্সিন ; (চ) ইনসুলিন ; (ছ) অ্যাড্রিনালিন ; (জ) টেস্টোস্টিরোন ; (ঝ) এস্ট্রাডা'ওল ; (ঞ) গ্যাসট্রিন ; (ট) সিক্রিটিন।

8. নিচে প্রথম অনুচ্ছেদে কতকগুলি হর্মোনের নাম, এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উহাদের উৎপত্তি স্থলের নাম দেওয়া হইল। সঠিক যুগ্ম তৈয়ারি কর [গ/উ—এইরকমভাবে লেখ]।

(ক) অক্সিন ; (খ) একডাইজোন ; (গ) থাইরক্সিন ; (ঘ) প্যারাথরমোন ; (ঙ) ইনসুলিন ; (চ) এপিনেফ্রিন ; (ছ) টেস্টোস্টিরোন ; (জ) এস্ট্রাডা'ওল ; (ঝ) প্রোজেস্টারোন ; (ঞ) সিক্রিটিন ; (ট) থাইরোট্রপিক হর্মোন।

(অ) প্রোথোরাসিক গ্রন্থি ; (আ) প্যারাথাইরয়েড ; (ই) অ্যাড্রিনাল ; (ঈ) লাইডিগ কোষ ; (উ) কাণ্ডের শীর্ষ ; (ঊ) থাইরয়েড ; (ঋ) আইলেট্স অফ লাঙ্গারহান্স ; (এ) করপাস লিউটিয়াম ; (ঐ) পিটুইটারি ; (ও) অন্ত্রের শ্লেষ্মঝিল্লী ; (ঔ) গ্রাফিয়ান ফলিকল ;

9. নিচের বক্তব্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক, তার পাশে 'হ্যা' এবং যেটি ভুল, তার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) উদ্ভিদের ট্রপিক চলন অক্সিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
(খ) অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে হর্মোন পাওয়া যায় না।
(গ) থাইরক্সিন সংশ্লেষের জন্য আয়োডিন প্রয়োজন।
(ঘ) মাছের দেহে প্যারাথাইরয়েড থাকে না।
(ঙ) গ্লুকাগনের অভাবে মধুমেহ রোগ হয়।
(চ) ডায়াবিটোজেন হর্মোন অগ্ন্যাশয়ে উৎপন্ন হয়।
(ছ) থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরোট্রপিক হর্মোন সৃষ্টি হয় না।

10. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) — নামের হর্মোন উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। (খ) পতঙ্গের রূপান্তরে সাহায্য করে — নামের হর্মোন। (গ) থাইরক্সিনের চরম অভাবে শিশুদের —রোগ হয়। (ঘ) খুব — পরিমাণে থাইরক্সিন ক্ষরিত হইলে অক্ষিগোলক দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। (ঙ) ব্যাঙাচির রূপান্তরে — হর্মোন প্রয়োজন। (চ) — হর্মোনের অভাবে পেশীর প্রবল আক্ষেপ হয়। (ছ) মধুমেহ রোগ হয় — অভাবে। (জ) উপস্তচ্ছেদ করিলে, — হর্মোনের অভাবে মোরগের ঝুঁটি বড় হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

1. কোষ-বিভাজন কাহাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ-কোষ যে পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কন কর।

2. মাইটোসিস বলিতে কি বোঝায়? প্রাণী-কোষ ও উদ্ভিদ-কোষের মাইটোসিসের মধ্যে কি কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? সচরাচর উদ্ভিদ-দেহের ও প্রাণি-দেহের কোথায় কোথায় মাইটোসিস হয়? মাইটোসিসের তাৎপর্য কি?

. উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণি-কোষে সাইটোকাইনেসিস কিভাবে হয়, তাহার সচিত্র বর্ণনা দাও।

4. সংক্ষেপে মা'য়োসিসের প্রফেজের সচিত্র বর্ণনা দাও।

5. মাইটোসিস ও মা'য়োসিসের প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর। মা'য়োসিসের তাৎপর্য কি?

6. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) ক্রোমোজোম ; (খ) নিউক্লিয়ার স্পিনডল ; (গ) সাইটোকাইনেসিস ; (ঘ) সিন্যাপসিস ; (ঙ) কিয়াজমা ; (চ) সদৃশ বিভাজন ; (ছ) হ্রাস বিভাজন।

7. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) এক-একটি ক্রোমোজোম দুইটি করিয়া—দিয়া গঠিত। (খ) ক্রোমোজোম— নামক অংশে ক্রোমোজোমিক ফাইবারের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। (গ) মাইটোসিসের—দশায়

নিউক্লিয়াস বিলুপ্ত হয়। (ঘ) নিউক্লিয়ার স্পিন্ড্‌ল তৈয়ারি হয় মাইটোসিসের—দশায়। (ঙ) সিন্যাপ্‌সিস হয় মা'য়োসিসের প্রফেজের—পর্যায়ে। (চ) মা'য়োসিসের প্রফেজের—পর্যায়ে কিয়াজ্‌মা সৃষ্ট হয়। (ছ) মাইটোসিসের ফলে একটি নিউক্লিয়াস হইতে—টি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। (জ) মা'য়োসিসের ফলে একটি নিউক্লিয়াস হইতে—টি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

1. বৃদ্ধি বলিতে কি বোঝায়? শিশু-উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিভিন্ন দশার নাম লেখ। প্রতি দশার কিভাবে বৃদ্ধি হয়, তাহা লেখ।

2. উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিভিন্ন শর্ত উল্লেখ কর এবং ঐ শর্তগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তাহা বল।

3. প্রাণীদের বৃদ্ধি কি কি শর্তের উপর নির্ভর করে? উহারা কিভাবে বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে, তাহা লেখ।

4. বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের বৃদ্ধি কিভাবে হয়, তাহা সংক্ষেপে লেখ।

5. জনন বলিতে কি বোঝায়? অযৌন জনন এবং যৌন জননে পার্থক্য কি?

6. প্রধান তিন রকম অযৌন জননের পদ্ধতির নাম কর। এই তিন পদ্ধতিতে কোন্ কোন জীবের ক্ষেত্রে, এবং কিভাবে জনন সম্পন্ন হয়, তাহার সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

7. দ্বি-নিষেক কাহাকে বলে? ইহা কোন্ ধরনের জীবে দেখা যায়? চিত্রসহ ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

8. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) মুখ্যবৃদ্ধি কাল; (খ) পরোক্ষ পরিস্ফুরণ; (গ) দ্বি-ভাজন; (ঘ) বহু-ভাজন; (ঙ) কোরকোদ্গম; (চ) অঙ্গজ-বিস্তার; (ছ) সংশ্লেষ; (জ) নিষেক; (ঝ) মুখ্য ও গৌণ যৌন অঙ্গ; (ঞ) অপুংজনি; (ট) যমজ; (ঠ) জনিতৃ-যন্ত্র; (ড) রূপান্তর।

9. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) —কোষ-প্রাকার উপাদানগুলি প্রাথমিক কোষ-প্রাকারের ভিতরের তলে স্তরে স্তরে জমা হয়। (খ) —উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধির পর গৌণ বৃদ্ধিও হয়। (গ) অঙ্কুরোদ্গমের পর বৃদ্ধির হার খুব — থাকে। (ঘ) — — বয়সের পর হইতেই মানব-ভ্রূণকে ফিটাস বলা হয়। (ঙ) মানুষের গর্ভধারণকাল — দিন।

10. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তাহার পাশে 'হাঁ' এবং যেটি ভুল তাহার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) বৃদ্ধির সঙ্গে জননের কোনও সম্পর্ক নাই।
(খ) সূর্যমুখী আলোকবিলাসী উদ্ভিদ।
(গ) ব্যাঙের ভ্রূণকে ব্যাঙাচি বলা হয়।
(ঘ) প্রজাপতির লার্ভাকে শুঁয়াপোকা বলে।
(ঙ) পরোক্ষ পরিস্ফুরণে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় না।
(চ) চৌদ্দ হইতে আঠারো বছর বয়সে মানুষের বৃদ্ধির হার খুব বেশি হয়।
(ছ) আঠারো বছর বয়সের পর মানুষের আর বৃদ্ধি হয় না।
(জ) উদ্ভিদমাত্রেই উভলিঙ্গ।
(ঝ) অপুংজনি এক বিশিষ্ট ধরনের যৌন জনন।
(ঞ) ট্যাংরা-জাতীয় মাছ নিজেদের বাচ্চা খাইয়া ফেলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

1. বংশগতি বলিতে কি বোঝায়? মানুষের ক্ষেত্রে বংশগতির একটি উদাহরণ দাও।

2. বংশগতির বিষয়ে মেণ্ডেলের অবদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

3. সংক্ষেপে মেণ্ডেলের যে-কোনও একটি এক-লক্ষণ সঙ্করায়ণ পরীক্ষা বর্ণনা কর। ঐ পরীক্ষার ফলাফল কি রকম হইয়াছিল? ঐ ফলাফল হইতে মেণ্ডেল কি সূত্র নির্ধারণ করেন? ঐ সূত্রের বক্তব্য কি?

4. পৃথগ্‌ভবন সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? মেণ্ডেল কিভাবে এই সূত্র নির্ধারণ করেন, তাহা সংক্ষেপে বল।

5. স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্তিকরণ সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? মেণ্ডেল কিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

6. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) শুদ্ধ লক্ষণ; (খ) প্রথম ফিলিয়াল জনু; (গ) অ্যালিল; (ঘ) হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস; (ঙ) প্রকট লক্ষণ ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণ; (চ) জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ; (ছ) জিন।

7. নিচের বক্তব্যগুলির যেটি ঠিক তাহার পাশে 'হ্যাঁ' এবং যেটি ভুল তাহার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) মসৃণ এবং এবং চ্যাপ্টা শিম্ব মটরগাছের অন্যতম প্রকট লক্ষণ।

(খ) একই প্রজাতির দুইটি জীবের ফিনোটাইপ এক হইলেও, জিনোটাইপ পৃথক হইতে পারে।

(গ) মেণ্ডেলের বংশগতির সূত্রগুলি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) হলুদ রঙের দানা মটরগাছের প্রচ্ছন্ন লক্ষণ।

(ঙ) সাদা রঙের লোম গিনিপিগের প্রচ্ছন্ন লক্ষণ।

(চ) কোঁকড়ানো চুল মানুষের প্রচ্ছন্ন লক্ষণ।

(ছ) মেণ্ডেলের বংশগতির সূত্রগুলি সমস্ত জীবের সবরকম বংশগতি ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

1. অভিব্যক্তি বলিতে কি বোঝায়? অভিব্যক্তির স্বপক্ষে যে কোনও দুইটি প্রমাণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

2. অভিব্যক্তি কিভাবে ঘটে, সেই সম্পর্কে ডারুইনের মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। লামার্কের মতবাদের সঙ্গে এই মতবাদের প্রধান পার্থক্য কি?

3. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ;—

(ক) জীবাশ্ম; (খ) অন্তর্বর্তী রূপ; (গ) প্রাকৃতিক নির্বাচন; (ঘ) মিউটেশান মতবাদ।

4. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) অভিব্যক্তির গতি খুবই —। (খ) জীবাশ্ম পাওয়া যায় — শিলার বিভিন্ন স্তরে। (গ) — নামের প্রাণীকে বর্তমান ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ধরা হয়। (ঘ) কোনও — গুণ বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয় না। (ঙ) অভিব্যক্তি সম্পর্কে মিউটেশান মতবাদের প্রবক্তা —। (চ) — পর্যায়কে অঙ্গার-যুগ-রূপে চিহ্নিত করা হয়। (ছ) উভচর প্রাণী হইতে সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর অভিব্যক্তি হয়, সম্ভবত: — পর্যায়ে। (জ) মেসোজোয়িক যুগকে — যুগ বলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ :

1. অভিযোজন বলিতে কি বোঝায়? পদ্মগাছে জলজ উদ্ভিদের যে সমস্ত অভিযোজন দেখা যায়, তাহাদের বিবরণ দাও।

2. ফণিমনসায় জাঙ্গল উদ্ভিদের যে সমস্ত অভিযোজন দেখা যায়, তাহাদের বিষয়ে যাহা জান বল। ফণিমনসার একটি চিত্র আঁকিয়া উহাতে জাঙ্গল উদ্ভিদের যে যে অভিযোজন দেখা যায়, তাহা চিহ্নিত কর।

3. নদীর মোহনা কিংবা সমুদ্রের উপকূলবর্তী লোনা মাটিতে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় তাহাদের নাম কি? এই সমস্ত উদ্ভিদের অভিযোজন সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লেখ।

4. রুই মাছের জলচারী অভিযোজন সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লেখ। মাছ নয়, অথচ সব সময় জলে থাকে, এমন একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম কর।

5. পাখির উড়ার অভিযোজন সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লেখ।

6. নিচে, প্রথম অনুচ্ছেদে কয়েকটি জীবের নাম এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উহারা কোন্ ধরনের জীব, তাহা দেওয়া হইল। সঠিক যুগ্ম তৈয়ারি কর :—

(ক) আমগাছ ; (খ) ফণিমনসা ; (গ) পদ্মগাছ ; (ঘ) গরান ; (ঙ) অর্কিড় ; (চ) কলস উদ্ভিদ ; (ছ) তিমি ; (জ) জলহস্তী ; (ঝ) কেঁচো ; (ঞ) উটপাখি ; (ট) কচুরি পানা।

(অ) জলজ উদ্ভিদ ; (আ) লবণাম্বু উদ্ভিদ ; (ই) সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ ; (ঈ) জাঙ্গল উদ্ভিদ ; (উ) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ ; (ঊ) গর্তবাসী প্রাণী , (ঋ) ভাসমান উদ্ভিদ ; (এ) মরুবাসী ; (ঐ) জলচর প্রাণী ; (ও) উভচর ; (ঔ) পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ :

1. জীবজগত ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কিভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতা রক্ষিত হয়, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

2. নাইট্রোজেন আবর্ত বলিতে কি বোঝায় ? ইহার সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লেখ।

3. জীবজগত ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কিভাবে অক্সিজেনের সমতা রক্ষিত হয়, তাহা লেখ।

4. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) মৃত্তিকার শ্বসন ; (খ) নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ ; (গ) অ্যামোনিফিকেশন ; (ঘ) ডিনাইট্রিফিকেশন।

5. নিচের বক্তব্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক, তাহার পাশে 'হাঁ' এবং যেটি ভুল তাহার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) বাঁচিয়া থাকার জন্য উদ্ভিদের কার্বন ডাই-অক্সাইড দরকার।

(খ) উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে কিন্তু অক্সিজেন গ্রহণ করে না।

(গ) কয়েক ধরনের জীবাণু বায়ু হইতে সরাসরি গ্যাসীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে।

(ঘ) মাটি হইতে গৃহীত নাইট্রোজেন যৌগের সাহায্যে উদ্ভিদদেহে প্রোটিন প্রস্তুত হয়।

(ঙ) অ্যাকুয়ারিয়ামে জলজ উদ্ভিদ লাগানো হয়, অ্যাকুয়ারিয়ামের জল ঠাণ্ডা রাখার জন্য।

নবম পরিচ্ছেদ :

1. জীব-সম্প্রদায় বলিতে কি বোঝায় ? কোনও জীব-সম্প্রদায়ের জীবগুলিকে যে প্রধান প্রধান দলে ভাগ করা হয়, তাহাদের নাম কর এবং উহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে যাহা জান, সংক্ষেপে লেখ।

2. খাদক কাহাদের বলা হয় এবং কয় ধরনের ? বিভিন্ন ধরনের খাদকের পারস্পরিক সম্পর্ক কি রকম তাহা লেখ।

3. খাদ্য-শৃঙ্খল বলিতে কি বোঝায় ? জলের একটি এবং স্থলের একটি খাদ্য-শৃঙ্খলের উদাহরণ দাও।

4. জীব-পিরামিড বলিতে কি বোঝায় ? সংক্ষেপে ইহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। জীব-পিরামিডের সঙ্গে পচনকারীদের সম্পর্ক কি রকম ?

5. বাস্তব্য-তন্ত্রের গঠন-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা বর্ণনা কর।

6. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বলিতে ঠিক কি বোঝায় ? সংক্ষেপে জল ও মাটি সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

7. কি কি উপায়ে বন-সংরক্ষণ করা হয় তাহা লেখ।

8. ভারতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের বিষয়ে যাহা জান, লেখ।

9. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) জীব-সম্প্রদায় ; (খ) খাদ্য-শৃঙ্খল ; (গ) খাদ্য-জালক ; (ঘ) জীব-পিরামিড ; (ঙ) বাস্তব্য-তন্ত্র ; (চ) সংরক্ষণ।

10. নিচের বক্তব্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক তাহার পাশে 'হ্যাঁ', এবং যেটি ভুল তাহার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) বাস্তবা-তন্ত্রে সব সময় সমতা রক্ষার চেষ্টা চলে।

(খ) অনেকগুলি খাদ্য-জালক মিলিয়া একটি খাদ্য-শৃঙ্খল তৈয়ারি হয়।

(গ) খাদক, বিভিন্ন সারির উৎপাদক এবং পচনকারী—এই তিন ধরনের জীব লইয়া জীব-পিরামিড গঠিত হয়।

(ঘ) বর্তমানে যাত্রী-পায়রার সংখ্যা খুব কম হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) চিতা পৃথিবী হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে।

(চ) মানুষের নিজেদের স্বার্থেই প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলি সংরক্ষণ করা দরকার।

দশম পরিচ্ছেদ :

1. উদ্ভিদের কাণ্ড অথবা মূলের বৃদ্ধি প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

2. উদ্ভিদের কাণ্ড যে আলোক-অনুকূলবর্তী, তাহা প্রদর্শনের জন্য একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

3. উদ্ভিদের কাণ্ডের অভিকর্ষবৃত্তি প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

4. কিভাবে পুরুষ-অথবা স্ত্রী-কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্র ব্যবচ্ছেদ করিবে, তাহা লেখ। এই প্রাণীর রেচন-তন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

5. পুরুষ-কুনো ব্যাঙের জনন-তন্ত্র ব্যবচ্ছেদ-প্রণালী বর্ণনা কর। এই তন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

6. কিভাবে কুনো ব্যাঙের অ্যাওর্টিক আর্চগুলি ব্যবচ্ছেদ করিয়া বাহির করিবে, তাহা লেখ। হৃৎপিণ্ড ও অ্যাওর্টিক আর্চগুলির একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

আদর্শ প্রশ্নপত্র

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ জীবন-বিজ্ঞানের মূল্যায়নের ধারা এবং এই বিষয়ের প্রশ্ন কি ধরনের হইতে পারে, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য, পর্ষৎ-নির্দেশিত জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্য-ক্রমের পর্ব-বিভাগ, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পদ্ধতি এবং আদর্শ প্রশ্নপত্রের একটি নমুনা নিচে দেওয়া হল।

পর্ব-বিভাগ –

জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্য-ক্রমকে নিম্নলিখিত প্রধান পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হইয়াছে।

(I) নং পর্ব :—

(i) Significance of Photosynthesis and Respiration.

সালোক-সংশ্লেষ ও শ্বাসকার্যের তাৎপর্য

(ii) Nutrition, Metabolism and digestion, Food, Vitamins, Enzyme, Minerals and Water.

পুষ্টি, বিপাক, পরিপাক ; খাদ্য, ভিটামিন, উৎসেচক, খনিজ লবন ও জল

(iii) Circulation and Blood.

সংবহন ও রক্ত

II নং পর্ব :—

(i) Movement and Locomotion.
(ii) Excretion.
(iii) Soil, Virus and Microbes.
(1) সঞ্চালন ও গমন (2) রেচন (3) মাটি, ভাইরাস ও জীবাণু

III নং পর্ব :—

(i) Introduction to Nervous System and sense organs.
(Detailed description not required)
স্নায়ুতন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভূমিকা (বিশদ আলোচনা অপ্রয়োজনীয়)
(ii) General idea about Hormones.
'হরমন' সম্পর্কে সাধারণ ধারণা
(iii) Growth and Reproduction.
বৃদ্ধি ও জনন

IV নং পর্ব :—

(i) Cell division and its significance—(Outline Stages only, detailed not required)
কোষ বিভাজন ও ইহার তাৎপর্য (বিশদ আলোচনা অপ্রয়োজনীয়)
(ii) Heredity (outline idea only illustrating simple inheritance)
বংশগতি
(iii) Evolution (outline idea)
অভিব্যক্তি

V নং পর্ব :—

(i) Adaptations as exemplified by Specimens mentioned in the course content.
(ii) Carbon Cycle, Nitrogen Cycle and Oxygen Cycle.
(iii) General idea about Eco-system and Conservation.

প্রশ্ন প্রণয়ন—

(ক) দৃষ্টান্তমূলক ছক অনুসারে প্রতিটি প্রশ্ন বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করিয়া দিতে হইবে এবং প্রশ্নাংশের মূল্যমান নির্দিষ্ট থাকিবে।

(খ) সমগ্র প্রশ্নপত্রটির মধ্যে :

(1) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type)	50% থাকিবে
(2) রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Descriptive type)	20% থাকিবে
(3) বস্তুমুখী প্রশ্ন (Objective type)	30% থাকিবে

(গ) দুরূহতার মান বিচারে প্রশ্ন বা প্রশ্নাংশের সর্ত।

(i) অতি কঠিন	10% থাকিবে
(ii) কঠিন	20% থাকিবে
(iii) মাঝারি	50% থাকিবে
(iv) সহজ	20% থাকিবে

(ঘ) প্রশ্ন ও উহাদের মূল্যমান।

1নং প্রশ্ন (আবশ্যিক)

প্রত্যেকটি পর্ব হইতে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 4টি করিয়া প্রশ্নাংশ অর্থাৎ 5টি পর্ব হইতে 4×5=20টি প্রশ্নাংশ থাকিবে। প্রত্যেক প্রশ্নাংশের মূল্যমান 1 এবং 20টি প্রশ্নাংশের মূল্যমান 20×1=20. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক এই প্রশ্নটি আবশ্যিক হইবে। এ ক্ষেত্রে 2টি বা 3টি প্রশ্নাংশের মূল্যমান 2 বা 3 হইতে পারে। সেই অনুসারে 1নং প্রশ্নের প্রশ্নাংশের সংখ্যা হ্রাস করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক পর্বকে পুনরায় 3টি করিয়া উপপর্বে ভাগ করা হইয়াছে। এক একটি উপপর্বের মূলামান 6 ধরা হইয়াছে। এই মূল্যমানকে 1+2+3 বা 2+2+2 বা 3+3 বা 6 ইত্যাদি ভাগে প্রশ্নাংশ বা প্রশ্ন অনুসারে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রশ্নপত্রে **প্রতি পর্বে প্রত্যেক উপপর্ব হইতে 1টি করিয়া মোট 3টি প্রশ্ন** (প্রশ্নাংশ সহ) থাকিবে ; তার মধ্যে 2টি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই করিতে হইবে। এইভাবে প্রত্যেক পর্ব হইতে 2টি করিয়া মোট 10টি প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে।

	প্রশ্নসংখ্যা মূল্যমান	মোট
	10 × 6	=60
1নং আবশ্যিক প্রশ্ন (প্রশ্নাংশ সহ) ×20		=20
		80
তৎসহ মৌখিক পরীক্ষা		=15
Laboratory Note Book		=5
	Total Marks	100
প্রত্যেক পর্বের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের মান		4
এবং অপর প্রশ্ন (প্রশ্নাংশ সহ) এক একটি প্রশ্নের মূলামান		(6+6)=12
অর্থাৎ প্রত্যেক পর্বের মোট মূল্যমান		16

প্রশ্নপত্রের নমুনা :

পূর্ণ সংখ্যা—80

1নং প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই করিতে হইবে এবং তৎসহ প্রত্যেক পর্ব হইতে নির্দেশ অনুসারে 2টি করিয়া আরও 10টি প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে।

Q. No. 1. (মিশ্র পর্ব) প্রত্যেক পর্ব হইতে অনধিক 4টি করিয়া মোট 20টি প্রশ্নাংশ। প্রয়োজনে এই প্রশ্নাংশের সংখ্যা 15টি হইতে 20 টির মধ্যে থাকিতে পারে।

(i) জীবন-বিজ্ঞান বলিতে কি বোঝ ? 4
(ii) পরিবেশের যে কোন তিনটি উপাদান কি কি ? 1
(iii) বাতাসে অক্সিজেনের ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক পরিমাণ শতকরা কত ? 1
(iv) উদ্ভিদের শ্বাসকার্য কখন হয় ? 1
(v) পৃথিবীর যাবতীয় স্নেহসার পদার্থে কার্বনের উৎস কি ? 1
(vi) নিমজ্জিত উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড কোথা হইতে সংগ্রহ করে ?
(vii) খাদ্যের প্রধান তিনটি উপাদানের নাম কর। 1
(viii) সুষমখাদ্য কাহাকে বলে? 1
(ix) মাটিতে কোন কোন মৌলের অভাব হইলে গাছের সবুজ পাতা হলুদ হইয়া যায় ? 1
(x) "গাছের শিকড় মাটির তলায় যাচ্ছে" ইহা কি ধরনের চলন ? 1
1

(xi) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(1) মিউটেশান তত্ত্বের প্রবক্তার নাম —

(2) ——গ্ল্যাণ্ড মানবদেহের দুইটি বৃক্কের উপর অবস্থিত 1

(xii) জীন (Gene) কোথায় থাকে? 1

(xiii) D.N.A. কোথায় পাওয়া যায়? 1

পর্ব—1

Q. No. 2. (a) সবুজ উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার-জাতী খাদ্য প্রস্তুত করে তাহার নাম উল্লেখ কর। কোন কোন প্রধান উপাদানের সাহায্যে ওই খাদ্য প্রস্তুত হয়? এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণিজগৎ যে দুইভাবে উপকৃত হয় তাহা উল্লেখ কর। 1+2+3=6

অথবা

(b) শ্বাসকার্যের মূল উদ্দেশ্য কি?

(c) ভাইটামিন কি?

বাঁ দিকের বাক্যাংশের সহিত ডান দিকের যেটি সঠিক বাক্যাংশ সেইটি যুক্ত কর।

বাঁ দিক	ডান দিক
1. ভাইটামিন **A**-এর অভাবে	শিশুদের রিকেট রোগ হয়।
	বেরিবেরি হয়।
2. ভাইটামিন **B** কম-প্লেক্সের অভাবে	মানুষ রাতকানা হয়।
	স্কার্ভি রোগ দেখা দেয়।
3, ভাইটামিন **C**-এর অভাবে	পেটের অসুখ হয়।
	ম্যালেরিয়া রোগ হয়।
4. ভাইটামিন **D**-এর অভাবে	জল বসন্ত হয়।

2+4=6

অথবা

(d) মানুষের রক্ত লাল কেন? রক্তের যে কোন তিনটি কাজ উল্লেখ কর। আমাদের ছোটাছুটির সময় হৃৎযন্ত্র দ্রুতহারে স্পন্দিত হতে থাকে কেন? 1+3+2=6

পর্ব—2

Q. No. 3. (a) রেচন বলিতে কি বুঝ? পরিবেশের মধ্যে রেচন জাত ও বর্জ্য পদার্থগুলি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কিরূপে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের কল্যানসাধন করে তাহা উল্লেখ কর।

অথবা

(b) মানবকল্যানে জীবাণুর ভূমিকার দুইটি উদাহরণ দাও

ভাইরাস-ঘটিত দুইটি রোগের নাম লিখ।

(c) পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার্থে মাটি কিরূপে সাহায্য করে আলোচনা কর। 2+1+3=6

পর্ব—3

Q. No. 4. (a) একটি নিউরণের ছবি আঁক এবং উহার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex action)-র একটি উদাহরণ দাও। 2+4=6

(b) অন্তক্ষরা গ্রন্থির কাজ কি?

অথবা

(c) উদ্ভিদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কোন কোন অংশে হয় ছবি আঁকিয়া দেখাও।

উদ্ভিদের মূলের বর্ধনশীল অঞ্চল (Growing region) কি ভাবে নির্ণয় করিতে হয়, ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও। 2+4=6

(d) একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্রোমোজম সংখ্যা যদি 2n=8 হয়, নিম্নলিখিত অংশ সমূহের ক্রোমোজম সংখ্যা কত হইবে লিখ এবং উহার কারণ উল্লেখ কর।

(i) পুংদণ্ড (Filament)
(ii) পাতা (Leaf)
(iii) পরাগরেণু (Pollen)
(iv) ভ্রূণাণু (Zygote)
(v) বীজ (Seed)
(vi) ডিম্বাণু (Egg)

6×1=6

পর্ব—4

Q. No. 5. (a) দেহকোষ বিভাজনের তাৎপর্য কি ?
মাইটোসিসের দশার চিত্র অঙ্কন করিয়া নামাঙ্কিত কর। 2+4=6

(b) মাইটোসিস ও মিওসিস কোথায় হয়।
মিওসিসের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লিখ। 1+2+3=6

অথবা

(c) গোল বীজ উৎপাদনকারী এবং কুঁচকান বীজ উৎপাদনকারী দুইটি মটর গাছের সংকরায়ণ (Hybridisation) ঘটাইলে দ্বিতীয় পুরুষে গোলবীজ উৎপাদনকারী ও কুঁচকান বীজ উৎপাদন-কারী উদ্ভিদ 3 : 1 অনুপাতে পাওয়া গেল, প্রথম পুরুষের (F_1) কি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে এবং কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রবল (dominant) ও কোনটি সুপ্ত (recessive) ?
সংকরায়ণ-পদ্ধতি কি প্রকারে কৃষির উন্নতিতে কাজে লাগানো যায় ? 2+2+2=6

অথবা

(d) অভিব্যক্তি বলিতে কি বুঝ ?
ডারউইন(Darwin)-এর মতবাদ সংক্ষেপে লিখ। 1+5=6

পর্ব—5

Q. No. 6. (a) ইকোসিস্টেম বলিতে কি বুঝ ?
চিত্রসহযোগে একটি পুকুরের বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 2+4=6

অথবা

(b) মানুষ কি ভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য-বিঘ্নিত করিয়া পরিবেশের ক্ষতি সাধন করিতেছে, তাহা দুইটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। 6

অথবা

(c) বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেনের অনুপাত কি ভাবে বজায় থাকে ? 6

অথবা

(d) অভিযোজন (Adaptation) বলিতে কি বুঝ ?
অভিযোজনের উদ্দেশ্য কি ? একটি জলজ উদ্ভিদ ও একটি জলজ প্রাণীর অভিযোজন বর্ণনা কর।